হাওড়া জেলার ইতিহাস

[দ্বিতীয় খণ্ড]

অচল ভট্টাচার্য্য

শিবা এণ্ড কোং
১০/১ জি. টি. রোড
হাওড়া-৭১১১০১

হাওড়া জেলার ইতিহাস [দ্বিতীয় খণ্ড]
অচল ভট্টাচার্য
১০/১ হেম ব্যানার্জী লেন, হাওড়া-৭১১১০২

Howra Jeler Itihas
[History of Howrah District] [Second volume]
By
ACHAL BHATTACHARYYA
10/1. Hem Banerjee Lane, Shibpur
Howrah-711102

প্রথম প্রকাশ—১৫ই মার্চ ১৯৮২
মুদ্রক—
গোবর্ধন প্রেস
২০৯বি, বিধান সরণি
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশিকা – অন্নপূর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়
শিবা এণ্ড কোং
১০/১ জি. টি. রোড, হাওড়া-৭১১১০১

প্রচ্ছদ – অমিয় ভট্টাচার্য
পরিবেশক—পুস্তক বিপণী
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

দাম [illegible] RS.0-P-

বিষয় সূচী

চিত্রসূচী

বিষয়	সৌজন্য স্বীকার
প্রথম যুগের রেলগাড়ী হাওড়া ষ্টেশন হাওড়া ষ্টেশনের যে জায়গা থেকে প্রথম রেল চলে	পূর্ব রেল প্রচার দপ্তর

কবি করুণানিধান হাওড়ায় যে বাড়ীতে বাস করতেন শ্রীআভাষ মজুমদার।

প্রখ্যাত অভিনেতা ললিত চট্টোপাধ্যায়।

সাঁকরাইল জমিদার বাড়ীর প্রবেশদ্বার শ্রী সুবোধদেব সেন।

বেলুড়মঠে স্বামী বিবেকানন্দ - শ্রীরবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

হরপার্বতী, ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের তুলিতে—অধ্যাপক শ্রীপ্রনব মুখোপাধ্যায়।

শরৎচন্দ্রের প্রথম সম্বর্ধনা— অলোক দেব মুখোপাধ্যায় ও প্রবীর গোপাল মুখোপাধ্যায়।

হরিনারায়ণপুরে প্রাপ্ত এবং শান্তিনিকেতনে রক্ষিত বিষ্ণুমূর্তি— শ্রী সোমনাথ হোড়, অধ্যক্ষ, কলাবিভাগ শান্তিনিকেতন এবং শ্রী-অজয় কুমার মিত্র, জনসংযোগ আধিকারিক শ্রীনিকেতন, বিশ্বভারতী।

মানচিত্রসূচী

হাওড়া শহরে জনবসতির ক্রমবিকাশ

হাওড়া সদর মহকুমা,

বিদেশীদের আঁকা মানচিত্রে হাওড়া

হাওড়া শহর—মার্ক উড— শ্রীঅলক মুখোপাধ্যায়

আপনজনের মানচিত্রে হাওড়া (১৭৯২-৯৩) ন্যাশানাল লাইব্রেরী।

হাওড়ার একাংশ-রোনেল (১৭৭৯-৮০)।

সবিনয় নিবেদন

হাওড়া জেলার ইতিহাস-এর প্রথমখণ্ডে আলোচিত হয়েছিল জেলার ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, শিক্ষা, ভাষা ও সাহিত্য এবং লোকপ্রকৃতি এই কয়টি বিষয়ের। দ্বিতীয় খণ্ডে-আরও ছ'টি বিষয়ের আলোচনা করা হ'ল। তৃতীয় খণ্ডের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত হ'বে স্বাধীনতার বেদীমূলে হাওড়া জেলার আত্মদানের ইতিবৃত্ত।

প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় যে কথাগুলি বলা হ'য়েছিল, দ্বিতীয় খণ্ডের ক্ষেত্রেও সেই সব মন্তব্যের অনেকগুলিরই পুনরাবৃত্তি করা আবশ্যক।

গ্রন্থরচনার কাজে উৎসাহ দিয়ে এবং তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করতে বহু ব্যক্তি যেমন স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে এগিয়ে এসেছেন অনেকের কাছে তেমন-ই বারবার সহযোগিতা প্রার্থনা করেও নিরাশ হ'য়েছি। দ্বিতীয়তঃ যে সব তথ্য আলোচ্য বিষয়গুলি সম্পর্কে সংগ্রহ করেছি, তার এক ভগ্নাংশ মাত্র-ই প্রকাশ করা সম্ভব হ'ল মূলতঃ অর্থনৈতিক কারণে।।

প্রথম খণ্ড রচনায় যাঁরা সক্রিয় সহযোগীর ভূমিকা নিয়েছিলেন, দ্বিতীয় খণ্ড রচনার সময় তাঁদের সংগে আরও অনেকে যোগদেন। এঁদের সকলের নাম উল্লেখ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় হ'লেও গ্রন্থের সীমিত পরিসরে সেটি সম্ভব নয়। তাই সকলের কাছে মার্জনা চেয়ে মাত্র কয়েকজনের নাম উল্লেখ করছি। এঁরা হলেন—সর্বশ্রী সন্ন্যাসী চরণ সাধুখাঁ, প্রাক্তন শিক্ষক দীনবন্ধু ইনষ্টিটিউশান ব্রাঞ্চ, [সম্প্রতি পরলোক গত] চিন্ময় সাধুখাঁ অরবিন্দ হালদার (সেবাইত বেতাই চণ্ডী, লক্ষ্মণ নাথ, প্রধান শিক্ষক, দীনবন্ধু ইনষ্টিটিউশান মেন, নন্দগোপাল বসু (সাঁকরাইল) প্রবীর গোপাল মুখোপাধ্যায় সুশান্ত চন্দ, আভাষ মজুমদার, সজলচন্দ, পূর্ণ মিত্র, ও আলোকদেব মুখোপাধ্যায় [শিবপুর], ডাঃ হরেন্দ্র নাথ ঘোষ, প্রিন্সিপ্যাল, ক্যালকাটা ন্যাশানাল মেডিকেল কলেজ, ডাঃ বিমলেন্দু মুখার্জী, মানবপাল, কল্যান ব্রহ্মচারী, সহঃ সম্পাদক বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, মোহনলাল কাপড়ী, সম্পাদক আলেয়া, কৃষ্ণচন্দ্র ভড় সম্পাদক, সত্যলোক, বিনয় চক্রবর্তী (আন্দুল), আশীষ মিত্র, সুবোধ দেব সেন, সম্পাদক-লেখন, রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদক, নিঃ ভাঃ শিশু সাহিত্য

সম্মেলন, কুবের হাজরা (বেলুড়), নীলরতন সরকার (বেলুড়), সমর বসু জন সংযোগ অধিকর্তা, সি. এম ডি. এ, নারায়ণ দত্ত, প্রচার আধিকারিক পূর্ব রেলপথ, নীরেন সেন যুগ্ম-সম্পাদক, নিঃ ভাঃ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, হাওড়া শাখা, ফণীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় [বেলুড়] অজিত দাস (সালকিয়া) কবি নিমাই মান্না (চাকপোতা আমতা), আচার্য সর্বেশ্বর গোস্বামী [বৈষ্ণব বেদান্ত মঠ, বীরশিবপুর], ইন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং তারাপদ ভট্টাচার্য (আমূল) গোরাচাঁদ ভট্টাচার্য, (কলিকাতা) এবং সালকিয়ার চিত্তরঞ্জন বসু।

গ্রন্থরচনার প্রায় প্রতি পদক্ষেপে নানাবিধ আলোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পেয়েছি অধ্যাপক নিশীথ রঞ্জন রায়, ডঃ অসিত বন্দোপাধ্যায়, অধ্যাপক শঙ্করী প্রসাদ বসু, ডঃ নিমাই সাধন বসু, শ্রী গোপাল চন্দ্র রায়, ডঃ সুভাষ বন্দোপাধ্যায়, শ্রী রাধারমন মিত্র, শিবপুরের ইণ্ডিয়ান বোটানিকেল গার্ডেন-এর প্রাক্তন কিউরেটার ডঃ সুশীল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির কাছ থেকে। এদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন অভিনব অগ্রনী সাহিত্য গোষ্ঠী, হাওড়া বার্তা পত্রিকা, হাওড়া বিজ্ঞান পরিষদ, অনুশীলনী, নৈবেদ্য, দেশবন্ধু বালিকা বিদ্যালয়, গ্রামীন লেখক সম্মেলন, সাঁকরাইল গার্লস হাইস্কুল ও কুসুমকুমারী গার্লস প্রাইমারী স্কুল, লিখতে পড়তে শেখাও (বাগনান) সাহিত্য প্রয়াসী, বালিচক যোগব্যায়াম মন্দির প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠান তাঁদের আয়োজিত সেমিনার, সাহিত্য সভায় ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে আমায় হাওড়া জেলার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার সুযোগ দিয়ে গ্রন্থ রচনা আমায় উৎসাহ বৃদ্ধি করেছেন। এঁদেরকে ধন্যবাদ।

হাওড়া কাহিনী, সাহিত্য বানী, অভিনব অগ্রনী প্রভৃতি পত্রিকা সমূহ তথ্য সংগ্রহের জন্য লেখকের আবেদন দীর্ঘদিন নিষ্ঠার সংগে প্রচার করে আমাকে চিরঋণী করেছেন।

বিশেষ যত্নসহকারে মানচিত্র অঙ্কন এবং ব্লক নির্মানে সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই শ্রী দিলীপ বাগ ও শ্রী পঞ্চানন ভট্টাচার্যকে। তাড়াতাড়ি ছাপার কাজ শেষ করার কৃতিত্ব গোবর্ধন প্রেসের শ্রী প্রশান্ত ঘোষ ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দের এদেরকেও ধন্যবাদ।

অচল ভট্টাচার্য

১০/১ হেম ব্যানার্জী লেন
শিবপুর, হাওড়া-২

উৎসর্গ

বর্তমান হাওড়ার পাঁচকুতী সন্তান

ডঃ নিমাই সাধন বসু — ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যাপক শঙ্করী প্রসাদ বসু — শংকর (মণিশংকর মুখার্জী)

এবং

ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়
মহাশয়গণের করকমলে—

যাঁদের নির্দেশ ও নিরন্তর উৎসাহ আমার হাওড়া জেলার ইতিহাস রচনার প্রেরণাস্বরূপ।

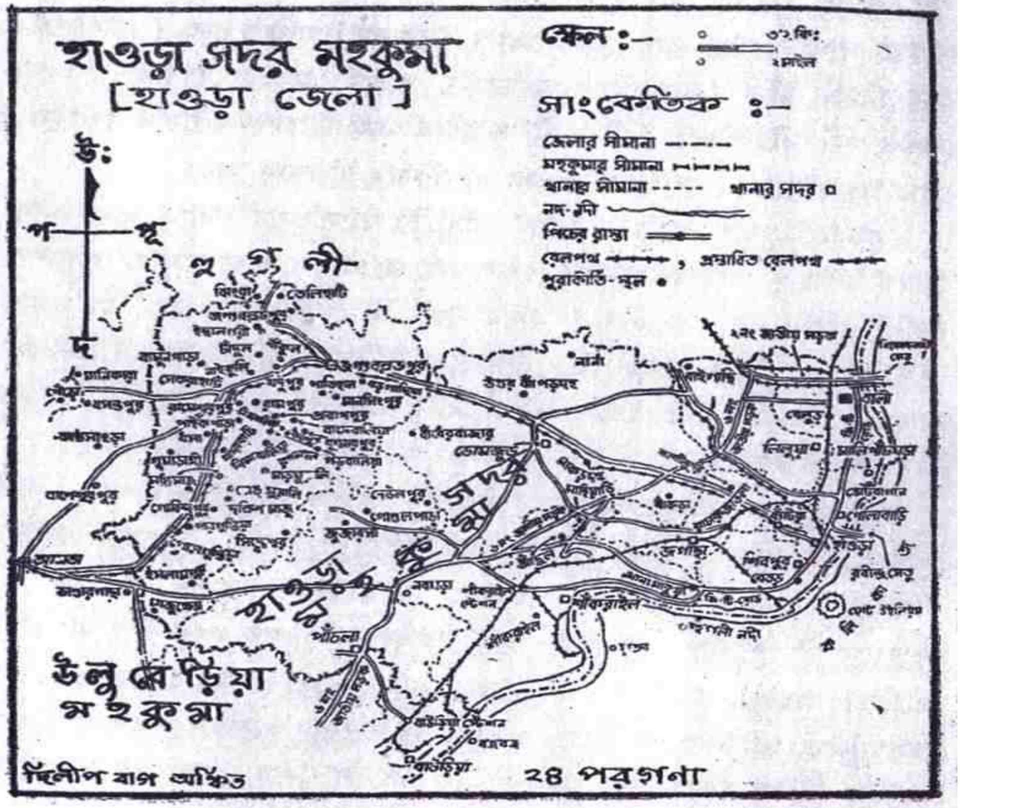
এই লেখকের আরো বই

নাটক—দেশের ডাক

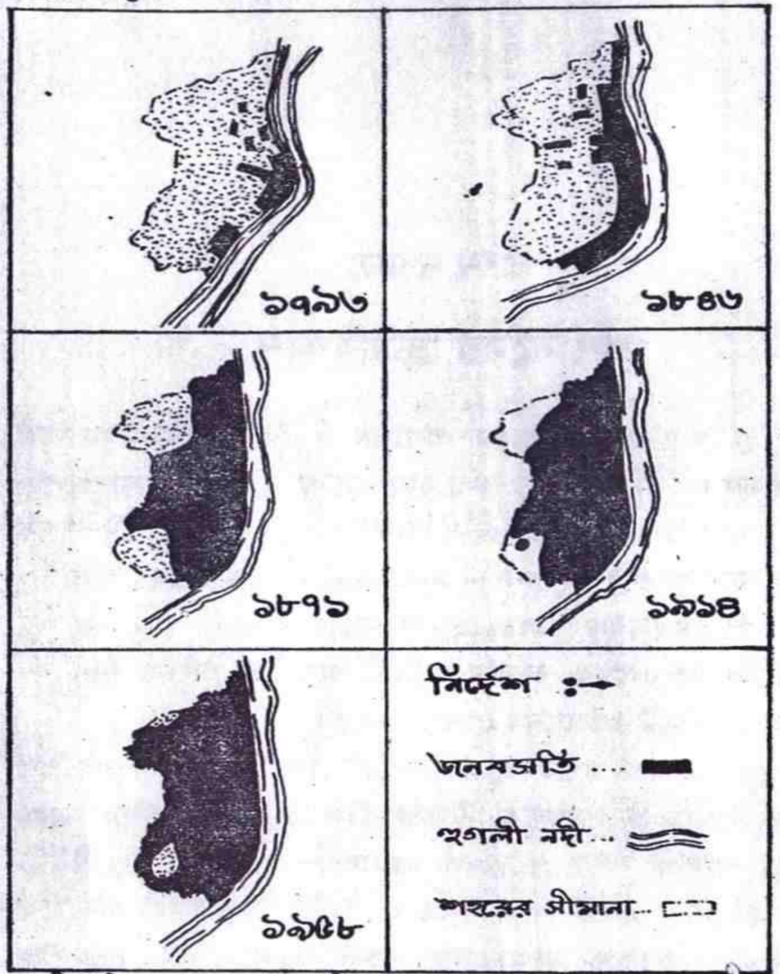
জীবন নাট্য—শরৎচন্দ্র, সুকান্ত

ছোট গল্প হ'লেও ইতিহাস

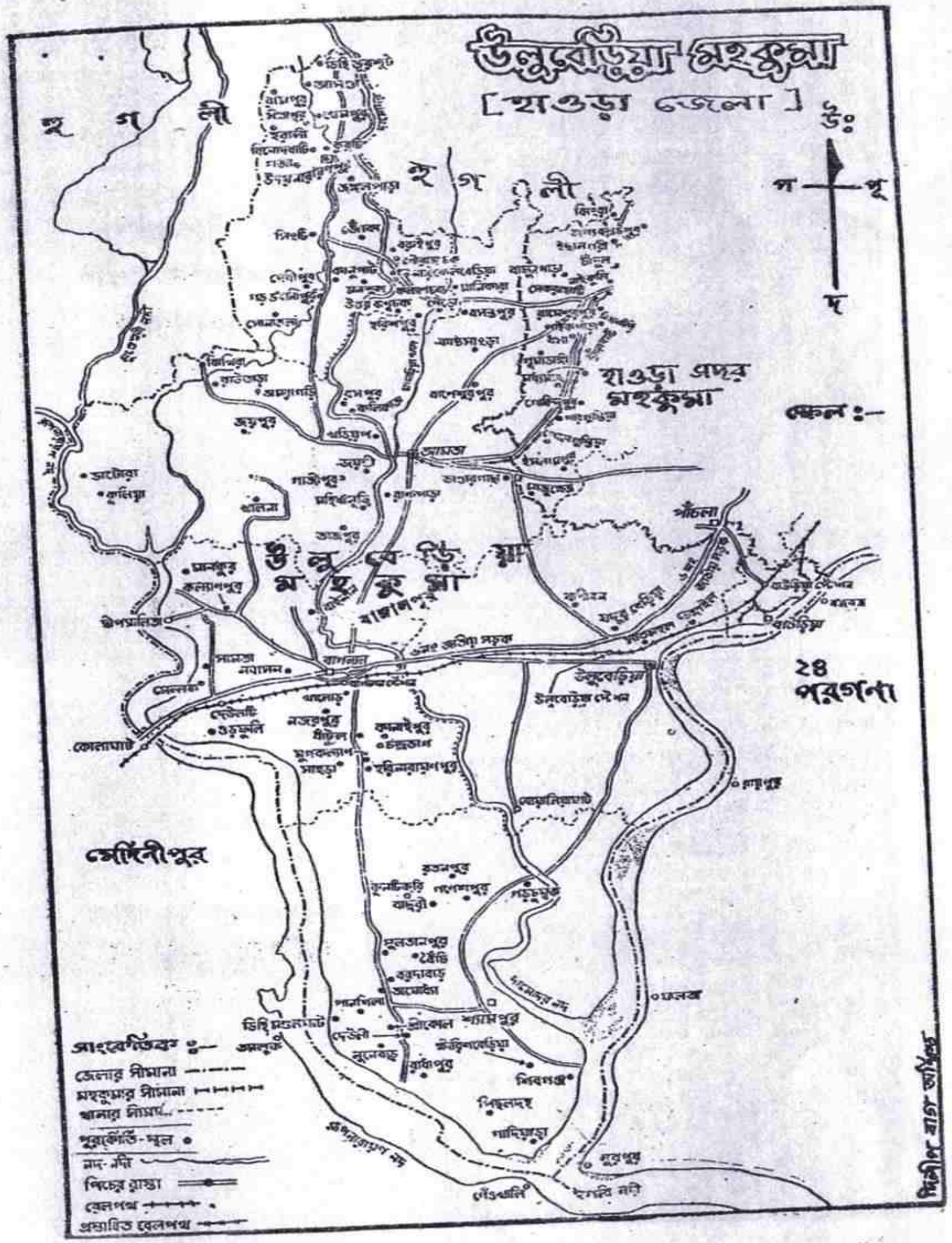
কিশোর উপন্যাস—গঙ্গোয়ানার পশ্চিমে।



হাওড়া শহরের জনবসতির ক্রমবিকাশ

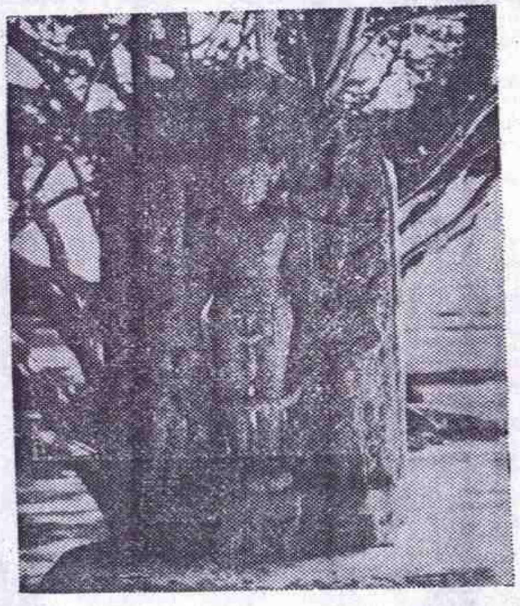


শ্রীদিলীপ কুমার বাগ অংকিত ২৩/১২/৮০।





সাঁকরাইল
জমিদার বাড়ীর
প্রবেশ দ্বার



হরিনারায়ণপুরে প্রাপ্ত
বিষ্ণু মূর্তি

প্রথম অধ্যায়

প্রশাসনের ক্রমবিকাশ

হিন্দু যুগের হাওড়া জনপদের প্রশাসন ও বিচার বিভাগের কথা অন্ধকারাচ্ছন্ন। সাধারণভাবে বলা যায়, সে সময় "ভুক্তি" বা শাসন-তান্ত্রিক বিভাগগুলি ছিল আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে প্রায় স্বাধীন। বিভাগের উচ্চপদস্থ শাসনকর্তারা বিষয়পতি মণ্ডলেশ্বর প্রভৃতি নামে অভিহিত হ'তেন। বিচারকার্য্যের প্রধান ছিলেন মহাধর্মাধ্যক্ষ। সেন বংশের রাজত্বকালের রাঢ় দেশের বর্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত পশ্চিম ঘাটিকা-বিভাগটিই মোটামুটি বর্তমানের হাওড়া জেলা।

মুঘলযুগে জেলাটি সপ্তগ্রাম, সুলেমানাইবাদ ও মান্দারণ এই তিন সরকারের মধ্যে ৮ টি পরগণায় বিভক্ত ছিল। পরগণাগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল মণ্ডলঘাট—বর্তমানে উলুবেড়িয়া মহকুমায় এই নামে একটি গ্রাম আছে। আইন-ই-আকবরী অনুসারে মণ্ডলঘাট ছিল সরকার মান্দারণের একটি মহল, পরে পরগণায় রূপান্তরিত হয়। মুর্শিদকুলী খাঁর শাসনতান্ত্রিক সংস্কারে একশত গ্রামে একটি পরগণা হ'ত। ১৭২২ খ্রীঃ-এ উলুবেড়িয়া ছিল বর্ধমানের

এবং জেলার অবশিষ্টাংশ মহম্মদ আমিনপুর জমিদারীর অন্তর্গত। ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে আঁকা একটি ম্যাপে দেখা যায় দামোদর নদকে মণ্ডলঘাট নদী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সুবা বাংলায় থাকতেন একজন করে ফৌজদার। প্রাণদণ্ড দান ব্যতীত অপর সকল প্রকার বিচার ও শাসন কার্যে তিনি ছিলেন মহালের সর্বেসর্বা। কোতোয়াল ছিলেন শহরের প্রধান শান্তি-রক্ষক। প্রাণদণ্ডদান সহ সকল প্রকার বিচারের একছত্র কর্তৃত্ব থাকত নাজিমের হাতে।

The Fouzdar was the chief police officer and judge of all crimes, not capital ; Katwal, the head constable of the town was subordinate to him. The Nazim as the supreme Magistrate presided at the trial of capital offenders. [Fields Regulation.]

নবাবী আমলে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করার কাজে ফৌজদার এবং কোতোয়াল-এর নীচেয় থাকতেন ফাঁড়িদার, তার নীচেয় নায়েব ফাঁড়িদার যিনি গ্রামের চৌকীদারের কাজকর্ম্মের বিবরণ সংগ্রহ করতেন। সেই বিবরণ লিপিবদ্ধ করতেন বক্সী নামে অভিহিত মুহুরী গোছের কোন কর্ম্মচারী। হান্টার সাহেব তাঁর "স্ট্যাটিসটিক্যাল একাউন্ট অব বেঙ্গল" গ্রন্থে লিখেগেছেন—"জমিদারদের দেওয়ানী এবং ফৌজদারী মামলা পরিচালনার জন্য থাকতেন ফৌজদারী গোমস্তা, মহিনা দেড় থেকে তিন টাকা, এরা আদালতে যাতায়াত করতেন, উকিল মোক্তারদের ঘটনার বিবরণ দিয়ে মামলা সাজাতে সাহায্য করতেন। গোমস্তার অধঃস্তন কর্মচারীকে বলা হ'ত মণ্ডল। জমিদার সাধারণতঃ গ্রামের প্রধান চাষীকে মণ্ডল নিযুক্ত করতেন। অনেক ক্ষেত্রেই পদটি ছিল বংশানুক্রমিক। মণ্ডলরা নিযুক্ত হতেন কৈবর্ত্ত, বাগদী, চণ্ডাল, এবং মুসলমানদের মধ্য থেকে। এদের কাজ ছিল গ্রামে সংঘটিত অপরাধজনক কাজগুলির সংবাদ সরবরাহ করা, পুলিশকে গ্রাম এবং বাড়ীর খানা তল্লাসীতে সাহায্য

করা প্রভৃতি। হাওড়া জেলায় ছ'জন মণ্ডল আছেন। নূতন পুলিশী ব্যবস্থায় এদের গুরুত্ব ক্রমহ্রাসমান।"

নবাব মীরকাশিমের আমলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চাকলা বর্ধমানের রাজস্ব আদায়ের ভার পেয়ে মিঃ এস, ডেভিস নামে এক-জনকে বর্ধমানের জেলা অফিসার নিযুক্ত করেন। অতএব তিনিই বর্ধমান তথা হাওড়া জনপদের প্রথম শ্বেতাঙ্গ প্রশাসক। কারণ তখনও হুগলি ও হাওড়া জেলার জন্ম হয়নি। সে সময় হাওড়া জেলার খারিজামহল ব্যতীত প্রায় সমস্ত অংশই বর্ধমান জেলার অন্তর্গত ছিল। ১৭৯৫ খ্রীঃ-এ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্ম লগ্নে [লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলে] বর্ধমানের বুক ভেঙে জন্ম নেয় হুগলী জেলা। হুগলী জেলার জন্য আলাদা ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হ'ল, কিন্তু কালেক্টরী আলাদা হল না। একসময় হাওড়া জেলায় আমতা ও বাগনান থানা ছিল হুগলীর মধ্যে আর হাওড়া শহর যুক্ত ছিল ২৪ পরগণার সংগে। ২৪ পরগণার ম্যাজিষ্ট্রেট এবং জজসাহেবরা সপ্তাহে একদিন করে এসে হাওড়া শহরের ফৌজদারী মামলা-মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করে যেতেন। ফৌজদারী মামলা রুজু হত আলিপুরে। ১৮২২-এর ১লা মে বর্ধমান থেকে হাওড়া-হুগলীর কালেক্টরী আলাদা হয়ে যায়। ১৮৪১-এ প্রস্তাব গৃহীত হয় হাওড়া, শালকিয়া এবং শিবপুর এলাকার জন্য একজন জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগ করা হবে। কার্যত হাওড়ার জন্য স্বতন্ত্র একজন ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে। মাসিক ৯০০ টাকা বেতনে নিযুক্ত প্রথম ম্যাজিষ্ট্রেটের নাম উইলিয়ম টেলর। হাওড়া, শালকিয়া, আমতা, রাজাপুর [বর্তমান জগৎবল্লভপুর] উলুবেড়িয়া, কোতরা, এবং বাগনান জুড়েছিল নূতন ম্যাজিষ্ট্রেটের শাসনাধীন এলাকা। প্রথম কুড়ি বছর হাওড়ায় ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন ২৪পরগণার জজসাহেবের অধীন এবং ১৮৬৪ খ্রীঃ থেকে হুগলীর জজ-সাহেবের অধীন। ১৮৯৪ খ্রীঃ-এ সিংটি ফাঁড়ি হুগলী থেকে হাওড়ায় আসে।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দেও যে সময় হাওড়ার প্রথম গেজেটিয়ার লেখা হয় —হুগলী থেকেই হাওড়ার দেওয়ানি বিচার ও রাজস্ব বিভাগের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত হত। ১৯২০-তে হাওড়ার রাজস্ব বিভাগ হুগলীর প্রভাবমুক্ত হয়।

১৯৬৩-তে হাওড়া ছিল বর্ধমান বিভাগের অন্তর্গত, পরে হয় প্রেসিডেন্সি বিভাগের অঙ্গীভূত। জেলার প্রশাসনিক প্রধান জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টর নামে অভিহিত। দু'জন মহকুমা শাসক [Sub divisional offlicer] তাঁকে সাহায্য করেন। হাওড়ার পুলিশ বিভাগের প্রধান হলেন সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট অফ্‌ পুলিশ। তিনি ব্যতীত শান্তিশৃঙ্খলার দায়িত্বে নিযুক্ত আছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট এবং উলুবেড়িয়ার জন্য একজন মহকুমা পুলিশ অফিসার।

হাওড়া জেলায় মিউনিসিপ্যাল শহরের সংখ্যা দুই এবং মিউনিসিপ্যালিটি হীন শহরের সংখ্যা বাইশ। ১৫৩টি অঞ্চলে বিভক্ত গ্রামের সংখ্যা ৭৯৮। অঞ্চলগুলি দু'টি মহকুমায় বিভক্ত হাওড়া সদর ও উলুবেড়িয়া। জেলার উঃ পূর্বে অবস্থিত হাওড়া মিউনিসিপ্যাল এলাকার পাঁচলা, জগৎবল্লভপুর, সাঁকরাইল, ডোমজুর ও বালী-জগাছা ব্লক নিয়ে গঠিত হাওড়া সদর মহকুমার আয়তন ১৭৬ বর্গমাইল। জেলার উত্তর ভাগের অর্ধেক ও সম্পূর্ণ দঃ পশ্চিম ভাগ উলুবেড়িয়া মহকুমার অন্তর্গত। উলুবেড়িয়া মহকুমার সদর বহুদিন মহিষরেখাতে ছিল। ১৮৮৩ খ্রীঃ-এ সদর উলুবেড়িয়াতে স্থানান্তরিত হয়। হুগলী জেলার খানাকুল একসময় এই মহকুমার অন্তর্গত ছিল।

হাওড়া জেলাটি ৫টি সার্কেলে এবং সার্কেলগুলি ১৮টি থানায় বিভক্ত। হাওড়া, শিবপুর, ব্যাঁটরা, মালীপাঁচঘরা, গোলাবাড়ী, লিলুয়া এবং বালী এই আটটি শহর থানা, অবশিষ্ট দশটি থানার নাম ডোমজুর পাঁচলা, জগৎবল্লভপুর, বাউরিয়া, শ্যামপুর,

উদয়নারায়ণপুর, বাগনান, সাঁকরাইল, আমতা এবং উলুবেড়িয়া। হাওড়া থানার প্রধান—ইনস্‌পেক্টার। অপর থানাগুলির সর্ব্বোচ্চ অফিসার—সাব-ইন্‌সপেক্টার।

কয়েকটি থানা নিয়ে গঠিত হয়—এক একটি সার্কেল। সার্কেলগুলির দায়িত্বে আছেন সার্কেল ইন্‌সপেক্টর। হাওড়া, বালী, ডোমজুড়, সাঁকরাইল, জগৎবল্লভপুর, জগাছা, পাঁচলা, শিবপুর, ব্যাঁটরা, গোলাবাড়ী, মালীপাঁচঘরা এবং লিলুয়া থানার অবস্থান হাওড়া সদর মহকুমায়। উলুবেড়িয়া মহকুমার থানাগুলির নাম—আমতা, বাগনান, বাউরিয়া শ্যামপুর, উদয়নারায়ণপুর এবং উলুবেড়িয়া।

হাওড়া থানা ব্যতীত সদর মহকুমার বাকী থানাগুলি ৪টি সার্কেলে বিভক্ত। যেমন, এ-সার্কেল—ব্যাঁটরা এবং গোলাবাড়ী, বি-সার্কেল —মালীপাঁচঘরা, লিলুয়া ও বালী, সি-সার্কেল—শিবপুর ও সাঁকরাইল, ডি-সার্কেল—জগাছা, ডোমজুড়, জগৎবল্লভপুর ও পাঁচলা থানা। জেলার বাকী থানাগুলি উলুবেড়িয়া সার্কেলের অধীন। প্রতিটি সার্কেল এবং হাওড়া থানার দায়িত্বে আছেন একজন করে ইনসপেক্টার।

প্রস্তাবিত তৃতীয় মহকুমা

প্রস্তাব আছে, হাওড়া জেলার তৃতীয় মহকুমা হ'বে আমতা। পুন-বিন্যাসের ফলে, সদর মহকুমায় থাকবে—হাওড়া ও বালী পৌরসভা ডোমজুর, সাঁকরাইল, এবং বালী জগাছা ব্লক। উলুবেড়িয়া মহকুমার অধীন হবে বাগনান এক ও দু নম্বর ব্লক, শ্যামপুর এক ও দু নম্বর ব্লক এবং উলুবেড়িয়া এক ও দু নম্বর ব্লক। পাঁচলা, জগৎবল্লভপুর, উদয়নারায়ণপুর এবং আমতা এক ও ২ নম্বর ব্লক নিয়ে গঠিত হ'বে জেলার তৃতীয় মহকুমা—আমতা।

বিচার ব্যবস্থার বিবর্ত্তন

হাওড়ার নবাবী আমলের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে ইংরাজ আমলের একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট চন্দ্রকান্ত ব্যানার্জী তাঁর "হাওড়া-এ্যান একাউন্ট অফ্ পাষ্ট এণ্ড প্রোজেক্ট" বইয়ে লিখে গেছেন—

"বর্তমান কোম্পানীর বাগানের মধ্যে বাঙ্গালার নবাবের দরবার গৃহ ও হাওয়া খানায় একটি ক্ষুদ্র অট্টালিকা ছিল। নবাব যখন মফস্বল সফরে বার হতেন তখন এখানে সময়ে সময়ে আসিয়া দরবার করিতেন ও মহাসমারোহে পান ভোজন আনন্দ উৎসব চলিত। বছরের অন্য সময়ে এই দরবার গৃহে ফৌজদারী বিচারক কাজি সাহেবরা ও দাওয়ানী বিচারক হাবিলদার বা হালদার মহাশয়েরা কাছারি করিতেন। বিচার-প্রার্থীগণ একটি মোরগ ও একটি পাঁঠা বলি দিয়ে এই আদালতে উপস্থিত হইতেন।" —অনুবাদক, অন্নদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

কোম্পানীর বাগান বলতে বোটানিকেল গার্ডেন বুঝতে হ'বে।

ইংরেজ আমলের শুরুতে হাওড়ার ফৌজদারী মামলা রুজু হত আলিপুরে। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের একটি বিখ্যাত মামলার বিবরণ থেকে জানা যায় রঘুনাথ সিংহ নামক জনৈক ব্যক্তির বাকী খাজনা আদায়ের জন্য তার মালিকানাভুক্ত হাওড়া ময়দান এলাকাটি ক্রোক করা হয়। হারিরা [বর্তমান হাওড়া শহরের মধ্যাঞ্চল] গ্রামের শ্বেতাঙ্গ লীজ গ্রহীতা মিঃ লিভেটের ১৬০ বিঘা জমির উপর বাড়ীটি ১৭৮০ খ্রীঃ-এ অরফ্যান সোসাইটি ৬৫০০০ টাকায় কিনে নিয়ে অনাথ সৈনিক সন্তানদের জন্যে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮১৫-তে স্কুল উঠে যাবার পর বাড়ীটিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। এক ভাগে আশ্রয় নেন বিশপস্ কলেজের পাদ্রীরা, এক ভাগে অফিস খোলেন কাষ্টমস্ বিভাগের অফিসারগণ এবং অবশিষ্টাংশে স্থাপিত হয় ২৪ পরগণার ম্যাজিষ্ট্রেটের একটি অফিস। সেখানে প্রথমে আশ্রয় পায় সিভিল কোর্ট অব্ সালকিয়া—পরে ১৮৫১-তে পাদ্রীরা এবং ১৮৫৯-এ কাষ্টমস্ অফিসারগণ এখান থেকে চলে গেলে ক্রমশঃ সমগ্র বাড়ীটাই

কোর্ট এলাকায় পরিণত হয়। সিভিল কোর্ট অব সালকিয়া থেকে পরিবর্ত্তিত হাওড়া কোর্টের দেওয়ানী, ফৌজদারী ও দায়রা বিচারালয়ের বিচারকগণ এখন এখানে বসেই হাওড়া জনপদের ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করেন। বর্তমান হাওড়া আদালত ভবনগুলির মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন ফৌজদারী আদালত ভবন, নির্মাণকাল ১৮৯৬ খ্রীঃ।

সালকিয়ার সীতানাথ বসু লেনের যে কাছারী বাড়ীতে এক সময় সিভিল কোর্টের অবস্থান ছিল উত্তরকালে তার মালিক হ'ন দুর্গাচরণ নাগ। ঠিক কোন সময় সালিখা মুনশেফ বিচারালয় স্থান ও নাম পরিবর্ত্তন করে বলা শক্ত। তবে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দেও এটি বর্ত্তমান ছিল। কারণ ঐ বছরের ২৮৪নং মামলাটির [প্রিয়নাথ মান্না, প্রজার নাম বনাম জমিদার প্রতাপচন্দ্র ঘোষ দিগর] বিচার সালিখা মুনশেফ বিচারালয়েই হয়।

প্রিয়নাথ মান্নার বস্তির নামে যে রাস্তা আছে, এই মামলা সেই এলাকার খাজনা বৃদ্ধির বিষয়ে। প্রিয়নাথ মান্না ছিলেন জেমস চু সাহেবের প্রজা। আবার চু-সাহেব ছিলেন জমিদার প্রতাপচন্দ্র ঘোষের প্রজা। খাজনা ছিল ৪ বিঘা ১০ কাঠা ১০ ছটাক জমির জন্য ১০ টাকা ১২ আনা ১১ গণ্ডা। চু-সাহেবের অবর্তমানে জমিদাররা খাজনা বৃদ্ধির জন্য প্রিয়নাথ মান্নার নামে যে মামলা করেন, বিপ্রদাস চ্যাটার্জী লেনের নিকটবর্তী কাছারী বাড়ীতেই সেটির নিস্পত্তি হয়।

ইংরাজ আমলে হাওড়া, আমতা, উলুবেড়িয়া, বালী ও হাওড়া ষ্টেশন এলাকার জন্য পাঁচটি অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্ট এবং গ্রামাঞ্চলে পঁচিশটি ইউনিয়ন বেঞ্চ কোর্ট চালু করা হয়। মুনশেফ-কোর্ট ছিল ৩টি হাওড়া, উলুবেড়িয়া ও আমতায়।

হাওড়ায় এখন একজন জেলা ও দায়রাজজ এবং ২ জন অতিরিক্ত জজ আছেন। ১৯৩৭ খ্রীঃ পর্যন্ত হাওড়ার জেলা ও দায়রা জজ হাওড়াস্থ হুগলীর জেলা ও দায়রা জজ নামে অভিহিত হ'তেন।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী হাওড়া সব বিষয়ে হুগলী থেকে আলাদা হয়, যদিও হাওড়া কোর্টের রেকর্ডরুম এখনও হুগলীতে। ১৯৩০ খ্রীঃ—এ হুগলীর অধীনতা কাটিয়ে হাওড়া কালেক্টরী স্বতন্ত্র স্বত্তায় পরিণত হয়।

১৮৮২-তে রমেশচন্দ্র দত্তের পরামর্শে হাওড়ার জেলা জজ হিসাবে কর্মরত থাকার সময়ই বিহারী লাল গুপ্ত ভারতীয় বিচারকদেরও ইউরোপীয় অপরাধীদের বিচার করার ক্ষমতা থাকা উচিত এই মত প্রকাশ করে যে প্রতিবেদন পাঠান তারই ফলশ্রুতি ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ইলবার্টবিল।

হাওড়ায় সাবজজ কোর্ট স্থাপনের জন্য যাঁরা বিশেষভাবে সচেষ্ট হন লালমোহন মুখোপাধ্যায় ছিলেন তাঁদের পুরোধা। হাওড়ায় সাবজজ কোর্ট স্থাপনের পূর্ব পর্য্যন্ত হাওড়া, আমতা ও উলুবেড়িয়ার মূল মোকদ্দমাগুলির বিচার হ'ত হাওড়ায়, কিন্তু দেউলিয়া হওয়া অভিভাবক নিয়োগ প্রভৃতি জেলা জজের এজলাসে বিচার্য মামলাগুলি হুগলিতে হ'ত।

শাসন ও বিচার বিভাগ আলাদা হ'বার আগে পর্য্যন্ত ম্যাজিষ্ট্রেটেরও বিচার ক্ষমতা ছিল। এখন তিনি শুধুই প্রশাসনিক প্রধান।

জেল

এক সময় দোলগোবিন্দ সিং লেনে ছিল হাওড়া জেলখানা। জেলায় এখন জেলের সংখ্যা ২টি—হাওড়া জেল এবং উলুবেড়িয়া সাব জেল।

অপরাধ ও অপরাধী

হাওড়ায় স্থল পথের যখন বিশেষ বিস্তার ছিল না, তখন যাত্রীদের মত ডাকাতদেরও প্রধান ভরসা ছিল জলপথ। ডাঙ্গায় ডাকাতি করার সময় তাড়াতাড়ি চলাফেরা করার জন্য ব্যবহৃত হ'ত রণ-পা।

শ্যামপুর এলাকার তিনদিকে তিনটি নদী-গঙ্গা, দামোদর ও রূপনারায়ণ এবং জঙ্গলাকীর্ন জায়গার আধিক্যহেতু নবাবী আমলের শেষদিকে এটি বহু ডাকাতদলের আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়। বালী-খালের কাছে আজও একটি কালীমূর্ত্তি রতন বা রত্নাপাখী ডাকাতের কালী নামে পরিচিত। রতন নৌকাযোগে জলপথে ডাকাতি করত আবার স্থলপথে ডাকাতি করার সময় তাড়াতাড়ি চলাফেরার জন্য রণ-পা ব্যবহারে অত্যন্ত দক্ষ থাকায় রত্নাপাখী নামে অভিহিত হত। বালীখালের একাংশে ছিল তার আস্তানা। অঞ্চলটি এখনও পাখীর বাগান নামে পরিচিত। কালীমূর্ত্তিটি ছিল তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। বাগনান থানার একটি গ্রামের নাম ডাকাবেড়ে। গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন ডাকাইচণ্ডী। হয়ত আদিতে নাম ছিল ডাকাইতচণ্ডী—অর্থাৎ ডাকাইতদের দ্বারা পূজিতাদেবী এবং তদনুসারে গ্রামের নামকরণ হয়েছে। অনেক জায়গায় জমিদার এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ ডাকাতদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

অষ্টাদশ শতকের শুরুতে কলকাতায় যখন ইংরাজী শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত হয় তখন ডাকাত ও খুনীদের গালে ছাপ দিয়ে গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে নির্বাসন দেওয়া হ'ত।

"We have an example of this administration of criminal justice in 1706. In August of that year they ordered that a number of theives and murderers who had been recently cought should be branded on the cheek and turned on to the other side of the water,

—Early Annals of the English in Bengal—C. R. Wilson [Page—119 East light Book House edition.]

এইসব দুর্বৃত্তরা গঙ্গার পশ্চিমকূলে এসে যে বারানসীর সাধু হয়ে যেতেন না একথা বলাই বাহুল্য।

ইংরাজ শাসন কায়েম হ'বার মুখে সারা দেশ যখন অরাজকতায় ছেয়ে গেছে তখন দেশে চুরির চাইতে ডাকাতির সংখ্যা ছিল বেশী।

সালকিয়ার ভোটবাগান ছিল তিব্বতী বণিক ও তীর্থযাত্রীদের আশ্রয়কেন্দ্র। তিব্বতীরা দেশ থেকে নিয়ে আসত সোনা, কারণ ভারতের বাজারে তিব্বতী সোনার তখন জোর চাহিদা। ভোটবাগান মঠের প্রথম মোহান্ত পুরাণ গিরি এই সোনা চালান ও রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। সোনার লোভে ১৭৯৫ খ্রীঃ-এর এক রাতে ডাকাতদল মঠ আক্রমণ করলে পুরাণগিরি কয়েকজন সন্ন্যাসী নিয়ে তাদের প্রতিরোধ করতে গিয়ে সড়কির আঘাতে মারা যান। পরে চারজন ডাকাত ধরা পড়ে এবং মঠ প্রাঙ্গণেই তাদের ফাঁসী হয়। আজও মঠ প্রাঙ্গণে পুরাণ গিরি'র সমাধি বিদ্যমান। ১৮০০ খ্রীঃ-এ হাওড়া শহর ছিল আকারে খুবই ছোট এবং বনজঙ্গল ও ধানক্ষেতে ঘেরা। এই সময় রাহাজানি এতদূর বেড়ে গিয়েছিল যে সূর্যাস্তের পর রাস্তায় কেউ বেরোতে সাহস করত না। ডাকাতদের আশ্রয়স্থল ছিল ধানক্ষেত ও বন-জঙ্গল। ১৮৪২ খ্রীঃ-এ বালী ছিল ডাকাতদের অবাধ বিচরণ ভূমি। ১৮৪৬ খ্রীঃ-এ গঙ্গার ধারে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে ডাকাত পরে।

অনেকসময় ডাকাতি হ'ত চিঠি দিয়ে। এই রকম একটি কাহিনী হ'ল—আগে থেকে চিঠি দিয়ে শিবপুর গ্রামের বিখ্যাত ধনী জমিদার ভৈরব বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে সদানন্দ ঠাকুরের দল ডাকাতি করতে আসে। দলের কয়েকজন ডাকাতের নাম হ'ল রামঠাকুর, গোপাল মুখার্জী, যদু ডোম, হরিনারায়ণ কৈবর্ত্ত, নবীন গোয়ালা, গোবিন্দ চৌধুরী, জগন ঠাকুর, ঠাকুরদাস বাগদী এবং কালা কৈবর্ত্ত।

বিংশ শতকের শুরুতে লিলুয়া এবং মালি পাঁচঘরার মধ্যবর্ত্তী সত্যবালা দেবী হাঁসপাতাল সন্নিহিত "দারির জাঙাল" নামক এলাকা ছিল চোর ডাকাতদের আস্তানা। বেলুড় নিবাসী জনৈক পুলিন বন্দ্যোপাধ্যায় একবার সাহসের সঙ্গে এখানের ডাকাতদের সম্মুখীন হয়েছিলেন সেই বিষয়ে একটি সত্য কাহিনী হাওড়া-বার্তা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ট্রেন ছাড়া সে সময় রেলপথে বেলুড় যেতে হ'লে সাধারণত সবাই হেঁটেই যেতেন, কারণ বাসচলাচল তখন অজ্ঞাত। শালকের পর থেকে রাস্তায় কোন আলো ছিল না। সন্ধ্যার পর জি, টি, রোড ধরে বাড়ী ফেরার সময় দারির জাঙালের কাছে নিরস্ত্র পুলিন বাবু ডাকাতের হাতে পড়েন। কোনক্রমে আত্মরক্ষা করে বাড়ী ফিরে গিয়ে তিনি সেই রাত্রেই বাড়ী থেকে লাঠি যোগাড় করে নিয়ে একাকী আবার ঐ জায়গায় ফিরে এসে ডাকাতদের পর্যুদস্ত করেন। ১৯২৭-২৮-এ বালী ব্রীজ [বিবেকানন্দ সেতু] তৈরীর সময়ও জি, টি, রোড এলাকার বনে ঠ্যাঙারের উপদ্রব ছিল। যুক্তপ্রদেশের [এখনকার উত্তরপ্রদেশ] এবং বিহারের [মুখ্যতঃ পাটনা, মুঙ্গেরের] কিছু অধিবাসী সালকিয়াতে আস্তানা করে চুরি ডাকাতি ছাড়াও নৌকার মালপত্র লুঠ করা এবং নৌকার লাইসেন্স কেড়ে নেওয়ার কাজটি বেশ ব্যাপক ভাবে চালাত, এদের অস্ত্র ছিল লাঠি ও দাঁ। জনসাধারণের কাছে এই দলের অভিধা ছিল "পাসীস"।

সেকালের চুরি ডাকাতির সংগে চোরা কারবারও চলত। ১৮৭০-এ ২১ জন নূনের চোরা কারবারীকে ধরা হয় যার মধ্যে ২০ জনের শাস্তি হয়েছিল। এদের কাছ থেকে জরিমানা বাবদ আদায় হয়েছিল ১০ পাউণ্ড ১৭ শিলিং ৬ পেন্স। ১৮৭১খ্রীঃ-এ একই অপরাধে ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়, শাস্তি পায় ৭ জন, জরিমানা আদায় হয় ১৫ পাঃ ২ শিঃ ৬ পেঃ।

পঞ্চাশের মন্বন্তরে বাবা-মা মারা গেছে এমন কিছু অনাথ শিশুকে ১৯৪১-৪৩ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়া ষ্টেশন এলাকায় দেখা যায়। এরা বড় হয়ে বিপথে চালিত হয় এবং কানাগলি গ্যাং নামে পরিচিত একটি অপরাধী দলের সৃষ্টি করে। এদের কর্মক্ষেত্র ছিল পিলখানা [সালকিয়া] বেলেলিয়াস রোড এবং শিবপুরের কোন কোন অঞ্চল।

ডাকাতি নিবারণ ও আত্মরক্ষা

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গঠিত ডাকাতি কমিশন হাওড়ায় ডাকাতদের দৌরাত্ম্য নিবারণে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেয়। পুলিশ অনেক চেষ্টার পর ১৯৫৮-তে কানাগলি গ্যাংটিকেও নির্মূল করতে সক্ষম হয়।

চোর ডাকাতদের হাত থেকে ধন-প্রাণ রক্ষার জন্য সেকালে নানারূপ উপায় অবলম্বন করা হ'ত। থানা মাকুয়ায় বড়বাড়ী নামে অভিহিত বাড়ীটির তলা দিয়ে গঙ্গা পর্য্যন্ত বিস্তৃত সুড়ঙ্গ পথটি এ বাড়ীর অধিবাসীরা ডাকাতির সময় কিভাবে আত্মরক্ষা করতেন তার সাক্ষ্য দেয়।

পাতিহাল গ্রামের জমিদার বিশ্বাস বাড়ীর দোতলায় ছিল "ঝাঁপ-কপাট" যেটি ফেলে দিলে একতলা থেকে দোতলায় যাওয়া ছিল অসম্ভব।

অনেক বাড়ীতেই থাকত চোর-কুটুরী যেখানে গৃহস্থ মূল্যবান ধনসম্পত্তি চোরের ভয়ে লুকিয়ে রাখতেন।

স্বায়ত্ত শাসন

হাওড়া পৌরসভা

শাসনতান্ত্রিক কেন্দ্রহিসাবে ভারতের প্রশাসনিক মানচিত্রে হাওড়া শহরের অর্বির্ভাব ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে আর ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত হয় শহরের স্বায়ত্তশাসনের অঙ্গ হিসাবে হাওড়া মিউনিসিপ্যাল বোর্ড। অন্যান্য আরও অনেক বিষয়ের মত তদানীন্তন ইউরোপে প্রচলিত এই ধরনের ব্যবস্থাটিও ইংরেজরাই এদেশে প্রথম চালু করে।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়ায় প্রথম রেললাইন বসে। কলকাতার সংগে অবশিষ্ট ভারতের সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা রেলপথের মাধ্যমে যতই প্রসার লাভ করতে থাকে, হাওড়া শহরের সুষ্ঠু প্রশাসন ব্যবস্থার প্রয়োজন ততই তীব্র হতে থাকে, ফলে ১৮৫৪-তে চালু হয় "হাওড়া অফেন্স এ্যাক্ট"। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের আইন মোতাবেক ১৮৬২-তে স্থাপিত হয় হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি। সরকার প্রথম যে মিউনিসিপ্যাল কমিটি নিয়োগ করেন তার দেশী-বিদেশী সদস্যরা হলেন– বর্ধমান বিভাগের কমিশনার জি. গ্রাউডেন, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ই. সি. ক্র্যাস্টর, এল. ম্যাকনিকল, পি. ভি. নিকল, এ. সি, বেণ্ট, ডাঃ আর. বার্ড, ডি. ডব্লু. ক্যামবেল, সি এইচ. ডেনহ্যাম, বাবু রাজমোহন বোস, বাবু গোপাল লাল চৌধুরী এবং বাবু ক্ষেত্র মোহন মিত্র। বর্ধমান বিভাগের কমিশনার জি. গ্রাউডেনের সভাপতিত্বে ১৯.১.১৮৬৩ তারিখে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম বৈঠক বসে। পদাধিকার বলে বোর্ডের সেক্রেটারী হন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট।

১৮৬৪'র তৃতীয় আইন অনুসারে বালীকে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির অঙ্গীভুত করে ৪.৫.১৮৬৪ তারিখে একটি সরকারী ঘোষণা

ক্যালকাটা গেজেটে প্রকাশিত হয়। ঘোষণাটিতে পদাধিকার বলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে চেয়ারম্যান মনোনীত করে, চারজন পদাধিকারী সদস্য, একজন ভাইস চেয়ারম্যান এবং এগারজন সদস্যযুক্ত একটি কমিটির নাম ঘোষিত হয়। পদাধিকারী সদস্যদের মধ্যে ছিলেন ডিভিশনাল কমিশনার, একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার, পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট প্রভৃতি। ৪.৫.১৮৬৪ তারিখেই নবগঠিত বোর্ডের প্রথম বৈঠক হয়। পরবর্তীকালে কার্যকরী না হলেও বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল শশাটি, আন্দুল-মৌড়ী, কোনা এবং রাজগঞ্জকে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্ভূক্ত করা হবে।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ নম্বর আইনে মিউনিসিপ্যালিটিকে পুনর্গঠিত করে এটিকে প্রথম শ্রেণীর মিউনিসিপ্যালিটির মর্যাদা দেওয়া হয়। ডিভিশনাল কমিশনার এবং একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার আর পদাধিকারী সদস্য রইলেন না। তাঁদের শূন্যস্থান পূরণ করলেন সিভিল সার্জেন ও স্যানিটারী কমিশনার। যে কোন অনুপাতে সরকারী ও বে-সরকারী সদস্য মনোনয়নের সম্পূর্ণ ভার রইল সরকারের হাতে।

১৮৮৩-তে বালী, লিলুয়া, বালটিকুরী, বাঁটরা, ও জগাছা হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির মায়া কাটিয়ে বালী মিউনিসিপ্যালিটি, হাওড়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড এবং লিলুয়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড গঠন করে।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের তিন নম্বর আইনে হাওড়া শহরটিকে দশটি ওয়ার্ডে ভাগ করা হয় এবং ওয়ার্ডের আয়তন ও লোকসংখ্যা অনুসারে কমিশনারের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। অবশ্য ২, ৫, ৬ এবং ১০ নম্বর ওয়ার্ডের মালিপাঁচঘরা, বামনগাছি এবং কাসুন্দিয়া এলাকায় প্রচুর ধানজমি ও কৃষিক্ষেত্রের অস্তিত্ব হেতু এই সমস্ত এলাকায় ওয়ার্ডের সীমারেখা খুব সুনির্দ্দিষ্ট ছিল না। আইনে মোট কমিশনারদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ নির্বাচিত এবং এক-তৃতীয়াংশ মনোনীত হবেন বলে ঘোষণা

করায় ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে নভেম্বর এবং ১লা ডিসেম্বর হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই আইনে সর্ব প্রথম মনোনীত চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের পরিবর্তে বোর্ডের সদস্যদের দ্বারা তাদের নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ই. সি ক্র্যাস্টর নির্বাচিত হয়ে পুনরায় চেয়ারম্যান হিসাবে ঘোষিত হন। বোর্ডের অন্যান্য নির্বাচিত কমিশনারদের মধ্যে কেদার নাথ ভট্টাচার্য ছিলেন প্রথম বে-সরকারী ভারতীয় কমিশনার। ইনি ভাইস-চেয়ারম্যান হিসাবেও নির্বাচিত হন।

১৮৮৬'র ৭ই এপ্রিল প্রথম বে-সরকারী ব্যক্তি হিসাবে উপেন্দ্র নাথ মিত্র চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। নির্বাচন ব্যবস্থায় ত্রুটি ছিল এই অজুহাতে সরকার নির্বাচনটিকে অবৈধ ঘোষণা করায় প্রথম বে-সরকারী চেয়ারম্যান হ'বার গৌরব লাভ করেন মহেন্দ্র নাথ রায়। ৪,৩,১৮৯১ তারিখে উপেন্দ্র নাথ মিত্র চেয়ারম্যান হিসাবে পুনর্নির্বাচিত হন। কিন্তু অসুস্থতার অজুহাতে তিনি ১১,১,১৮৯২ তারিখে পদত্যাগ করেন।

১৯১৬'র ৯ই এপ্রিল যেদিন মহেন্দ্র নাথ রায় চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। সেদিন থেকেই প্রকৃতপক্ষে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির বেসরকারী যুগের শুরু। শ্রী রায় ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম কয়েকমাস পর্য্যন্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব ভার বহন করেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল শ্রী চারু চন্দ্র সিংহ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তিনি ২০,৮,১৯২৮ তারিখ পর্য্যন্ত ঐ পদের কর্ত্তব্যভার বহন করেন। তাঁর আমলেই-১৯২২-এ হাওড়ার প্রথম কলেজ নরসিংহ দত্ত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ বছরই নবনির্বাচিত কমিশনারদের নিয়ে যে কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল কমিটি গঠিত হয় তার সভাপতি ছিলেন সাহিত্যিক শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি মিউনিসিপ্যালিটির Prevention of cruelty to Animals [পশুক্লেশ নিবারণী সমিতি] কমিটিরও চেয়ারম্যান ছিলেন।

হাওড়া তথা বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে সুপরিচিত ব্যক্তি বরদা প্রসন্ন পাইন ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে আগষ্ট থেকে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মার্চ পর্যন্ত হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। শ্রী পাইন ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মার্চ পদত্যাগ পত্র পেশ করেন। ২৩দিন পর ২৪শে মার্চ তাঁর পদত্যাগ পত্র গৃহীত হয়। উপনির্বাচনে তাঁর নাম চেয়ারম্যান হিসাবে প্রস্তাবিত হলে হাইকোর্টে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে একটি নালিশ রুজু হয়। ১৯৩২-এর মার্চ থেকে ৪ঠা ডিসেম্বর পর্যন্ত ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রী খগেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলী চেয়ারম্যানের কর্তব্য সম্পাদন করেন।

১৯৩৩-এর ৬ই ডিসেম্বর বঙ্কিমচন্দ্র দত্ত চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ১৯৩৬-এর ৯ই ডিসেম্বর পণ্ডিত জহর লাল নেহেরুকে হাওড়ায় নাগরিক সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। ৩,৫,৩৮ তারিখ পর্যন্ত বঙ্কিমবাবু চেয়ারম্যান ছিলেন। বরদা প্রসন্ন পাইন দ্বিতীয়বারের জন্য চেয়ারম্যান হন ৪,৫,৩৮ তারিখে এবং ১৯৪৫-এর মে মাস পর্যন্ত ঐ পদে আসীন থাকেন। তাঁর আমলে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুকে হাওড়ায় নাগরিক সম্বর্ধনা জানানো হয়।

১৯৪৫-এর মে মাস থেকে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই পর্যন্ত চেয়ারম্যান ছিলেন শৈল কুমার মুখোপাধ্যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালের এই সময়টিতে শ্রমিক অসন্তোষ ব্যপক আকার ধারণ করে। ১৯৪৭-এর ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা পাওয়ার ফলে মিউনিসিপ্যালিটির অফিস সীল-এর পরিবর্তন ঘটে। কার্তিকচন্দ্র দত্ত ২৭.২.৫১ থেকে ২০.৪.৫৪ পর্য্যন্ত চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৫-'র ২১শে এপ্রিল বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট ১৯৩২ এর ৫১৪ ধারা অনুসারে আর. এস ত্রিবেদী আই. সি. এস মিউনিসিপ্যালিটির এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত হন। এইভাবে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে মিউনিসিপ্যালিটিতে যে বে-সরকারী যুগের শুরু হয়েছিল তার সাময়িক বিরতি ঘটে।

পুনরায় কিছুকাল নির্বাচিত কমিশনারদের দ্বারা মিউনিসিপ্যালিটির

কার্য্যাবলী পরিচালিত হ'বার পর ১৯৬২-তে রাজ্য সরকার নির্বাচিত প্রতিনিধিদল বাতিল করে প্রশাসক নিযুক্ত করেন। আবার ২৮.২.৭৮ -এ সরকারী নির্দেশে ৩০জন সদস্য সমবায়ে গঠিত পরিচালন পর্ষদের কাছে এই পর্য্যায়ে শেষ প্রশাসক অমিত কুশারী তাঁর কার্যভার বুঝিয়ে দেন। ১.৩.৭৮ তারিখে যে নুতন কমিটি কার্য্যভার গ্রহণ করেন তার সভাপতি-আলোক দ্রুত দাস এবং সহ-সভাপতি অজিত বসু।

সরকার মনোনীত কমিশনারগণ

১৮৮৪খ্রীঃ পর্য্যন্ত মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণ সরকার কর্ত্তৃক মনোনিত হতেন। কমিশনারদের সংখ্যা ছিল ২০ থেকে ৩০ জনের মধ্যে। ১৮৭৭-৭৮ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ভারতীয় কমিশনারের সংখ্যা ছিল ইউরোপীয় কমিশনারদের অর্ধেক। মনোনীত ভারতীয় কমিশনারগণের মধ্যে কয়েকজন হ'লেন আব্দুল রশীদ কাজী, চন্দ্রকুমার ব্যানার্জী, দ্বারকানাথ ব্যানার্জী, হরিনাথ শর্মা, জগৎচন্দ্র ব্যানার্জী [বালী], ক্ষেত্রমোহন মিত্র, কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য, নরসিংহ দত্ত, রমেশ্বর মালিয়া এবং উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র।

একটিও ভোট না পেয়েও কমিশনার

কথায় বলে, যে এল চষে সে রইল বসে, নেপোয় মারে দই। হাওড়ায় কর্মরত স্কটিস্ সৈন্যটির ভাগ্যে তাই ঘটেছিল। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি ছিলেন সৈন্যবাহিনীতে। বিদ্রোহের অবসানে হন হাওড়ার এক দড়ির কারখানার ম্যানেজার। মিউনিসিপ্যাল বোর্ড গঠনে পুরবাসীদের ভোটাধিকার দেওয়ার জন্য বিভিন্ন সংবাদপত্রে লিখিত তাঁর প্রবন্ধাবলী সরকারীমহলে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। পৌর নির্বাচন ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে তিনি কিন্তু একটিও ভোট পান নি; অবশ্য

সরকারী মনোনয়নে কমিশনার হতে পেরেছিলেন। দুঃখের বিষয় পরবর্তীকালের নাগরিকদের জানানোর জন্য সে আমলের কোন কৃতজ্ঞ ভোটাধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তি তার নামটি কোথাও লিখে রেখে যাননি।

বালী পৌরসভা

বালী গ্রাম থেকে শহর হ'ল। শহরের আলো, জল, রাস্তাঘাট তৈরী ও পরিষ্কার রাখা এবং শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল গঠিত হল বালী পৌরসভা। তার আগে ১৮৮২-৮৩ খ্রীঃ পর্য্যন্ত বালী ছিল হাওড়া পৌরসভার অন্তর্গত।

জন্মমুহূর্তে পৌর এলাকার পরিমাপ ছিল ৩,০৬ বঃ মাঃ এবং ওয়ার্ডের সংখ্যা দুই। পরের বছর বালীর সংগে বরবাকপুর [বারেন্দ্র পাড়া থেকে ঘুসুড়ি পর্য্যন্ত ব্যারাকপুর অঞ্চল], কৃষ্ণচন্দ্রপুর [ব্যারাকপুর থেকে বেলুড়ের পশ্চিমাংশ], ইছাপুর [ঘুসুড়ির কিছু অংশ] বেলুড়, এবং নকম [লিলুয়া রেল কলোনী] যুক্ত হলে ৪টি ওয়ার্ডে বিভক্ত পৌর এলাকার পরিমাপ হয় ৪.৫৬ বঃ মাইল। সবশেষে ভট্টনগরকে ৫নং ওয়ার্ড করে পৌরসভার বর্তমান এলাকা ৪.৫৮ বঃ মাইল।

বাংলার মিউনিসিপ্যালিটি সমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয় বালী পৌরসভায়। প্রথম চেয়ারম্যান কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। ভাইস চেয়ারম্যান অবিনাশচন্দ্র ব্যানার্জী।

১৯৫৩ থেকে, ৫৬ খ্রীঃ পর্য্যন্ত পৌরসভাটি ছিল এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর পরিচালিত। এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর ছিলেন মিঃ এস, এম, চৌধুরী। কিছুকাল বিরতির পর আবার এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত করা হয় ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে,। ১৯৭৮ এ প্রশাসক পরিচালনার অবসানের পর ২৫ জন সদস্যের যে কমিটি হয় তাতে পৌরপতি হিসাবে যোগদেন পতিত পাবন পাঠক।

পৌর এলাকার লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ৩৫ হাজার ২১২ জন, রাস্তার সংখ্যা ১৪৪টি। সমগ্র পৌর এলাকায় নিঃশুল্ক পৌর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা পাঁচ। C. M. D. A—এর নিকট থেকে অর্থ সাহায্য পাওয়া সত্বেও প্রয়োজনের তুলনায় পৌরসভার আয় সামান্য।

গঙ্গার তীরে ঘাটের সংখ্যা ৪০টি। বালী পাঠক ঘাট এবং বেলুড় মড়াপোড়া ঘাট দু'টি শবদাহের জন্য নির্দিষ্ট। এছাড়া পঞ্চাননতলা, পালপাড়া, বেলুড়মঠ ও বারেন্দ্রপাড়া ঘাটে পৌরসভার অনুমতি সাপেক্ষে শবদাহ করা যায়।

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি ও বালী মিউনিসিপ্যালিটিকে একত্র করে হাওড়া করপোরেশন গঠনের যে চেষ্টা হয়েছিল নানারূপ আপত্তির জন্য তা বাস্তবায়িত করা যায়নি।

উলুবেড়িয়া পৌরসভা

হাওড়ার তৃতীয় মিউনিসিপ্যালিটির জন্ম উলুবেড়িয়ায় ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল, মৃত্যু ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ। চারবছর বেঁচে থাকা মিউনিসিপ্যালিটির লোকসংখ্যা ছিল ৫০০ জন, বার্ষিক আয় ৩৯১০ টাকা।

হাওড়া জেলা বোর্ড, জেলা পরিষদ এবং গ্রাম পঞ্চায়েৎ

বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্ত শাসন আইন [১৮৯৯] অনুসারে বাংলা দেশের অন্যান্য জেলার ন্যায় হাওড়াতেও ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ইউনিয়ন বোর্ড ও জেলা বোর্ড গঠিত হয়, ২৩.১০.১৯৬৪ তারিখ থেকে জেলা বোর্ডের স্থলাভিষিক্ত হয় জেলা পরিষদ। প্রস্তাবিত হাওড়া করপোরেশন বাদে জেলা পরিষদের এক্তিয়ারভুক্ত এলাকার পরিমাপ ছিল—১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারী অনুসারে ১৩২৩. ৭ বর্গ কিলোমিটার লোকসংখ্যা ১৪,০৩,৭৫০ জন। নবগঠিত জেলা

পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন—বিশ্বরতন গাঙ্গুলী, উপ-সভাপতি জ্ঞানেন্দ্রনাথ হালদার। জেলাপরিষদ নিম্নলিখিত ৭টি স্থায়ী সমিতি গঠন করেছিল—১) অর্থ এবং কর্মি ২) পূর্ত, ৩) জনস্বাস্থ্য ৪) জন ও সমাজকল্যাণ ৫) কৃষি ও সেচ ৬) প্রাথমিক শিক্ষা এবং ৭) শিল্প ও সমবায়।

৪৯ জন সদস্য বিশিষ্ট পরিষদটিতে মহিলা সদস্যার সংখ্যা ছিল ২, মুসলমান সদস্য ২ এবং তপশীলি সম্প্রদায়ের ৪ জন।

১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল জেলাপরিষদ ও স্থায়ী সমিতি-গুলিকে বাতিল করে একজন প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। অবশেষে ১৯৬৯-এর ২০শে জুন আদালতের নির্দেশবলে প্রশাসকের সম্মতি সাপেক্ষে সভাপতি এবং উপসভাপতি জেলা পরিষদ আইন অনুযায়ী কাজ চালিয়ে যাওয়ার অধিকার পান।

১৯৭৮-এর ৪ঠা জুন গ্রাম পঞ্চায়েত ও জেলা পরিষদের এক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জেলা পরিষদের বর্তমান সভাধিপতি শিবপ্রসাদ সেনগুপ্ত।

হাওড়া টাউন হল

হাওড়ায় টাউন হ'ল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সর্বপ্রথম চিন্তা করা হয় ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে। হাওড়া পিপলস্ এসোসিয়েশন এ বিষয়ে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও জেলাশাসক মিঃ সি, ই, বাকল্যাণ্ডকে একটি চিঠি দেন। পৌর প্রতিষ্ঠানের সভায় স্থির হয় ২৮,৫০০ টাকার আসবাব পত্র সহ ২৬,৫০০ টাকা ব্যয়ে এই হ'ল নির্মাণ করা হবে একতলা মিউনিসিপ্যালু অফিসের উপরে। ১২.১.১৮৮৩ তারিখের সভায় স্থির হয় জনসাধারণের অর্থে এই টাউন হ'ল নির্মিত হবে এবং পৌর প্রতিনিধিরা এজন্য একটি অছি পরিষদ গঠন করবেন। ৩০,৩,১৮৮৩ তারিখে প্রথম অছি পরিষদ গঠিত হয়। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে হলের নির্মাণকার্য্য শেষ হয়

এবং ১৪,৩,১৮৮৪-তে বাংলার তদানীন্তন লেফটেনাণ্ট গভর্ণর মিঃ এফ. এইচ. স্ক্রিন ইহার উদ্বোধন করেন।

৫, মহাত্মা গান্ধী রোডস্থ হাওড়া পৌর প্রতিষ্ঠানের এলাকার মধ্যে দ্বিত'ল টাউন হ'লের অবস্থান। একতলায় এবং দোতলার কিছু অংশে পৌরপ্রতিষ্ঠানের অফিস। দ্বিতলের হলটির মেঝে ৬" ইঞ্চি পুরু কাঠের। হলটি লম্বায় ৬৬ ফুট, চওড়ায় ৪২ ফুট এবং উচ্চতায় ২১ ফুট। হলের দুইধারে বারান্দা আছে। হ'লের পশ্চিম গায়ে একটি প্রস্তর ফলকে টাউন হল নির্মাণে যাঁরা ১০০ টাকা ও তদূর্ধ টাকা দান করেছেন তাঁদের নাম ও দানের পরিমাণ উল্লিখিত আছে। নীচের সামনে একসময় একটি বাগান ছিল। এখনও কয়েকটি গাছ আছে। ১৯৫০-এ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র যখন প্রজাতন্ত্ররূপে ঘোষিত হয় তখন একটি ৩০ ফুট উঁচু মার্বেল পাথরের একটি স্মারক স্তম্ভ পৌর-প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ে এই বাগানে স্থাপন করা হয়। টাউন হল নানা অনুষ্ঠানের জন্য ভাড়া দেওয়া হয়।

উন্নয়ন পর্যদ

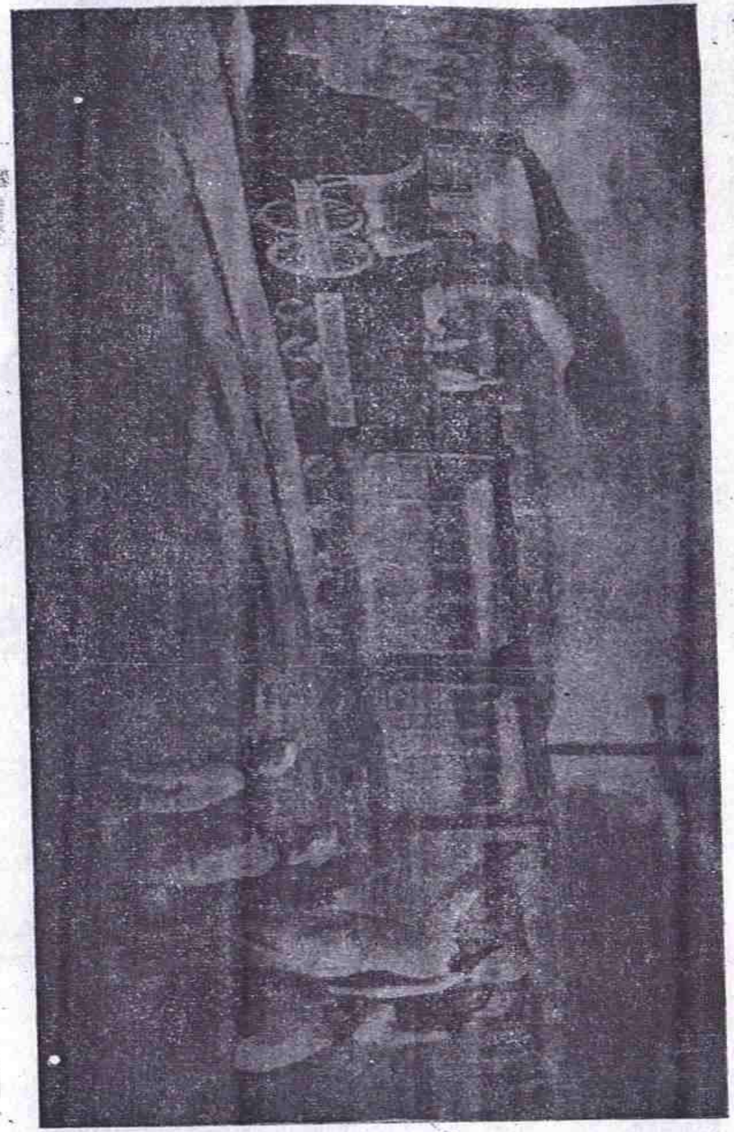
হাওড়া ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান মিঃ বমপাস মন্তব্য করেন, হুগলী নদীর পশ্চিম পাড়ের শহরটিও যাতে পুব পাড়ের শহরের মত আগোছালো ভাবে বেড়ে না ওঠে সেজন্য কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের কর্ম পরিধি হাওড়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত করা প্রয়োজন। এর আগে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে মেসার্স ম্যাডেন (Maden) এবং শ্রসব্রী [Shrosbree] কলকাতার প্রধান পথ-গুলির উন্নয়নের জন্য পঞ্চাশ লাখ টাকা বরাদ্দের সুপারিশ করে যাওয়ায় মিঃ বসপাসের প্রস্তাবটি কার্য্যকরী হবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু স্যার রাজেন্দ্রলাল মুখার্জী প্রমুখদের বিরুদ্ধতায় তার প্রস্তাবটি ৬-৫ ভোটে অগ্রাহ্য হয়। বিরোধীদের দাবী ছিল হাওড়ার জন্য

স্বতন্ত্র ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট স্থাপন করা হোক। এই ঘটনার দীর্ঘ দিন পর ২০.৯.১৯৫৫ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় হাওড়া ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট বিল পেশ করা হয়। West Bengal Act XIV of 1956 অনুসারে ১.৬.১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়া ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট গঠিত হয়। ১৯ জি, টি, রোড, [দক্ষিণ-]এ বর্তমানে ট্রাষ্টের অফিস। ট্রাষ্টের কার্যাবলীর মধ্যে আছে জল সরবরাহের উন্নতি সাধন, যানবাহন সমস্যার সমাধান, সড়ক উন্নয়ন, জঞ্জাল অপসারণ, পার্ক ও ক্রীড়া উদ্যান নির্মাণ, প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহনির্মাণ, পয়ঃ প্রণালী ও বালী খালের সংস্কার প্রভৃতি। ধার্সাতে [দাশনগর-রামরাজাতলা রেলপথের পশ্চিমে] পয়প্রণালী শোধনাগারটি চালু হ'লে সহর স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটবে।

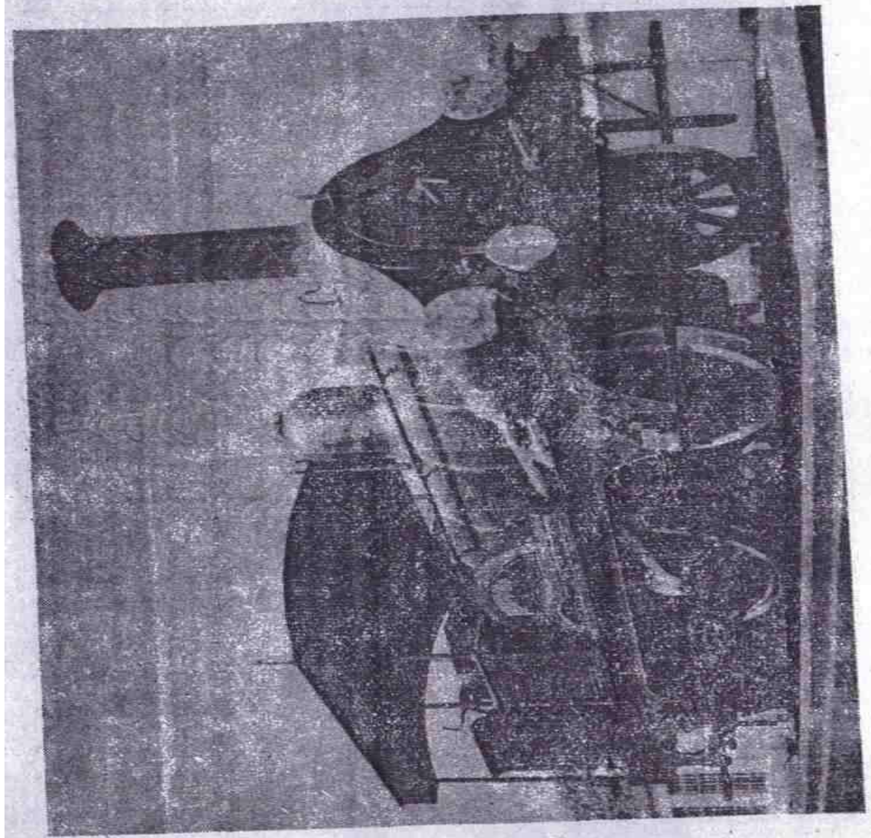
বেলিলিয়াস পার্ক

এককালে কলকাতার যে কোন বড় পার্কের সঙ্গে হাওড়ার এই পার্কের তুলনা চলত। ১০০ বিঘা জমির এই পার্কটিতে আছে ঝিল, বাগান, লন এবং ফুটবল খেলার মাঠ। পার্কের মাঝখানে আছে বসবার জায়গা। বেলিলিয়াস রোডের উপর এই পার্কের পাশেই নরসিংহ দত্ত কলেজ। কলেজ ভবনসহ এই পার্কটি পূর্বে বেলিলিয়াস গার্ডেন নামে পরিচিত ছিল। মালিক ছিলেন আইজ্যাক রাফায়েল বেলিলিয়াস [Issac Rapheal Bellilious]। এটি ছিল তাঁর বাগানবাড়ী। পত্নী রেবেকা আইজ্যাক বেলিলিয়াসের অনুরোধে তিনি এটি জনসাধারণকে দানের সঙ্কল্প করেছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর এই সঙ্কল্পকে বাস্তবায়িত করার জন্য শ্রীমতী বেলিলিয়াস ৩,১২, ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি অছি পরিষদ গঠন করেন। অছিতে ছিলেন তিনি এবং ৺নরসিংহ দত্তের পুত্র সুরঞ্জন দত্ত। ১৯,৮,১৯২৩-এ শ্রীমতী বেলিলিয়াসের মৃত্যুর পর সুরঞ্জন দত্ত অছি হিসাবে পার্কের পরিচালনার ভার ১৯২৪-এর ৪ঠা ফেব্রুয়ারী পৌর প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে হস্তান্তর করেন। পৌর প্রতিষ্ঠান ১,৩, ১৯২৪ তারিখে জনসাধারণের জন্য পার্কটিকে উন্মুক্ত করেন।



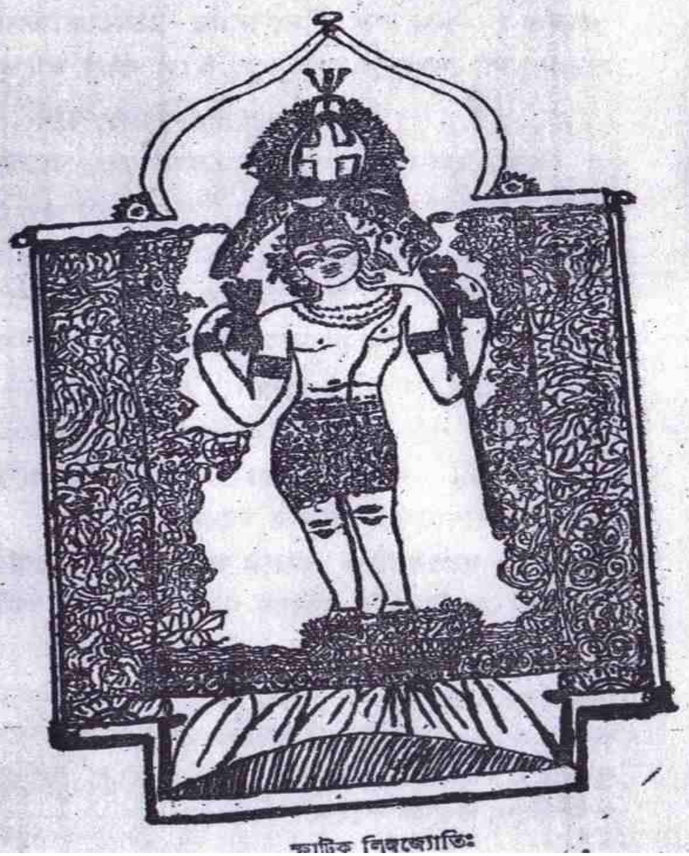
সেকালের রেলগাড়ী

প্রথম যুগের রেল ইঞ্জিন



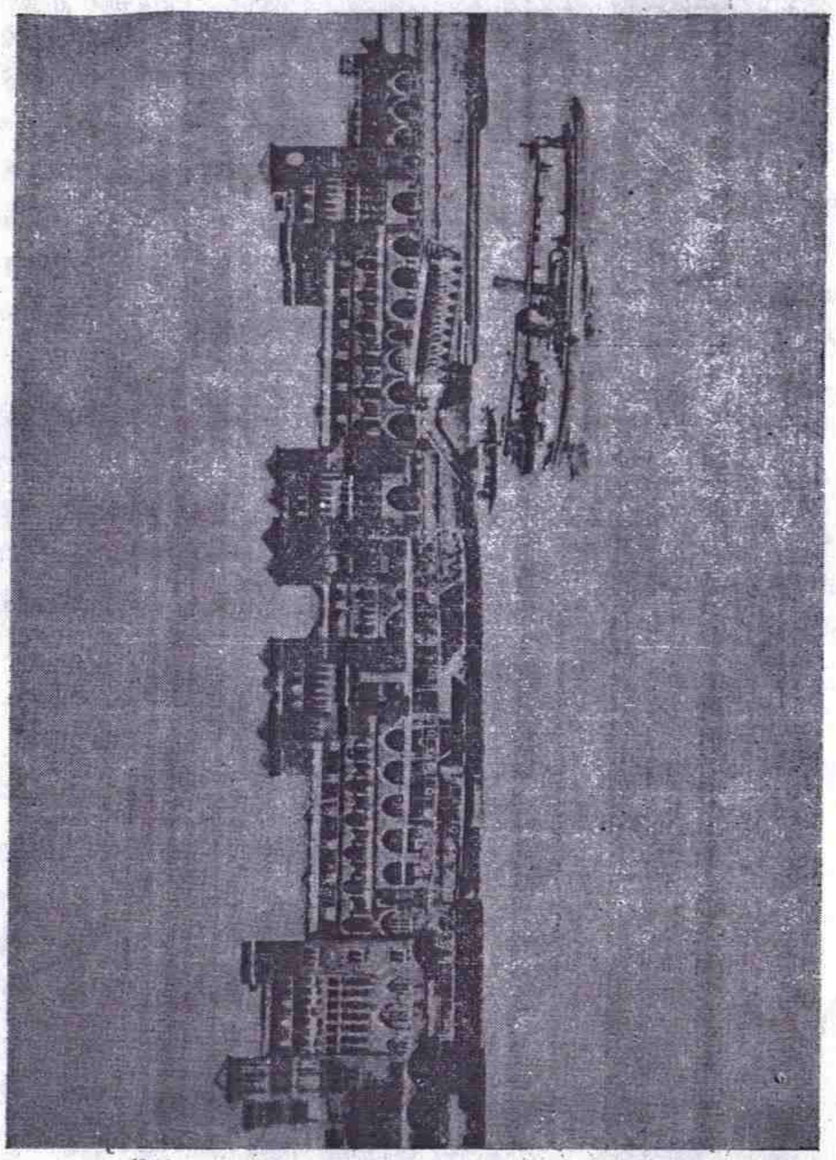
হাওড়া ষ্টেশনের যে জায়গা থেকে প্রথম রেলগাড়ী চালু হয়





স্ফটিক লিঙ্গজ্যোতিঃ

হাওড়া কোর্ট



দ্বিতীয় অধ্যায়

পথ, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

বাংলার, শুধু বাংলার নয়, ভারতের আরও অনেক অঞ্চলের মত হাওড়াতেও হিন্দু ও মুসলীম যুগে বেশী দূরে যাওয়া আসার একমাত্র মাধ্যম ছিল জলপথ। অনেক মেহনতের পর মাঝে মাঝে জলে নামলেও—এখন আমরা ডাঙ্গায় উঠেছি। স্থল পথ নির্ভর যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি ইংরাজ আমলেই—বাষ্পীয় শক্তির আবিষ্কার এবং রেলপথ প্রতিষ্ঠার পর। তাই প্রথমে জলপথের কথাই আলোচনা করছি।

জলপথ

জাহাঙ্গীর যখন দিল্লীর বাদশাহ তখন বাদশাজাদা, শাজাহান উড়িষ্যা থেকে সপ্তগ্রাম বন্দর পরিদর্শনের জন্য বজরাযোগে সরস্বতী নদীপথে হাওড়ার মধ্যদিয়ে গিয়েছিলেন,' এরূপ কাহিনী প্রচলিত আছে। বড় বড় জলযান যাতায়াতের পক্ষে এ অঞ্চলে তখন সরস্বতীই ছিল মুখ্য নদীপথ, সামুদ্রিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণকারী বৃহদায়তন জলযানগুলি এপথেই যাতায়াত করত।

রূপনারায়ণ, ভাগীরথী ও দামোদরের নাব্যতার জন্য প্রাচীনকাল থেকেই হাওড়ারবিভিন্ন গ্রাম থেকে নৌকায় মাল ও যাত্রীবহন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল—যার সামান্যই আজ অবশিষ্ট আছে।

লর্ড বেণ্টিক যখন ব্রিটিশ ভারতের সর্বময় কর্তা—তখন ১৮৩৪ খ্রীঃ-এ কলকাতা এলাহাবাদ স্টীমার চলাচল করত, ক্যালকাটা ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর ষ্টীমার চলত, হাটখোলা (কলকাতা) থেকে

কালনা (বর্ধমান) পর্য্যন্ত। কালক্রমে নদীগুলির নাব্যতা কমে যাওয়ায় দূরপাল্লার যাত্রী ও পণ্যবাহী ষ্টীমার চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এক সময় কলকাতা থেকে হাওড়া জেলার দক্ষিনাংশে রাজগঞ্জ ও সাঁকরাইল পর্য্যন্ত হোর মিলার এণ্ড কোম্পানীর ষ্টীমার চলাচল করত। বালী-বেলুড় থেকেও সে সময় ষ্টীমার যোগে কলকাতার অফিস পাড়ায় বহুযাত্রীর চলাচল ছিল। বালী থেকে পোর্ট কমিশনার, এর জাহাজে হাওয়া খেতে খেতে ফাষ্ট ক্লাসে কলকাতা যাওয়া-আসা ছিল বাবুমশায়দের বৈকালিক বিলাস-ব্যসনের অঙ্গ বিশেষ।

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে আর্মেনিয়ান ঘাট (কলকাতা) হাওড়া ঘাট বাষ্পচালিত ষ্টীমার ফেরির প্রবর্তন করেন মিঃ টেলার। অনেক হাত ঘোরার পর ব্যবসাটির মালিক হ'ন জনৈক ভারতীয় যিনি বাঁধাঘাট—হাটখোলা ঘাটেও ষ্টীমার ফেরি'র ব্যবস্থা করেন। দু'বছর চলার পর দু'টি ষ্টীমারই ডুবে যায়। আবার চালু হ'বার পর ষ্টীমার দু'টিকে ধ্বংস করে সাইক্লোন। এক সময় ই, আই, আর কোম্পানী রেলযাত্রীদের সুবিধার্থে ক্যালকাটা এবং হাওড়া নামে দু'টি ষ্টীমার চালাতেন। শিবপুর—চাঁদপাল ঘাট, তেলকলঘাট-চাঁদপাল ঘাট, এবং ভাসমান হাওড়া পোল খোলা হলে হাওড়া ষ্টেশন থেকে আর্মেনিয়ান ঘাট পর্য্যন্ত যে সব ফেরি সার্ভিস ছিল সেগুলি এক এক করে বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৮১-৯২ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়ার তেলকল ঘাট থেকে কলকাতার কয়লা ঘাট পর্যন্ত হোরমিলার কোম্পানীর ষ্টীমার চলত। এখন সালকিয়া—আহিরীটোলা এবং রামকৃষ্ণপুর—চাঁদপাল ঘাট লঞ্চ সার্ভিস মারফৎ শহর এলাকার বহু-যাত্রী বাহিত হয়। সম্প্রতি সরকারী উদ্যোগে ছুটির দিন ব্যতীত অন্যান্য দিনগুলি হাওড়া ষ্টেশন থেকে—আর্মেনিয়ান ঘাট ও চাঁদপাল ঘাট এবং চাঁদপাল ঘাট থেকে শিবপুর বাগবাজার মায় বালী পর্য্যন্ত পুনরায় লঞ্চ সার্ভিস প্রবর্তন করা হয়েছে। বেলুড়, সালকিয়া,

রামকৃষ্ণপুর এবং শিবপুর থেকে নৌকায় কলকাতা যাবার ব্যবস্থা আছে।

বেঙ্গল-নাগপুর [বর্তমানের দঃ পুঃ] রেলপথের কটক শাখা চালু হ'বার আগে মেদিনীপুর যেতে হ'লে জলপথে আর্মেনিয়ান ঘাট থেকে উলুবেড়িয়া হয়ে দামোদরের মধ্য দিয়ে গিয়ে গাইঘাটা বাক্‌সী খাল পার হ'য়ে রূপনারায়ণ নদে পড়ে পাড়ি জমাতে হ'ত। ডানকুনি জলা থেকে হুগলী নদী পর্য্যন্ত বালীখাল নাব্য ছিল। দৈনিক ষ্টীমার সার্ভিস কলকাতা-রাজগঞ্জ, উলুবেড়িয়া-ঘাটাল এবং কলকাতা-কালনা [বালী উত্তরপাড়া হয়ে] পথে চালু ছিল।

১৮৮০ খ্রীঃ-এ শিবপুর থেকে আমতায় মামার বাড়ী কিভাবে যেতে হত এ সম্পর্কে বসন্ত কুমার পাল "স্মৃতির অর্ঘ্য"-এ নিবেদন করেছেন-"শিবপুর হ'তে পান্সিতে, না হয় আর্ম্মানী ঘাটে হোর মিলারের ষ্টীমারে উলুবেড়িয়া পর্য্যন্ত গিয়ে মাঠে জল না থাকিলে বরাবর পান্সি করে উলুবেড়িয়ার কাটাখালের "লকগেট" দিয়ে দামোদর নদী হ'য়ে আমতার বন্দরে এসে পহুঁছিতাম। রাস্তাঘাট শুকনা থাকলে ঘোড়ার গাড়ীতে বড়গেছে হ'য়ে আমতার ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের বাঁধ দিয়ে যাওয়া যাইত।"

১৮৮৮-তে হাওড়া চ্যাপেলের ব্যাপটিষ্ট মিশনারী মিঃ উইলিয়াম কেরীর লেখা ভ্রমণ কাহিনী থেকে জানা যায়, অসংখ্য নাব্য খালের অস্তিত্ব হেতু বর্ষাকালে জলপথে জেলার যে কোন জায়গায় যাওয়া যায়। অবশ্য বেশীর ভাগ খালেই ব্যবহৃত হ'ত ছোট নৌকা। যে খালটি গঙ্গা থেকে উলুবেড়িয়ার মধ্য দিয়ে ৮ মাইল গিয়ে দামোদর এবং আরও ৪ মাইল গিয়ে রূপনারায়ণে পড়ত সেটি চওড়ায় ছিল ৩৬ ফুট এবং গভীরতায় ৯ ফুট। খালে দু'টি লকগেট ছিল। উলুবেড়িয়ার কাছে যে লকগেট ছিল সেখানে নৌকা মেপে টোল আদায় করা হ'ত। গ্রীষ্মে উলুবেড়িয়া খালের উত্তরে দামোদর

নৌ-বাহনের অযোগ্য হ'লেও তালগাছের ডোঙায় লোকে যাতায়াত করত। নদীর উঁচু বাঁধ ব্যতীত হাওড়া শহরের বাহিরে কোন উল্লেখযোগ্য রাস্তা ছিল না। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যেতে হলে হয় কাঁচা রাস্তা কিংবা আলপথই ছিল ভরসা।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী শরৎচন্দ্রের মেজভাই স্বামী বেদানন্দ দাদার হাওড়া শহর ছেড়ে সামতাবেড়ে যাওয়া উপলক্ষে দিনলিপিতে লিখে গেছেন—আজ দাদার দেশে যাবার জন্য একটা ৭০০ মণে নৌকায় এখানকার বাড়ীর সব জিনিষ বোঝাই হ'ল। শুনছি এঁরা বুধবার ২৪শে দেশে সপরিবারে যাবেন।

খেয়াঘাট

জলপথে যাতায়াতের সুবিধার জন্য খেয়াখাটের ব্যবস্থা এই জেলায় অনেক বছর আগেই জেলা বোর্ড প্রবর্ত্তন করেছিলেন। প্রায় ৪০ বছর আগে মিউনিসিপ্যাল এলাকার বাইরে যে ১১টি খেয়াঘাটের নাম পাওয়া যায় সেগুলি হ'ল—

[ক] দামোদর নদের উপর — ১/ মহিষরেখা ২/ বোয়ালিয়া [বাগনান থানা]। ৩/ গড়চুমুক [শ্যামপুর থানা] ৪/ শ্যামপুর

[খ] রূপনারায়ণ নদের উপর — ৫/ বাকুসী ৬/ শশাটী [শ্যামপুর থানা] ৭/ মানকুর [বাগনান থানা] ৮/ গোপীগঞ্জ [আমতা থানা] ৯/ ঝুমঝুমী [শ্যামপুর থানা]

[গ] কানা নদীর উপর — ১০/ সিজবেড়িয়া [উলুবেড়িয়া থানা] এবং [ঘ] সরস্বতী নদীর উপর — ১১/ সাঁকরাইল খেয়াঘাট।

আগে মাদারিয়া খাল, বালী খাল, কালসাপা খাল, মিঠাকুণ্ড খাল, দামোদর ও রূপনারারণ সংযোগকারা বাঁশপাতি খাল, গাইঘাটা খাল প্রভৃতিতে নৌকা চলাচলের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য ছিল।

বর্তমানে হাওড়া জিলা পরিষদ পরিচালিত জেলার মধ্যে ১২টি ফেরী সার্ভিস এবং ১১টি আন্তঃ জেলা ফেরী সার্ভিস প্রধান।

জেলার মধ্যের ১২টি ফেরী সার্ভিস হ'ল গাইঘাটা খালে ১টি রূপনারায়ণ নদে ৫টি [গোপীগঞ্জ পানশিউলী, দুধকুমরা, মানকুর এবং আঁতিলা, পাড়া], বাঁশপাতি খালে ১টি [সিজবেড়িয়া] এবং দামোদর নদে ৫টি [খদিনান, বাঁশবেড়িয়া, গড়চুমুক, বোয়ালিয়া ও শ্যামপুর]

আন্তঃ জেলা ফেরী সার্ভিসগুলির মধ্যে প্রধান তিনটিই হলো ভাগীরথীতে, যথা — ফলতা-শিবগঞ্জ, ফলতা-বড়গেছিয়া এবং নূরপুর -তাঁতিখোলা, বাকী ফেরীগুলি হ'ল—ভাগীরথীতে কাশীপুর, পূর্ব-বাসুদেবপুর, পুরালীপাড়া, হারাপুর, উলুবেড়িয়া ও রাধানগর এবং রূপনারায়ণে শশাটি, নাউপালা ও পানিত্রাসে।

খেয়াপাড়ানী

১৮৩৯-এ কলকাতা-হাওড়া খেয়া নৌকা পারাপারের ভাড়া ছিল আধপয়সা [তখন চৌষট্টিপয়সায় এক টাকা হ'ত]। সে সময় দৈনিক সকাল ৪টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত যাত্রী পারাপারের যে হিসাবটি বেঙ্গল হরকরা'য় প্রকাশিত হয়েছিল তা এই রকম—

তারিখ ২৯,৫,১৮৩৯-গোলাবাড়ী ঘাট—কলকাতা-১০৪০ জন এবং কলকাতা-গোলাবাড়ী ঘাট-১০০৯ জন, মোট-২০৪৯ জন। তারিখ-৩১,৫,১৮৩৯. রামকৃষ্ণপুর ঘাট-কলকাতা-১২০০ জন এবং কলকাতা-রামকৃষ্ণপুর ঘাট-২৩০০ জন, মোট-৪৫০০ জন, তারিখ-৩,৬,১৮৩৯ সালিখা-কলকাতা-৩১০০ জন এবং কলকাতা-সালিখা-৩০০০ জন, মোট-৬১০০ জন। ৭.১১.১৮৫০ তারিখের দি ফ্রেণ্ডস অব ইণ্ডিয়া পাঠে জানা যায় আর্মেনিয়ান ঘাট—হাওড়া ঘাট বাষ্পীয় পোতের খেয়াপাড়ানী আধপয়সা। দৈনিক প্রায় ১০,০০০ জন তখন হাওড়া ঘাট ব্যবহার করত।

উনবিংশ শতকের একেবারে শেষদিকেও শিবপুর খেয়া ঘাটের ভাড়া বাড়েনি। যাত্রীরা আধপয়সা দিয়ে পার হ'ত, উপরন্তু অনর্গল

তামাক খেতে পেত। ব্রাহ্মণদের জন্য আলাদা বসার ও হুঁকার ব্যবস্থা ছিল। বিংশ শতকের শুরুতে নৌকায় খেয়া পাড়ানী হ'ল মাথা পিছু এক পয়সা। পুরা নৌকার ভাড়া দুই অথবা তিন আনা। [১৬ আনা = ১ টাকা]।

বালী থেকে বাগবাজারের ভাড়া সে যুগে বিভিন্ন সময়ে ছিল মাথা পিছু এক থেকে তিন আনা পুরা নৌকা আটআনা থেকে একটাকা। বালী, বেলুড় থেকে অফিসযাত্রীরা বড় বড় নৌকায় কলকাতায় আসতেন। নৌকাগুলিকে বলা হ'ত কুঠীর পান্‌সি। হিন্দুমাঝিরা পান্‌সি চালাত। নোয়াখালী বা চট্টগ্রামের মুসলমান মাঝিরা চালাত ডিঙ্গি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যখন সালিখা-আহিরীটোলা নৌকায় খেয়াপড়ানি একপয়সা, তখন লঞ্চে দু'পয়সা, ফেরত টিকিট তিন পয়সা। ভাড়া বাড়ার পর হ'ল নৌকায় দশ পয়সা ষ্টীমারে তের পয়সা। রামকৃষ্ণপুর—চাঁদপালঘাট লঞ্চের ভাড়া পনোরো থেকে বেড়ে কুড়ি এবং ফেরৎ টিকিট পঁচিশ থেকে বেড়ে পঁয়ত্রিশ হয়েছে।

চাঁদপাল ঘাট—রামকৃষ্ণপুর ঘাট লঞ্চ সার্ভিস চালু থাকে সকাল ৫-৫০ মিঃ থেকে রাত ৮-৩০ মিঃ এবং আহিরীটোলা বাঁধাঘাট সকাল ৫-৩০ মিঃ থেকে রাত ৯-৩০ মিঃ পর্যন্ত। ছুটির দিন হাওড়া ষ্টেশনের লঞ্চ সার্ভিস বন্ধ থাকে।

স্থলপথ

১৮২৩-এ হাওড়ার সব রাস্তাই ছিল কাঁচা, সংখ্যাতেও কম। তিনটি প্রধান পথ ব্যতীত অবশিষ্ট পথগুলির আখ্যা ছিল local road-বা স্থানীয় পথ।

বাদশাহী সড়ক—ভারত বিখ্যাত স্থলপথ গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের শুরু শিবপুর থেকে, যেটি তৈরী করেছেন একজন বাদশাহ ও একজন বড়লাট, যাকে বস্তুত ব্রিটিশ ভারতের বাদশাই-ই বলা যায়।

জি, টি, রোডের চন্দননগর থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত অংশের নির্মাণ কর্তা শেরশাহ। চন্দননগর থকে শিবপুর পর্যন্ত অংশটির তৈরীর কাজ শুরু হয় ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে, শেষ হয় ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল উইলিয়াম ক্যাভেন ডিস বেন্টিকের আমলে ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে। বড়লাট লর্ড ডালহৌসীর আমলে পথটির সংস্কার সাধন করা হয়।

ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের তুলনায় ভারতের অন্যতম প্রাচীন ও প্রধান পথটিকে আজ অপ্রশস্ত বলে গণ্য করা হ'চ্ছে। স্থান বিশেষে পথটির বিস্তার ৫০ ফুটের বেশী নয় বলে ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সড়ক উন্নয়ন বিভাগের এক সমীক্ষার পর রাস্তাটিকে প্রশস্ত করার কাজ শুরু হয়েছে।

রাণীসড়ক :—১৭৮০-তে তৈরী একটি পুরাতন পথের নাম রাণী অহল্যাবাঈ রোড বা বেনারস রোড, যার শুরু সালকিয়া চৌরাস্তা থেকে এবং শেষ কাশীতে। হাওড়ার অন্তর্গত সড়কাংশের দৈর্ঘ্য ১৫ মাইল ৬ ফার্লং।

সৈন্যদলের কাশী ও উত্তর ভারতে যাবার প্রধান পথ হিসাবে যখন এটির গুরুত্ব ছিল তখন সরকারীভাবে এটিকে নিউ-মিলিটারী রোড-ও বলা হ'ত। প্রায় প্রতিবছর বেনারস রোডের হুগলী জেলাস্থ অংশটি বন্যা কবলিত হ'ত বলে ১৮৪০-এর পর থেকে এপথ দিয়ে সৈন্য চলাচল ব্যবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটে। পথটির গৌরবের দিনে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বরের সমাচার দর্পণে লেখা হয়েছিল—"জানা গেল যে কলিকাতা অবধি কাশী পর্যন্ত যে নূতন পথ হইয়াছে তাহাতে ডাকের অধ্যক্ষ সাহেব গবর্ণমেন্টের আজ্ঞানুসারে পথিক সাহেব লোকদিগের থাকিবার কারণ সাত সাত ক্রোশ অন্তর আসনাদি বিশিষ্ট এক এক বাঙ্গলো ও পাকশালা নির্মাণ করিয়াছেন। ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ বিশ্রাম-স্থান বত্রিশটা হইয়াছে। ....অনুমান করি যে এখন নৌকা যোগে গমনাগমন ক্লেশ ও

বিলম্ব সাধ্য জানিয়া অনেকে এই পথ অবলম্বন করিবেন। কলিকাতা হইতে গঙ্গা পার হইয়া শালিখাতে প্রথম মঞ্জিল এবং কাশীর নিকট সিকরোলস্থ ইংলণ্ডীয় শিবিরের পার্শ্বে শেষ মঞ্জিল। ইহার মেরামত আগামী ১৫ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সাঙ্গ হইবেক।"

রাজপথ—শ'দেড়েক বছর আগে রাজা সুখময় রায় উলুবেড়িয়া থেকে জগন্নাথ মন্দিরের সিং দরজা পর্য্যন্ত ২৮০ মাইল লম্বা যে রাস্তা তৈরী করান তার নাম ও, টি, রোড বা উড়িষ্যা ট্রাঙ্ক রোড। আন্দুল রোড নামে পরিচিত রাস্তাটি ও, টি, রোড মারফত আন্দুলের সাথে হাওড়া জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের এবং উড়িষ্যার সাথে যোগাযোগ সহজ করে দিয়েছে। রাস্তাটি তৈরী করতে সে সময় খরচ পড়েছিল লাখ দেড়েক টাকার মতন।

কালক্রমে মেরামতের অভাবে রাস্তাটি যানবাহনের পক্ষে অব্যবহার্য্য হ'বার পর মেদিনীপুর পর্য্যন্ত জলপথ নির্মাণে অগ্রণী হ'ন ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইরিগেশন এণ্ড ক্যানাল কোম্পানী। কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে প্রথমে হুগলী নদী ও দামোদর নদ খাল দ্বারা যুক্ত হ'ল, তারপর একইভাবে যুক্ত হ'ল দামোদর এবং রূপনারায়ণ। সেখান থেকে খাল গেল মেদিনীপুর শহরের কাছে কাঁসাই নদী পর্যন্ত। সব কিছু করে ১৮৭০ নাগাদ জলপথটিকে চালু করা করা হ'লেও কিছুদিন পর রূপনারায়ণের পূর্বপাড়ে কাঁটাপুকুরের কাছে চড়া পড়ে খালের মুখ বন্ধ হয়ে যায়। খালটির হাওড়ার অংশটি মজে গেলেও মেদিনীপুরের অংশটির কিছুটা আজও বিদ্যমান।

অবশিষ্ট পথের পাঁচালী

১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে আঁকা রেনেলের মানচিত্রে দেখা যায়—সালকিয়া একটি চৌমাথা। রাস্তা চারটির গন্তব্যস্থল যথাক্রমে—
১/ গঙ্গার ধার দিয়ে বালী, শ্রীরামপুর হয়ে উত্তর ভারতের দিকে ২/ হুগলী জেলার চণ্ডীতলা, ডানকুনি হয়ে বর্ধমান ৩/ মাকড়দা,

রাজাপুর, রাজবল্লভহাট হয়ে বাঁকুড়া এবং ৪/ সালকিয়া থেকে থানাদুর্গ হয়ে পশ্চিমে সাঁকরাইল পেরিয়ে আমতা, আমতা থেকে রাস্তাটি দ্বিধা বিভক্ত হয়ে একভাগ ঘাটালও ক্ষীরপাই-এর দিকে, অপরটি মেদনীপুরের দিকে।

হাওড়ার ষ্ট্র্যাণ্ড রোডটির সৃষ্টি ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে। গঙ্গার ধার দিয়ে হাওড়া শহরের ফোরশোর নামে ১ মাইল লম্বা রাস্তাটির শুরু হাওড়া ষ্টেশনের কাছে শেষ বোটানিকেল গার্ডেনে।

১৯১৬ খ্রীঃ-এ শরৎচন্দ্র যখন হাওড়ায় আসেন তখন জি, টি, রোড ব্যতীত অপর সকল রাস্তাই ছিল কাঁচা। শরৎচন্দ্রের বাসা ছিল অপ্রশস্ত, কাঁচা ও অসমতল একগলিতে, যেখানে সাপের উপদ্রবও ছিল। গলির মোড়ে মোড়ে কেরোসিন তেলের বাতি জ্বলত। হাওড়া শহরের সংকীর্ণ রাস্তাগুলির দুপাশে পুকুর এবং বাঁশ ঝাড় ছিল প্রচুর।

সমতাবেড়ে'য় বাসকাল সেই এলাকার গ্রাম্যপথ সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মন্তব্য—"যে বিশ্রী পথ, তাই কেউ আসবে বলে ভাবনা হয়—এ রাস্তা পার হবে কি করে? তাছাড়া এখানকার তো কথাই নাই, কাঁদা এক হাঁটু পর্যন্ত না উঠলে তো আর পাড়াগাঁয়ের মর্যাদা রইল কোথায়?"

তবু এই অবস্থাতেও চারটি উল্লেখযোগ্য পথ হ'ল—

রাস্তার নাম	সংযোগকারী বাজার ও লোকালয়ের নমে	দৈর্ঘ্য [মাইল]
হাওড়া আমতা	বাঁটরা, ডোমজুর, জগৎবল্লভপুর মুন্সীরহাট, মাজু, জালালসি	৩০
উলুবেড়িয়া-দেউলটি [৫ ও ৬ নং জাতীয় সড়কের অংশ]	উলুবেড়িয়া, বীরশিবপুর বাগনান, কুলগাছিয়া	১৬
উলুবেড়িয়া-শ্যামপুর	ধুলা-সিমলা, ধান্দলি, শ্যামপুর	২০
ডোমজুর- বাউরিয়া	পাঁচলা, ডোমজুড়	১৬

অপর কয়েকটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের পথ-বিবরণী

শুরু	শেষ	দৈর্ঘ্য [মাইল]
ডোমজুড়	বালুহাটি	৪
শিবপুর	মাহিয়ারী	৮
সাঁতরাগাছি	মাহিয়ারী	৪.৫
আন্দুল	একবালপুর	৮
আন্দুল	রাজগঞ্জ	২
থানামাকুয়া	গোবেরিয়া	১.৫
মাকড়দহ	বেগড়ি	২.৫
লিলুয়া ষ্টেশন	ওল্ড-বেনারস রোড	১.৫
সাঁকরাইল	ধুলাগড়	৬
সাঁকরাইল	মানকুর	৩
আমতা	ঝিকরা	৪
শ্যামপুর	উলুবেড়িয়া	১৩
শ্যামপুর	বাগনান	৮
ডোমজুর	মাহিয়ারী	৪
ডোমজুর	কুলডাঙ্গা	৭
আমতা	নরেন্দ্রপুর	৯
আন্দুল	মাকড়দহ	৩
বাগনান	ফতেপুর	৫
বাগনান	মানকুর	৫
বাগনান	মুগকল্যান	৪
ধূলাগড়	দেউলপুর	৩
বড়গাছিয়া	শঙ্করাহাট	৩
বরদা	কুড়চি	১০
নন্দুটি	কমলপুর	১০
রাজপুর	খসময়রা	৩

১৯৭৬ খ্রীঃ-এর পরিসংখ্যানে দেখা যায় হাওড়া জিলা পরিষদের রাস্তাগুলির অবস্থা নিম্নরূপ—

	সদর মহকুমা	উলুবেড়িয়া মহকুমা
কাঁচা	২২.০০ কিঃমিঃ	৮.৪০ কিঃমিঃ
পাকা	৩০০.২৫ কিঃ মিঃ	১১১৭.১৫ কিঃ মিঃ

পশ্চিমবঙ্গের জেলা ভিত্তিক সড়ক পথের পরিমাণ

মার্চ, ১৯৭৫-এর হিসাব অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের ১৬টি জেলার রাস্তার দৈর্ঘ্যের তুলনামূলক চিত্রে দেখা যায় ঃ—

১০০ বর্গ কিঃ মিঃ-এ রাস্তার দৈর্ঘ্য	জেলার সংখ্যা
১০ কি. মি. 'র নীচে	১
১০-২০ কি. মি.	১১
২০-৩০ কি. মি.	৩
৩০-৪০ কি. মি.	১

তালিকার সর্বোচ্চ স্থানে আছে হাওড়া [৩৫ কি. মি] এবং সর্বনিম্নে পুরুলিয়া [৭.৬৮ কি. মি.]

[উৎস ঃ- আর্থিক প্রসঙ্গ—মাঘ-চৈত্র সংখ্যা-১৩৮৪]

এই কৃতিত্ব সত্ত্বেও হাওড়া জেলায় এখনও এমন-গ্রাম আছে রেল ষ্টেশন থেকে নেমে সোজাপথে সেইগ্রামে পৌছানর একমাত্র রাস্তা-আলপথ। সাঁকরাইল থানার সারেঙ্গা এই রকম একটি গ্রাম।

হাওড়া শহরের মোট আয়তনের মাত্র ৩% রাস্তা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। শহর এলাকার ক্রমবর্দ্ধমান যানবাহনের প্রয়োজন কিছুটা মেটান'র জন্য ফোরশোর রোড ও মাকড়দহ রোডকে চওড়া করা হ'চ্ছে। দীনবন্ধু কলেজের সামনে থেকে শুরু হ'চ্ছে দ্বিতীয় হুগলী সেতুর সংযোগকারী রাস্তা।

শহরের পথে আলো

মহেন্দ্র নাথ রায় যখন হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন তখন সমস্ত পাকা রাস্তাতে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করা হয় এবং কাঁচারাস্তা এমনকি বস্তিতেও কেরোসিন ল্যাম্পের সংখ্যা কমিয়ে বৈদ্যুতিক আলোর প্রসার ঘটান হয়। ১৯১৬ খ্রীঃ-এ হাওড়া শহর থেকে বিদায় নেয় শেষ গ্যাসের আলোটি।

১৮৭৩-এর পাঁচ নম্বর আইন অনুযায়ী হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটিকে রাস্তায় গ্যাসের আলো জ্বালানর খরচ মেটানোর উদ্দেশ্যে ৩% হারে অধিক কর আদায়ের ক্ষমতা দেওয়া হয়।

১.৯.১৯৩২ তারিখে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির সংগে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর যে নূতন চুক্তি হয় তদনুসারে বিদ্যুৎব্যয় অনেক কমে যায়। ফলে বৈদ্যুতিক স্তম্ভের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং কেরোসিন ল্যাম্পের সংখ্যা হ্রাস পায়। হাওড়ার গ্যাসবাতি সম্পর্কে রসরাজ অমৃতলাল বসু'র স্মৃতি চারণের অংশ বিশেষ হ'ল—"In 1861 or 1862, perhaps the first gas-lamp was introduced at the corner of the cornwallish square, and what a night it was. The whole city come to gape at it—wonder of wonders that it was. Now it is out of date, and even Baranagar or Shibpur will not have it. [The Cal. Municipal Gazettee-Silver jubilee Number.]

গঙ্গা সুড়ঙ্গ ও বিদ্যুৎ তরঙ্গ

টেমস নদীর মত গঙ্গা নদীর তলাতেও সুড়ঙ্গ আছে। তবে গঙ্গা নদীর সুড়ঙ্গ পথে কেবলমাত্র বিদ্যুৎ তরঙ্গ-ই যাওয়া-আসা করে।

বোটানিকেল গার্ডেন ও খিদিরপুরের মধ্যে গঙ্গার নদী বক্ষের

চল্লিশ ফুট নীচ দিয়ে যে সুড়ঙ্গটি রয়েছে সেটি ১৯২৬-৩০ খ্রীষ্টাব্দে তৈরী হয়েছিল। আটফুট ব্যাসের এই সুড়ঙ্গ পথে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর বিদ্যুতের কেবল হাওড়ায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের কেবলও এর মধ্য দিয়ে গঙ্গা পার করান হয়েছে। সুড়ঙ্গটি ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং'র তদারকের অধীন। [দঃ- দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা—২৩.৫.৮১]

সড়ক উন্নয়ন

পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উত্তরোত্তর উন্নতি সাধনের জন্য স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে বহু নূতন পথ নির্মাণ প্রকল্প রচনা করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে কোনটির কাজ শেষ হয়েছে; কোনটির এখনও আরম্ভই হয়নি।

১৯৭২-এ রাজ্যে জাতীয় সড়কের সংখ্যা ছিল ৪৪টি যার মধ্যে নীচের চারটি পথের অংশ বিশেষ আছে হাওড়ার ভিতর।

১ নং-জি, টি রোড, ২ নং-কলকাতা-দিল্লী রোড, ৬ নং-কলকাতা-বোম্বাই ও মাদ্রাজ রোড এবং ৪১ নং কোলাঘাট-হলদিয়া বন্দর রোড। প্রস্তাবিত হাওড়া-কোনা এক্সপ্রেস সড়কের নক্সায় দেখা যায় যে, হুগলী সেতু থেকে বেড়িয়ে এই সড়কটি কোনাতে ৬ নম্বর জাতীয় সড়ক বোম্বে রোডের সঙ্গে গিয়ে মিশবে। মূলতঃ ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত পণ্য চলাচলের উদ্দেশ্যেই রাস্তাটির পরিকল্পনা। এখন সড়ক পথে যে সকল পণ্যাদি কলকাতায় আসে সেগুলি কলকাতায় আসার পর দেশের অন্যান্য জায়গায় পুনঃ প্রেরিত হয়। ফলে পরিবহন ব্যায়ের বাহুল্য ঘটে—মহানগরীতে ভিড়ও বৃদ্ধি পায়। প্রতিকারের উপায় হিসাবে চিন্তা করা হয়েছে কোনা এক্সপ্রেস পথের সঙ্গে একটি পরিবহন উপনগরী নির্মাণের। আসাম ত্রিপুরা, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর বঙ্গ এবং রাজ্যের অন্যান্য জেলাগুলির জন্য

পণ্যবহনকারী সব পরিবহন গুলি ঐ উপনগরীতে জমায়েত হ'বে সেখানেই মাল নামিয়ে উঠিয়ে যে মাল যেখানে যাবার সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হ'বে। জি,টি, রোড প্রশস্ত করা ব্যতীত তৈরী হ'বে বোম্বাই রোডের সাথে সংযোগ সৃষ্টি কারী নয়া জি, টি, রোড বাইপাস-যেটি শেষ করতে খরচ পড়বে ৯ কোটি টাকা। দ্বিতীয় হুগলী সেতু থেকে সেন্ট্রাল হাওড়া এক্সপ্রেস নামে একটি পথের সৃষ্টি হ'বে। ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হ'বে এইরূপ পরিকল্পনা করে পথটির নির্মাণ ব্যয় ধার্য করা হয়েছিল ৪ কোটি টাকা।

সে কালের কবিতায় হাওড়া পথের কথা

অনুমান প্রায় দু'শোবছর আগে রচিত একটি কবিতায় শালিখা ঘাট এবং পথ তৈরীর সময় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের গ্রামবাসীর দুর্ভোগের উল্লেখ পাওয়া যায়। বন্ধুবর শ্রীবীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সৌজন্যে সংগৃহীত কবিতাটির অংশ বিশেষ হ'ল—

বদ্দী কায়েত বামন, বদ্দী কায়েত বামন,
পালায় তখন খাপানে খাপাল।
কলুমালী ধোবা তেলী যত মছুরমান॥
বাসি ভাত রইল ঘরে বাসি ভাত রইল ঘরে
তোবা সোঙর কি কোম্নূ ভেইআ।
গোলাম ছিল সেহ পালাল বিবি সঙ্গে লআ।
সেখানে বান্দিল বড় সেখানে বান্দিল বড়
কোরে দড় সাঁখারি খাটাআ।
মাঠে মাঠে শালিখা ঘাটে উতরিল গিআ।
আড়িপার কলিকাতাতে আড়িপার কলিকাতাতে
নৌকা পথে গঙ্গা পার হল।
সহর দিআ হুজুর কুর্নিশ করিল॥

রেলপথ

বড়লাট লর্ড ডালহৌসী ভারতের বড় বড় শহরগুলি রেলপথের দ্বারা যুক্ত করার যে পরিকল্পনা করেন, তদনুযায়ী বাংলা দেশের প্রথম ট্রেনটি চলে হাওড়া থেকে।

১৮৪৫-৪৬-এর কথা। কয়েকজন বাঙ্গালী গঙ্গার পশ্চিমে হাওড়া থেকে ভগবানগোলা পর্যন্ত রেল চালাবার জন্য পনের লক্ষ পাউণ্ড মূলধনের সেন্ট্রাল বেঙ্গল রেলওয়ে নামে একটি কোম্পানী গঠনে উদ্যোগী হ'লেও কার্যত কিছুই হয়নি। কোম্পানীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয় কলিকাতা টাউন হ'লে। "এস্প্লেনডিড এনটারটেনমেন্ট ওয়াজ গিভন অ্যাট দি টাউন হ'ল বাই দি প্রোমোটারস্ টু সেলিব্রেট দি ইভেন্ট। সর্টলি আফটার ওয়ার্ডস দি প্রোমোটারস্ এ্যাণ্ড দি মানি বোথ ডিস্অ্যাপায়ার্ড" [A splendid entertainment was given at the town hall by the promoters to selibrate the event. Shortly afterwards the promoters and the money both disappeared.)

১৮৪৫ খ্রীঃ-এর ৪টা সেপ্টেম্বর ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টার আর, ম্যাকডোনাল্ড, ষ্টিফেনসন তদনান্তীন বড়লাট স্যার হেনরী হার্ডিঞ্জকে পত্রযোগে জানান—ভারতে রেলপথ স্থাপনের উদ্দেশ্যে ৪০ লক্ষ ষ্টার্লিং মূলধন নিয়ে একটি কোম্পানী গঠিত হয়েছে। কোম্পানীর হাওড়া থেকে হুগলী জেলার পাণ্ডুয়া পর্যন্ত রেলপথ স্থাপনের প্রচেষ্টাটি বাস্তবায়িত হ'বার সম্ভাবনা দেখা দেয় ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ। প্রস্তাবিত রেলপথের কিছুটা অংশ ফরাসী অধিকৃত চন্দননগরের মধ্যে থাকায় ফরাসী সরকারের সম্মতি লাভের জন্য কিছু সময় নষ্ট হয়। ১৮৫৪'র জুনে গ্রেট ব্রিটেন থেকে ফেয়ারী কুইন নামে প্রথম রেল ইঞ্জিনটি কলকাতায় পৌছায়। ২৮শে জুন মিঃ হডসন হাওড়া রেলপথের প্রথম ট্রেনটিকে হাওড়া

থেকে পাণ্ডুয়া নিয়ে যান। আরও কিছুদিন পর ঐ বছরেরই ১৫ই আগষ্ট হাওড়া-হুগলী ৪০ মাইল পথে নিয়মিত ট্রেন চলাচল শুরু হয়। সময় লাগত ৯১ মিনিট। ভাড়ার তালিকায় দেখা যায়—

শ্রেণী	বালী	শ্রীরামপুর	চন্দননগর	হুগলী
প্রথম	আট আনা	একটাকা দুআনা	—	তিনটাকা
দ্বিতীয়	তিন আনা	ছয় আনা	—	একটাকা দুইআনা
তৃতীয়	এক আনা	দুই আনা	পাঁচআনা	সাতআনা

প্রথম দিনের ট্রেনের টিকিটের জন্য চিঠি লিখেছিলেন তিন হাজারেরও বেশি লোক। টিকিট পেয়েছিলেন মাত্র কয়েকশ জন। কারণ যতগুলি সিট ততগুলি টিকিট-ই বিক্রী করা হয়েছিল। ট্রেনে ছিল প্রথম শ্রেণীর কামরা তিনটি, দ্বিতীয় শ্রেণীর দুটি, তৃতীয় শ্রেণীর ট্রাক দু'টি, এবং একটি গার্ডের কামরা। প্রথম অবস্থায় রাত্রে ও রবিবার ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকত। যাদের রবিবার ছাড়া ছুটি নাই, তারা ট্রেন চলাচল দেখবার জন্য রবিবারেও ট্রেন চালাবার অনুরোধ জানালে একদিন "ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেইলওয়ে কোং"র ম্যানেজিং ডিরেকটার ও এজেন্ট মিঃ আর, ম্যাকডোনাল্ড ষ্টিফেনসন এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান—"সাধারণের প্রার্থনা মতে আমরা রবিবারেও ট্রেন চালাইব। দুটো ট্রেন প্রত্যেক রবিবারে পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত যাইবে।"

১৮৫৫'র ৩রা ফেব্রুয়ারী থেকে হাওড়া-রাণীগঞ্জ, ১৮৬২-তে হাওড়া-দিল্লী, ১৮৮৫-তে হাওড়া-তারকেশ্বর, ১৮৯৯-এ হাওড়া-পুরী এবং ১৯১৭-য় হাওড়া-বর্ধমান কর্ডলাইন পথে ট্রেন চালু হয়।

ট্রেনের কামরা

সে যুগে সাদারঙের প্রথম শ্রেণীর কামরায় থাকত গদি, সার্শি ও খড়খড়ি, লালরঙের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় দু'খানা,

করে বেঞ্চ, প্রতি বেঞ্চে পাঁচজনের বসার জায়গা। এই দুই শ্রেণীর কামরাই ছিল ছাদ বিশিষ্ট। সবুজ রঙের তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় না ছিল বেঞ্চ, না ছিল ছাদ; বস্তুতঃ এগুলি ছিল অনাচ্ছাদিত মালগাড়ী বিশেষ। রোদ বৃষ্টির জন্য যাত্রীরা গাড়ীতে চেপে ছাতা খুলে বসত। স্বদেশী আমলে কোন কোন জায়গায় শ্বেতাঙ্গ রেলযাত্রীদের লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছোঁড়া হ'ত। ইউরোপীয়গণ সাধারণত প্রথম শ্রেণীতে যাতায়াত করতেন। তাই তাদের নিরাপত্তার জন্য রেলকামরার বর্ণ বৈষম্য রহিত করা হয়।

টিকিট কাউণ্টার

প্রথমযুগে হাওড়া স্টেশনের একদিকে ছিল রেলের কারখানা অপরদিকে টিকিট কাউন্টার অর্থাৎ একটি কুঁড়েঘর। হাওড়ার দিকে নদীর পাড়ে তখন কোন ঘাট ছিল না। কলকাতা থেকে নৌকায় গঙ্গা পার হ'য়ে নদীপাড়ের কাদা মাড়িয়ে ষ্টেশনে যেতে হ'ত। কিছুকাল পরে গঙ্গার পূর্বপাড়ে আরমেনিয়ান ঘাট থেকে টিকিট কেটে কোম্পানীর জাহাজে নদীপার হ'য়ে ষ্টেশনে পৌছাবার ব্যবস্থা হয়।

কুলি ও গার্ড

৩০,১০.১৮৫৪ তারিখের সোমপ্রকাশ পত্রিকা পাঠে জানা যায়, হাওড়া ষ্টেশনে মালবহনকারী কুলিদের হাতে নম্বর লাগানো প্রথা চালু এবং মোট পিছু এক আনা পারিশ্রমিক ধার্য্য করা হয়েছে।

সেকালে গার্ডের প্রধান কাজ ছিল কামরায় ঠেসে লোক বোঝাই করা। কামরায় গার্ড কিভাবে লোক বোঝাই করত তা ধরা আছে টেকচাঁদ ঠাকুরের হুতোম পাঁচার নক্সায়—

"থার্ডক্লাশের মধ্যে গার্ড ও দুজন বরকন্দাজের সহায়তায় লোক

পোরা হতে লাগলো, ভিতর থেকে, আর কোথা আসছ, সাহেব আর জায়গা নাই ...... ইত্যাদি রূপ চীৎকার হতে লাগলো কিন্তু রেলওয়ে কর্ম্মচারীরা বিধিবদ্ধ নিয়মের অনুগত বলেই অদৃশ্য চীৎকারে কর্ণপাত কল্লে না। এক একখানি থার্ডক্লাস কাঁকড়ার গর্ত্তের আকার ধারণ কল্লে, তথাপিও মধ্যে মধ্যে দুই একজন এস্টেশন মাষ্টার ও গার্ড গাড়ীর কাছে এসে উঁকি মাচ্ছেন—যদি নিশ্বাস ফেলার স্থান থাকে তাহলে আরও কতকগুলো যাত্রীকে ভরে দেওয়া হয়।"

শালিমার স্টেশন

লোহা ও ইস্পাত এবং অন্যান্য ভারীপণ্য রেলপথে আনা-নেওয়া ও গুদামজাতকরণের সুবিধার্থে ১৮৮৩ খ্রীঃ-এ বর্তমান দঃ পূঃ রেলপথের শালিমার ষ্টেশনটির সৃষ্টি। স্থলপথে ও জলপথে এখান থেকে কলকাতা বন্দরে মাল নিয়ে যাওয়া আসার সুবিধা পাওয়া যাবে বলেই স্থানটিকে মনোনীত করা হয়।

হাওড়া জেলাস্থ রেলপথগুলির দৈর্ঘ্য ও ষ্টেশন সমূহ

(১ পূর্ব রেলপথ—[ক] প্রধান লাইন ৯ কিলোমিটার [খ] হাওড়া-বর্ধমান কর্ডলাইন-১৪ কি,মিঃ [গ] কলিকাতা কর্ড রেলপথ—৬ কিঃ মিঃ [২] দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ-[সাঁতরাগাছি, শালিমার, এবং বাউরিয়া-ফোর্টগ্লাষ্টার শাখাপথ সহ] ৫৮ কি, মিঃ। গঙ্গার ধারে বন্দর থেকে মাল নিয়ে আসা এবং বন্দরে মাল নিয়ে যাওয়ার জন্য পোর্ট কমিশনারের একটি রেলপথ আছে। দঃ পূঃ রেলপথের ১১ মাইল লম্বা শালিমার-সাঁতরাগাছি শাখা রেলপথটি মাল পরিবহনের জন্য ১৫.৩.১৯০১ তারিখ থেকে চালু হয়। হাওড়া থেকে রওনা হয়ে পূর্ব্ব ও দঃ পূঃ রেলপথের ট্রেনগুলিকে হাওড়া

জেলাস্থ নিম্নলিখিত কিলোমিটার দুরত্বের স্টেশনগুলি অতিক্রম করতে হয়।

পূর্ব্ব রেলপথ—[ক] প্রধান মেন লাইন] লিলুয়া [৫] বেলুড় [৭] এবং বালী [৯]

[খ] কর্ড লাইন—লিলুয়া, বেলুড় এবং বেলানগর (১২)

[গ] কলিকাতা কর্ড [C. C. R]—বালীঘাট [শিয়ালদা থেকে ১৫ কি. মি.]

দঃ পূঃ রেলপথ—টিকিয়াপাড়া [ফ্ল্যাগষ্টেশন—১২.২.১৯৭৫] দাশনগর, [৫, ফ্ল্যাগষ্টেশন-১.১.১৯৭৪] রামরাজাতলা (৭) সাঁতরাগাছি (৮) মৌরীগ্রাম (১১) আন্দুল (১৩), সাঁকরাইল (১৬) আবাদা (১৮) নলপুর (২১), বাউরিয়া (২৫) চেঙ্গাইল (২৮), ফুলেশ্বর-(৩০), উলুবেড়িয়া-(৩৩), বীরশিবপুর (৩৭), কুলগাছিয়া-(৪০) বাগনান-(৪৬), ঘোড়াঘাটা-(৪৮), এবং দেউলটি-(৫১),

হাওড়ার ১৫টি প্ল্যাটফর্ম থেকে দৈনিক ৩৭৪টি যাত্রীবাহী গাড়ী গড়ে ২,৫০,০০০ জন যাত্রীকে নিয়ে যাওয়া-আসা করে।

রেলপথের পুনর্বিন্যাস

১৯৫৫'র আগে হাওড়া থেকে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে এবং বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে নামে দু'টি রেলপথ ছিল। ১.৮.১৯৫৫ থেকে এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ ও মোরাদাবাদ বিভাগ ব্যতীত সমগ্র ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়েটি পূর্ব রেলপথ নামে পরিচিত হয়। বর্তমানে ইহার ৫টি বিভাগ—হাওড়া, শিয়ালদহ, আসানসোল, দানাপুর ও ধানবাদ। প্রধান কার্য্যালয়—১৭. নেতাজী সুভাষ রোড। কলিকাতা-৭০০০০১

দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের পূর্বনাম বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে। ১.৮.১৯৫৬ তারিখে ১১, গার্ডেন রীচ রোড, কলিকাতা-৭০০০৪৩-এ প্রাধান কার্য্যালয় ও ৭টি বিভাগ সমবায়ে ইহা দঃ পূঃ রেলপথ নামে

পুর্নগঠিত হয়। বিভাগ সাতটি হ'ল—খড়গপুর, আদ্রা, চক্রধরপুর, খুরদা, বিলাসপুর, ওয়ালটেয়ার ও নাগপুর।

সিপাহী বিদ্রোহ ও হাওড়ার রেলপথ

আজকাল সৈন্য চলাচলের জন্য রেলপথ যে গুরুত্ব অর্জন করেছে সিপাহী বিদ্রোহের সময় সে গুরুত্ব ছিলনা। গতির গৌরবে দেশের অধিকাংশ স্থানে তখনও অশ্ব-ই স্ব-মহিমায় বিরাজিত "অশ্বশক্তি" নয়। এ সময় রেল চলত কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে। তিন রেলপথের মধ্যে সবচেয়ে বড় রেল কোম্পানী ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে'র পরিকল্পনা ছিল রেলপথ দ্বারা দিল্লী-হাওড়া'র সংযোগসাধন। তবে সে সময় পর্যন্ত মাত্র হাওড়া থেকে রাণীগঞ্জ, এই ১১৫ মাইল পথে রেল চলত তাও সংখ্যায় খুব কম। অর্থাৎ তখন রেলে করে হাওড়া থেকে উত্তর ভারতে সৈন্য পাঠালে মাত্র চার দিনের রুট মার্চের পরিশ্রম বাঁচত। তাই সিপাহী বা কোম্পানী কারুর কাছেই রেলপরিবহন খুব গুরুত্ব পায়নি। তথাপি হাওড়ার রেলপথে তখন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে।

বিদ্রোহ দমন উদ্দেশ্যে যাবার জন্য ম্যাড্রাস ফুসিলার্সের অধিনায়ক কর্ণেল জেমস নীল রেলযোগে রাণীগঞ্জ হয়ে বেনারস পৌছানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে সসৈন্য হাওড়া স্টেশনে পদার্পন করলেন। তখন গঙ্গার উপর কোন ব্রীজ না থাকায় নীল সাহেবের নদী পেরিয়ে ষ্টেশনে আসতে একটু দেরী হয়। প্ল্যাটফর্মে পৌছে তিনি দেখেন রাণীগঞ্জ মেল ছাড়ছে। মিঃ নীল গার্ড সাহেবকে অনুরোধ জানালেন কয়েক মুহুর্ত্তের জন্য ট্রেন ছাড়ার সময়টিকে পৌছিয়ে দিতে যাতে সব সৈন্য নিরাপদে ট্রেনে উঠতে পারে। গার্ডসাহেব সে অনুরোধে কর্ণপাত না করায় কর্ণেল গার্ডকে লক্ষ্য করে গুলী ছোঁড়েন। গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। অধিনায়কের কাজে অনুপ্রাণিত

অনুগত সৈন্যদলও ইতঃস্তত কয়েকটি গুলী ছোঁড়ে। ভীত সন্ত্রস্ত যাত্রীদল ট্রেন থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ে অল্পবিস্তর আহত হ'ন। রেলকর্মীদের বন্দুকের ডগায় আটকে রেখে সৈন্যদল ট্রেনে ওঠে। সব সৈন্যের ট্রেনে ওঠার পরই রেলকর্মীরা নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালনের জন্য মুক্তি পান। যাত্রীশূণ্য ট্রেনের কামরাগুলি সদলবলে অধিকার করার করে নীল সাহেব আক্ষেপ করেছিলেন তাঁর হাতে এখন সময় না থাকায় রেল কর্মচারীরা এ যাত্রায় প্রাণে বেঁচে গেল। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে তিনি সবাইকে প্ল্যাটফর্মের কড়িকাঠে ফাঁসি দেবেন। কর্ণেল সাহেবের কলকাতা থেকে সেটিই ছিল শেষ যাত্রা। যুদ্ধে তিনি সিপাহীদের হাতে নিহত হন। আজও তাই তাঁর প্রতিজ্ঞা অপূর্ণ রয়ে গেছে।

কলকাতা শহরে গুজব ছড়িয়ে পড়ল কোম্পানীর সৈন্য হাওড়া ষ্টেশন পুড়িয়ে দিয়েছে, যাকে দেখছে তাকেই গুলী করছে। পরদিন কলকাতার সংবাদপত্রগুলিতে ফলাও করে ঘটনার বিবরণ ছাপা হয়। প্রচারের গুণে জনমত ও সংবাদপত্র নীলসাহেবের সাহসের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠে। ৪ঠা জুন ১৮৫৭ হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয়—

Considerable satisfaction has been evinced in calcutta at the manner in which the officer commanding of the Madras Fusiliers detachment under orders for Benaras is said to have dealt with the railway men at Howrah. The detachment arrived at the station house just as the train was ready to move. The officer told the railway men to wait ten minutes and he would put his men in. The railwaymen refused to wait where upon the stoker first and each of the rest as

he came to remonstrate was placed in arrest until the whole party was put in and they where allowed to go in their duty.

এই ঘটনার তিন সপ্তাহ পরে আর একটি ঘটনা ঘটে হাওড়া থেকে ১৩ মাইল দুরে শ্রীরামপুর ষ্টেশনে।

ব্যারাকপুর থেকে সপ্তরতম দেশীয় পদাতিক বাহিনী কলকাতায় আসবে। দেড়দিনের কুচ্ বাচাবার উদ্দেশ্যে তরুণ লেফটেন্যান্ট ডি নাট [Denut] ১৭ই জুন গঙ্গা পেরিয়ে সসৈন্যে শ্রীরামপুর ষ্টেশনে এসে সব সৈন্যের জন্য টিকিট কেটে সকালের হাওড়াগামী ট্রেন ধরার জন্য শ্রীরামপুর ষ্টেশনে অপেক্ষা করতে লাগলেন। হাওড়া ষ্টেশনের গুলী বর্ষণের ঘটনা তখনও যাত্রীদের স্পষ্ট মনে থাকায় তারা পটাপট ট্রেন থেকে নেমে গাড়ী খালি করে দিল। সৈন্যদল তিনটি খালি কামরা দখল করার পর ডি নাট সাহেব দুজন ননকমিশনড ভারতীয় অফিসার ও কয়েকজন সৈন্য সহ একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরার উঠতে গেলে কামরার একমাত্র ইউরোপীয় যাত্রী মিঃ বেলারি [Bellaire] আপত্তি করেন। ভারতীয় সৈন্যদের তিনি সে কামরায় উঠতে দিতে রাজী নন, ভয় যদি তারা পথিমধ্যে বিদ্রোহী হয়ে তাঁর শিরচ্ছেদ করে। ডি নাট-ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভারতীয় সঙ্গীদের ছেড়ে তিনি ট্রেনের কামরায় উঠবেন না। এই বিষয়ে দুই সাহেবের ঝগড়া যখন মুখোমুখি থেকে ঘুসোঘুসিতে পৌঁছায় তখন ষ্টেশন মাষ্টার ক্রিমিয়া যুদ্ধ ফেরৎ বেকার সাহেব মারামারি থামাবার জন্য ডি নাটকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরল। অপমানিত লেফটেন্যান্ট পিস্তল বের করে ষ্টেশন মাষ্টারকে গুলী করেন। পুলিশ এসে বেলারি ও ডি নাট দুজনকেই গ্রেপ্তার করে সেই ট্রেনেই হাওড়ায় চালান দেয়। আগে থেকে খবর পেয়ে হাওড়ার ষ্টেশন মাষ্টার সমস্ত ষ্টেশন চত্বর খালি করে বিশেষ পাহারা বসান। সৌভাগ্যক্রমে বেকারের আঘাত গুরুতর ছিলনা।

এ ক্ষেত্রেও সংবাদপত্রগুলি ডি নাটের সাহসের প্রশংসা করে এবং অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের জন্য বেকার হন নিন্দাভাজন।

প্রস্তাবিত সাঁত্রাগাছি বিষ্ণুপুর রেলপথ

দঃ পূর্ব রেলপথের সাঁত্রাগাছি ষ্টেশন থেকে বিষ্ণুপুর পর্য্যন্ত একটি রেলপথ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা হাওড়া, হুগলী, বাঁকুড়া, ও মেদিনীপুরের জনসাধারণ দীর্ঘদিন ধরে বোঝাবার চেষ্টা করে আসছেন। ১৯১২-তে একটি পরিকল্পনা ছিল রেলপথটি সাঁত্রাগাছি থেকে রাধানগর, কামারপুকুর হ'য়ে বিষ্ণুপুর পর্য্যন্ত গিয়ে শেষ হ'বে। এযাবৎ পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হয়নি।

শিবগঞ্জ-বাগনান রেলপথ

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে জনগণ এই রেলপথটি স্থাপনের জন্য আবেদন জানান। বলা বাহুল্য এ পর্যন্ত এই রেলপথ স্থাপনের কোন পরিকল্পনা করা হয়নি।

হাওড়া আমতা ব্রডগেজ লাইন

মার্টিন লাইট রেলওয়ের বিলুপ্তি ঘটার পর হাওড়া ষ্টেশন থেকে আমতা যাওয়ার সহজ যোগাযোগের জন্য দঃ পূঃ রেলপথ কর্তৃপক্ষ হাওড়া আমতা ব্রডগেজ লাইন স্থাপন প্রকল্পটি গ্রহণ করেছেন। ১৯৭৫-এর ১৬ই জুলাই তদনান্তীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী প্রস্তাবিত হাওড়া-আমতা ব্রডগেজ লাইনের শিলান্যাস করেন। এই উপলক্ষে তিনি কলকাতা থেকে পারিজাত নামক লঞ্চে হুগলী নদী অতিক্রম করে হাওড়ায় এসে ডালমিয়া পার্কের এক জনসভায় ভাষণ দেন। প্রকল্পে বলা হয়েছিল প্রথমে সাঁত্রাগাছি থেকে বড়গাছিয়া, তারপর আমতা পর্য্যন্ত লাইনটি বসবে।

বিলুপ্ত ন্যারোগেজ রেলপথ মার্টিন-লাইন রেলওয়ে

ছোট্ট রেল। ব্রডগেজ তো দূরের কথা মিটার গেজও নয়, ন্যারো গেজ। বিস্তৃতি মাত্র দু'ফুট, ট্রাম লাইনের চেয়েও সরু। এই ছোট্ট রেলপথটির শুরু ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জুন। ঐ দিন হাওড়া জেলা বোর্ডের সঙ্গে রেলপথ স্থাপনের জন্য মেসার্স ওয়ালস্ লোভেট এণ্ড কোম্পানীর যে চুক্তি হয়, পরবর্তীকালে সেটিই নবীকরণ হয় মেসার্স মার্টিন এণ্ড কোম্পানীর সঙ্গে। প্রতিষ্ঠাকালে হাওড়া-শিয়াখালা লাইট রেলওয়ের মূলধন ছিল ৬ লক্ষ টাকা। হাওড়া-আমতা লাইট রেলওয়ে কোম্পানীর মূলধন প্রাথমিক অবস্থায় ছিল ৯ লক্ষ টাকা, পরে বেড়ে হয় ১৬ লক্ষ টাকা।

২৯ মাইল দীর্ঘ হাওড়া-আমতা লাইনের ডোমজুর পর্য্যন্ত ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে এবং এর পরের বছর আমতা পর্য্যন্ত ট্রেন চলাচল শুরু হয়। ৭টা ২২ মিনিটে যাত্রা শুরু করে ট্রেনটি আমতায় পৌঁছাত সাড়ে দশটায়। বড়গাছিয়া স্টেশন থেকে হুগলী জেলার আঁটপুর পর্য্যন্ত ট্রেন চলাচলের শুরু ১৯০৪-এ। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে লাইনটিকে ঐ জেলারই চাঁপাডাঙ্গা পর্য্যন্ত বাড়ান হয়।

হাওড়া-শিলাখালা লাইনের দৈর্ঘ্য ছিল মোটামুটি ১৯½ মাইল, এর মধ্যে প্রথম ৯ মাইল হাওড়া জেলায়, বাকী অংশটি ছিল হুগলী জেলায় অবস্থিত। হাওড়া ময়দান থেকে শিয়াখালা পৌঁছাতে দু' ঘন্টারও কিছু বেশী সময় লাগত। ১৮৯৭ এর আগস্টে এই পথে হুগলী জেলার চণ্ডীতলা পর্য্যন্ত এবং ঐ বছরেরই নভেম্বরে শিয়াখালা পর্য্যন্ত নিয়মিত ভাবে ছোট রেলের যাতায়াত শুরু হয়। চণ্ডীতলা থেকে জনাই পর্য্যন্ত তিন মাইল দীর্ঘ একটি শাখা রেলপথও ছিল। হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইন তৈরী হবার আগে পর্যন্ত এটিই ছিল জনাইয়ের মনোহরা রেলযোগে শহরে আসার সহজ রাস্তা।

প্রথমদিকে লাইট রেলওয়েটির টার্মিনাল ষ্টেশন ছিল গঙ্গার ধারে —তেলকল ঘাট ষ্টেশনে। ছোট্ট রেলটি এখান থেকে ধোঁয়া উড়িয়ে

পৌঁছাত হাওড়া ময়দানে, সেখান থেকে পঞ্চানতলা রোড দিয়ে কদমতলা ষ্টেশনে। দুর্ঘটনা এড়াবার জন্য এই পথে ইঞ্জিনের আগে আগে ঘন্টা বাজিয়ে যাবার জন্য একজন রেল কর্মচারী নিযুক্ত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে কদমতলা-ই হয় টার্মিনাল ষ্টেশন—তেল-কলঘাট পর্য্যন্ত লাইনের বিলুপ্তি ঘটে। আরও পরে কদমতলার পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত হয় হাওড়া ময়দান টার্মিনাল ষ্টেশন। হাওড়া শিয়াখালা রেলপথের কালীপুর ষ্টেশনের পরবর্তী অংশ বেনারস রোডের সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত ছিল। ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী মার্টিন কোম্পানী পরিচালিত ৭৩ বছরের পুরানো রেল-পথটির ইঞ্জিনের শব্দ চিরকালের মত বন্ধ হয়ে যায়।

হাওড়া-শিয়াখালা রেলপথের হাওড়া জেলাস্থ ষ্টেশনগুলি আদি পর্বে ছিল তেলকলঘাট, কদমতলা, উত্তর ব্যাঁটরা, কোনা, একসরা, চামরাইল ও জগদীশপুর—বলুহাটী এবং শেষপর্বে হাওড়া ময়দান, কোনা, একসরা, চামরাইল ওজগদীশপুর—বলুহাটী। হাওড়া-আমতা ও হাওড়া-চাঁপাডাঙ্গা লাইনের ট্রেনগুলি শেষপর্বে হাওড়া-ময়দান, বালটিকারী, বাঁকড়া, সলপ, কাঁটলিয়া, মাকড়দহ, ডোমজুড়, দক্ষিণবাড়ী হয়ে বড়গাছিয়া জংশন পর্য্যন্ত এসে একটি যেত আমতার দিকে, অপরটি চাঁপাডাঙ্গার দিকে। আমতা লাইনে বড়গাছিয়ায় পরবর্তী ষ্টেশনগুলির নাম ছিল পাতিহাল, মুন্সীরহাট, মাজু, দক্ষিণমণ্ডু জালালাসি, পানপুর, হরিশদাদপুর ও আমতা। চাঁপাডাঙ্গা লাইনে হাওড়া জেলার শেষ ষ্টেশন ছিল জগৎবল্লভপুর।

গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, পালকী ও রিক্সা

ট্রাম-বাস-এর আগে হাওড়ায় স্থল পথের পরিবহন মাধ্যম ছিল গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী ও পাল্কী। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত ইণ্ডিয়া কোম্পানী জলপথ ব্যতীত উত্তর ভারতে সৈন্যদলের রসদ পাঠাত জি. টি. রোড ধরে ব্যাগেজ ট্রেন [Baggage Train]

নামে অভিহিত গরুর গাড়ীতে করে যেগুলির গতিবেগ ছিল দিনে ৫০ থেকে ৫৫ মাইল। হাওড়া হাঁসপাতালে দুর থেকে রোগী আসত গরুর গাড়ীতে করে। উপযুক্ত রাস্তার অভাবে জেলায় যাত্রীবাহী গরুর গাড়ীর বিশেষ চল হয়নি, এখন প্রায় বিলুপ্ত। সালকিয়ায় ছিল গ্যাসপার সাহেবের ঘোড়ার আস্তাবল ও গাড়ীর গ্যারেজ। গ্যাসপার কোম্পানীর গাড়ী মাসিক ভাড়ায় কলকাতায় চলাচল করত। সালকিয়া চৌরাস্তা থেকে হাওড়া কোর্ট পর্য্যন্ত শেয়ারের ঘোড়ার গাড়ী চলত। এখান থেকে বেনারস রোড দিয়ে কাশী পর্য্যন্ত চলত যাত্রী বোঝাই গরুর গাড়ী। গ্রামাঞ্চলে আগে পাল্কীই ছিল শিশু-বৃদ্ধ-নারী ও অসুস্থদের পরিবহন সহায়ক, এখন হয়েছে সাইকেল রিক্সা। হাওড়া শহরে সাইকেল রিক্সা এবং সামান্য সংখ্যক হাতে টানা রিক্সা চালু আছে।

ট্রাম বাস

যখন হাওড়া সেতুটি ভাসমান ছিল তখন তার উপর দিয়ে গরু ও ঘোড়ার গাড়ী যাতায়াত করত। ট্রাম ব্রীজে চড়তনা। ঝোলান সেতু [রবীন্দ্র সেতু] তৈরী হ'বার পর ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে সেতুর উপর দিয়ে কলকাতার ট্রান হাওড়া ষ্টেশনে যাওয়া আসা শুরু করে। হাওড়া শহরে ট্রাম চালাবার প্রথম পরিকল্পনা হয় ১৯০৫-এ বাস্তবায়িত হয় ১৯০৮-এ। ঘোড়ায় টানা ট্রাম নয়, বিদ্যুৎ চালিত ট্রাম। ১০ই জুন ১৯০৮-এ জি. টি. রোড দিয়ে হাওড়া ষ্টেশন—কেওড়াপাড়া ঘাট রোড [শিবপুর] পথে ট্রাম চলাচল শুরু হয়। ৪০ নম্বর রুটের এই ট্রামগুলি ছিল এক কামরার —কেবল দ্বিতীয় শ্রেণী এবং সামনে একটি ও পিছনে একটি, দুই ইঞ্জিন বিশিষ্ট। শিবপুর ট্রাম ডিপোতে গাড়ী ঘোরাবার জায়গা না থাকার জন্যই দুই ইঞ্জিন বিশিষ্ট গাড়ী নির্দিষ্ট ছিল দুই মাইল দীর্ঘ এই পথটির জন্য। ৪১ ও ৪২ নম্বর রুটের এক কামরা এবং দুই

কামরার ট্রামগুলি হাওড়া ষ্টেশন থেকে বাঁধাঘাট পর্যন্ত যেত। একটি লাইন ছিল হাওড়া রোড গোলাবাড়ী হয়ে, অপরটি জি. টি. রোড হয়ে। ঘাসবাগানে ছিল এই ট্রামগুলির ডিপো।

এক সময় শিবপুর-সালকিয়া সংযোগকারী ট্রামের চলাচলও ছিল। ২৯.৬.১৯৫৭ থেকে বাঁধাঘাট ও শিবপুর থেকে ডালহৌসী পর্যন্ত ট্রাম চলাচল শুরু হয়। হাওড়ার ট্রাম লাইনগুলির মোট দৈর্ঘ্য ছিল ৪½ মাইল।

১৯৭০-এর ২৫শে অক্টোবর ট্রাম কোম্পানী বাঁধাঘাট লাইনের ট্রাম বন্ধ করে দেবার কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু কর্মীরা এই আদেশ অমান্য করে ট্রাম চালান। বাঁধাঘাট লাইনের ট্রাম তুলে নেওয়ার প্রতিবাদে ২৭শে অক্টোবর থেকে দু'দিনের জন্য কলকাতার সমস্ত ট্রাম চলাচল বন্ধ থাকে। ১৯৭১-এর ৫ই ডিসেম্বর বাঁধাঘাটের মত শিবপুরের ট্রামও উঠে যায়। ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়ার ট্রাম চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল বলে ঘোষণা করা হয়।

হাওড়ায় প্রথম বাস চালু হয় সালিকায়। বাসের নাম ছিল শ্রীকৃষ্ণ। হাওড়া-বালী পথের প্রথম বাসের নাম-সন্ন্যাসী। সালিকার বাবুডাঙ্গার ঢ্যাং পরিবারের কার্ত্তিক ও গণেশ নামে দু'টি বাস ছিল। সালকিয়া ট্রান্সপোর্ট এজেন্সির প্রতিষ্ঠাতা নন্দকুমার সিংহ-এর বাসের নাম ছিল "সন্ন্যাসী"। সাধারণ বাসে হাওড়া থেকে বেলুড় যাওয়ার ভাড়া ছিল ৬ পয়সা এবং অরেঞ্জ-জুনিয়েল নামে লাক্সারী বাসে আরও দু'পয়সা বেশী।

যাত্রী পরিবহনের জন্য হাওড়ায় ১৭টি প্রাইভেট রুটে দৈনিক প্রায় ৫৫০টি বাস চলে। শিবপুর এবং কদমতলা হ'য়ে আমতার দিকে কিছুদুর পর্যন্ত সরকারী বাসও চলে। হাওড়া ষ্টেশনের কাছে সরকারী বাসের একটি ডিপো আছে। মিনিবাস ও ট্যাক্সীর প্রচলনও যথেষ্ট।

ডাক-তার

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দ্রুতগামী কে ? উত্তর-মন বা চিন্তাশক্তি। সেই চিন্তাকেও পত্রের আশ্রয় নিতে হয় স্বল্প ব্যয়ে দুই দূরবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে-যার অবশ্যম্ভাবী ফল বর্ত্তমান ডাক-ব্যবস্থা।

প্রাচীন ভারতের ডাক ব্যবস্থার প্রথম সংস্কারক কৌটিল্য। মুঘলযুগে ঘোড়ার ডাক ব্যবস্থার প্রচলন করেন শেরশাহ। তাঁর তৈরি গ্র্যাণ্ড ট্রাংক রোড দ্রুত ডাক বহনের সহায়কও হয়। এরপরই নাম করতে হয় রোল্যাণ্ড হিলের-যিনি জানসাধারণের সুবিধার্থে সস্তায় ডাক বিলির জন্য সরকারী সহযোগিতায় ডাক-টিকিটের প্রচলনে অগ্রণীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'ন।

শেরশাহ ডাক-ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করেন সম্ভবতঃ ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে। প্রায় সওয়া দু'শ বছর পর ১৭৬৬-তে লর্ড ক্লাইভ আধুনিক অর্থে স্থায়ী ডাকঘর প্রতিষ্ঠার কাজে উদ্যোগী হ'ন। সেই পরিবর্ত্তনের জোয়ারে হাওড়ার মাটিতেও ডাকঘর প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়।

১৮২৯-এর ৬ই জুন বঙ্গদূত পত্রে নুতন ডাকঘর প্রতিষ্ঠা ও ডাক মাশুল সম্পর্কিত যে সংবাদটি প্রকাশিত হয়, তাহা নিম্নরূপ—গত ২৩শে তারিখে রোজরিও কোম্পানী কলিকাতায় এক আনা মাশুলের ডাকঘর স্থাপনের বিষয়ে আপন সকল কথা প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কলিকাতার মধ্যে ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে চিঠি বাঁটিয়া দিবেন, একভরি পর্যন্ত একআনা মাশুল লাগিবে এবং এক অবধি দুইভরি পর্যন্ত দুইআনা এবং দিনের মধ্যে তাঁহারা তিনবার চিঠি পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম বন্টন প্রাতঃকাল নয় ঘন্টার সময়ে দ্বিতীয় বন্টন দুইপ্রহর এক এক ঘন্টার সময়ে তৃতীয় বন্টন অপরাহ্নে পাঁচঘন্টার সময়ে হইবেক। ঐ সাহেব লোকেরা কলিকাতার মধ্যেই চিঠি প্রেরণ করিতে কল্পনা

করিয়াছেন তাহা নহে. কিন্তু আশপাশ স্থানে যথা উত্তর দিকে চিৎপুর, কাশীপুর পর্যন্ত। পূর্বদিকে দমদমা ও নীলগঞ্জ পর্যন্ত। দক্ষিন দিকে বালীগঞ্জ ও খিদিরপুর পর্যন্ত। পশ্চিমদিকে হাবড়া সালিখা, শিবপুর পর্যন্ত। কলিকাতার মধ্যে দিনে তিনবার চিঠি প্রেরণ করিবেন এবং দমদমা প্রভৃতি স্থানে দিনে দুইবার। এই রীতির আরম্ভ গত ২ জুন সোমবার আরম্ভ হইয়াছে।" অর্থাৎ ১৯২৯-এর ২রা জুন থেকে হাওড়ার সালকিয়া থেকে শিবপুর পর্যন্ত দিনে দু'বার চিঠি বিলি ব্যবস্থা হয়।

হাওড়ার জন্য একটি স্বতন্ত্র পোস্টাল ডিভিসন আছে। প্রথম প্রধান ডাকঘরটির অবস্থান হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির পাশে বাকল্যাণ্ড ব্রীজ (বঙ্কিমসেতু) শুরু হওয়ার মুখে। পরেরটি'র অবস্থান সালকিয়াতে।

হাওড়া জেলার ডাকঘরের সংখ্যা — [জুলাই ১৯৮০ পর্যন্ত]

সময়	প্রধান ডাকঘর	সাব অফিস	ব্রাঞ্চঅফিস	মোট
স্বাধীনতার আগে	১	৩০	৭৪	১০৫
স্বাধীনতার পর	২	৭০	২৮৪	৩৫৬

এ ছাড়া চিঠি বিলি না করা পোষ্ট অফিস আছে—
হাওড়া শহরে—২২, বালীতে—২, লিলুয়ায়—২
এবং জগাছায়—১, মোট—২৭টি

কয়েকটি পিন কোড

আমতা—711401, অনন্তপুর 711301, বাগনান—711303, বালী—711201, বালটিকুরী—711402, বানিপুর—711304 বাঁকড়া—711403, বড়গাছিয়া—711404, বাউরিয়া—711305 বেলুড়মঠ—711202 ভট্টনগর—711203, বাকসারা—711306 বোটানিকেল গর্ডেন—711103, চেঙ্গাইল—711308, দাশনগর—711105, ডোমজুর-711405, ফোর্টগ্লস্টার-711310

অতিথিবৃন্দকে শহরের প্রথম নাগরিক হিসাবে হাওড়া ষ্টেশনে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করার।

লর্ড ল্যান্সডাউন তখন বাংলার লাটসাহেব। স্বদেশীযুগ। ল্যান্সডাউন সাহেব হাওড়ায় এসে দেখেন এদেশীয় কোন লোক তাঁকে সম্বর্ধনা-জানাতে আসেননি। সঙ্গীরা জানালেন, ক্লাইভষ্ট্রীট দিয়ে ঘোড়ার গাড়ীতে করে লাটভবনে যাওয়া নিরাপদ নয়। অতএব জলপথে ষ্টীমার যোগে যাওয়ার অনুমতি হ'ক। নূতন ব্যবস্থায় লাটসাহেবের একান্ত অনিচ্ছা দেখে বর্ধমান থেকে নূতন ঘোড়সওয়ার দল আনিয়ে উপযুক্ত প্রহরার ব্যবস্থা করে স্থল পথেই লাট সাহেবকে নিয়ে যাওয়া হ'ল। নূতন ব্যবস্থায় আয়োজনে সময় লাগে প্রায় ৮-১০ ঘণ্টা। বলাবাহুল্য লাট সাহেবকে এই সময়টুকু ষ্টেশনেই কাটাতে হয়। হাওড়া ষ্টেশনের আর কোনদিন সৌভাগ্য হয়নি অপর কোন লাট সাহেবকে এতক্ষণ ষ্টেশন চত্বরে আশ্রয় দেবার।

সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় প্রকাশ ষ্টেশনদিয়ে সকাল ৮টা থেকে রাত্রি ৮টার মধ্যে দৈনিক ১৮৮০০০ জন যাত্রী চলাচল করে। সকাল ৯টা থেকে ১০টার মধ্যে প্রায় ২৪০০০ জন যাত্রী আসে এবং বিকাল ৬টা থেকে ৭ টার মধ্যে ১৪০০০ জন যায়।

হাওড়ার সুড়ঙ্গপথ

ষ্টেশন এলাকায় যাতায়াত ব্যবস্থা সুগম করার উদ্দেশ্যে নির্মিত সুড়ঙ্গপথটি সর্বসাধারণের জন্য ১৯৭২-এর ২৭শে মার্চ খুলে দেওয়া হয়। অনুসন্ধান কার্যালয় এবং পূর্ব রেলপথের শহরতলীর টিকিট ঘর এই পথটির মধ্যে অবস্থিত। এছাড়া আছে একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাজার।

হাওড়ার ভাসমান সেতু

"But London has a bridge and calcutta has none" ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ জে, সি, মার্শম্যান আই, সি, এস এই মন্তব্য করার কয়েক বছর পর ১৮৫৫-৫৬ তে কলকাতা-হাওড়ার মধ্যে সহজে যাতারাতের উপায় হিসাবে একটি সেতু নির্মাণের জল্পনা কল্পনা শুরু হয়। ১৮৭১-এ আইন পাশ করে স্যার ব্র্যাডফোর্ড লেসলীকে সেতু নির্ম্মাণের ভার দেওয়া হয়। যুক্ত রাজ্য থেকে সেতুর বিভিন্ন অংশ তৈরী করে কলকাতায় জুড়ে ১৫২৮ ফিট লম্বা এবং ৬২ ফিট চওড়া ভাসমান সেতু [চলিত কথায় কেঠোপুল] চালু হয় ১৮৭৪-এ। সেতুর দু ধারে ছিল ৭ ফুট চওড়া পথচারীদের এবং মধ্যে ৪৮ ফুট চওড়া গাড়ী চলাচলের পথ। খরচ পরে ৩৪, ১১, ৪৪০ টাকা। সারা ভারতের মধ্যে এটিই ছিল একমাত্র ভাসমান সেতু। বর্তমান রবীন্দ্র সেতু তৈরী হওয়ার আগে পর্যন্ত কলকাতার বড়বাজার ও হাওড়া ষ্টেশনের মধ্যে সহজ যোগাযোগের জন্য ভাসমান সেতুটি চালু ছিল। গঙ্গা দিয়ে সেতুর একদিক থেকে অপর দিকে জাহাজ প্রভৃতির যাওয়া-আসার প্রয়োজনে সেতুটির মধ্যাংশ খোলা হ'ত। আবার জোড়া না লাগান পর্যন্ত সেতু দিয়ে লোক ও গাড়ী চলাচল বন্ধ থাকত। সেতুটি চালু হয় ১৮৭৪-এর ১৭ই অক্টোবর, বিলুপ্ত হয় ১৯৪৫-এ। ট্রাম ব্যতীত অপর সকলপ্রকার যানবাহন সেতু দিয়ে যাতায়াত করত। সে যুগের The English man পত্রিকায় হাওড়া ব্রীজ নিয়ে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। লেখকের নাম হিসাবে ছাপা হয়েছিল Diogens. কবিতাটি হ'ল—

The Howrah Bridge

I stood on the Bridge at midnight,
And gazed at the waters below.
And thought of the fanciful dreams that
From the brains of our councillors flow.

Then I thought of the quick intuition,
Which these schemes had engendered and said,
"With these schemes over come to fruition ?"
Then I quietly stood on my head.

For I'd looked at the question side ways,
And from both sides of the town,
Taking careful account of the tide ways,
But never from upside down.

So I've got a new angle of vision.
As bright and as fresh as wet paint,
Which will take off the general attention
Away from the New Market Saint.

Up my sleeve I've another red herring
"The scare of the Bidyadhari"?
Which will merrily keep the ball rolling
Ere the Bridge on the Hooghly is built.

ভাসমান সেতুর বয়স যখন পঞ্চাশ পেরুল তখন একটি ভাসমান সেতু অথবা স্থায়ী সেতু নির্মাণ করা হ'বে এই নিয়ে অনেক বিচার-বিবেচনার ঝড় উঠার পর স্যার রাজেন্দ্র নাথ মুখার্জীর সভাপতিত্বে ইঞ্জিনিয়ারদের এক বৈঠকে ঠিক হয় ভাসমান নয়, স্থায়ী ঝোলান সেতু তৈরী হ'ক।

ঝোলান সেতু [রবীন্দ্র সেতু]

বাষ্পীয় শক্তির আবিষ্কারের পর হাওড়া থেকে গোবিন্দপুর [কলকাতা] পর্যন্ত সেতু তৈরী করে তার উপর দিয়ে ট্রেন চালানোর

পরিকল্পনা করা হয়। জন্মলগ্নেই পরিকল্পনাটির পরিসমাপ্তি ঘটলো। ট্রেন আর হাওড়া থেকে গঙ্গা পেরিয়ে কলকাতায় যেতে পারলো না। কলকাতাবাসীদের আরামে গঙ্গা পেরিয়ে ট্রেনে চড়ায় সুবিধার জন্য তাই তৈরী হয়েছিল ভাসমান সেতু। পরে ভাসমান সেতুর ২০০ গজ উত্তরে ৩.৩৩ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরী হ'ল বর্তমান ঝোলান সেতু —যেটি পৃথিবীর ক্যান্টিলিভার জাতীয় সেতুগুলির মধ্যে চতুর্থ বৃহত্তম সেতু। পৃথিবীর প্রথম চারটি সেতুর উত্তার [span] হ'ল—কুইবেক সেতু ১৮০০ ফিট, ফার্থ অব ফোর্থ সেতু ১৭০০ ফিট, নিউ অরলীন সেতু—১৫৭৫ ফিট এবং রবীন্দ্র সেতু ১৫০০ ফিট।

আট বছর পরিশ্রমের পর ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে এই সেতু তৈরীর কাজ শেষ হয়। সভা করে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনদিন সেতুটির উদ্বোধন করা হয়নি। কারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন গোপনতা ও জাপ আক্রমণ ভীতি। ১-২-১৯৪৩ তারিখে একটি ট্রাম গাড়ী চালিয়ে সেতুর উদ্বোধন করা হয়। আরও ১৮ দিন পরে সর্বসাধারণের জন্য সেতুটি উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। প্রথম যাত্রী পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্ট, যিনি মোটরে ব্রীজটি অতিক্রম করেন। ব্রিটিশ যুগের হাওড়া ব্রীজের বর্তমান নাম রবীন্দ্র সেতু, নক্সাকার মেসার্স রেণ্ডেল, পামার এণ্ড ট্রিটন কোম্পানী পরামর্শদাতা ক্লীভল্যাণ্ড ব্রীজটি ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী। প্রাথমিক নির্মাণকার্য্যের ভার ন্যস্ত করা হয়েছিল মেসার্স ব্রেথওয়েট বার্ণ এণ্ড জেসপ কনস্ট্রাকসন কোম্পানীর উপর। সেতুটি উত্তাপে দিনে ৪৮ ইঞ্চি [১.২২ মিঃ] লম্বা হয় আবার রাত্রে সঙ্কুচিত হয়ে যায়। জোরে হাওয়া দিলেও কিছুটা হেলে যায়। এখন ঘণ্টায় ১০,০০০ গাড়ি সেতু দিয়ে কলকাতা থেকে হাওড়ায় আসে।

বালীব্রীজ—বিবেকানন্দ সেতু

গঙ্গার পূর্বে দক্ষিনেশ্বরে সঙ্গে পশ্চিমে বালীর সংযোগকারীর সেতুটির জন্ম মূহুর্তের নাম উইলিংডন ব্রীজ। বর্তমানে বিবেকানন্দ

সেতু। ১৯২৭-২৮ খ্রীঃ—এ ১, ১৪, ৬৭,০০০ টাকা খরচ করে সেতুটি তৈরী করা হয়। সেতুটির উপর দিয়ে শুধু বাস, লরী, পথচারীই নয় রেল চলাচলেরও ব্যবস্থা আছে। ১১,১,১৯৭৪ রাত ১২টা থেকে সেতুর উপর দিয়ে গাড়ী যাতায়াতের জন্য দেয় টোল উঠে যায়। গত ৩২ বছর ধরে টোল চালু ছিল। সেতুটি লম্বায় প্রায় দেড় হাজার ফুট ও চওড়ায় একশ ফুট।

শরৎ সেতু

বাগনান ২নং ব্লকের নাউপালা মৌজায় অবস্থিত শরৎ সেতু হাওড়া জেলাকে মেদিনীপুরের সাথে যুক্ত করেছে।

দ্বিতীয় হুগলি সেতু

রবীন্দ্র সেতুর উপর থেকে অত্যধিক গাড়ী চলাচলের চাপ কমাবার এবং পরিবহন ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুতর করার উদ্দেশ্যে শিবপুরের দীনবন্ধু কলেজের পাশ থেকে কলকাতার প্রিন্সেপ ঘাট পর্যন্ত সংযোগকারী দ্বিতীয় হুগলী সেতু তৈরীর কাজ শুরু হয়ে গেছে। ১৯৭২-এর ২০শে মে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী সেতুটির শিলান্যাস করেন। গঙ্গাগর্ভে কোন থাম না বসিয়ে শুধু খিলানের উপর সেতুটি তৈরী হবে। খিলানের দৈর্ঘ্য ১০০০ ফুট, প্রস্থ ৯৭ ফুট। নদীর দুইপাড়ে ৪৪০ ফুট উঁচু লোহার থামের সাহায্যে খিলানটিকে ঝোলান হ'বে। খিলানটির অবস্থান হ'বে গঙ্গার জল থেকে ১১৩ ফুট উঁচুতে। যাতে সেতুর তলা দিয়ে জাহাজ চলাচলের কোন অসুবিধা না হয়, সেজন্য সেতুটি যেন দিল্লীর কুতুব মিনারের চেয়েও ৩৫ মিটার উঁচু হয় সেইরূপ পরিকল্পনা করা হয়েছে। আপ ও ডাউনের গাড়ীগুলি যাতে কেউ কারোর রাস্তা অবরোধ করতে না পারে সেজন্য সেতুর মাঝখানে দশ ফুট চওড়া একটি মধ্যবর্তী ফালি থাকবে, যার দু'পাশে থাকবে ছত্রিশ ফুট চওড়া দু'টি রাস্তা। দু'পাশে থাকবে সাত ফুট চওড়া পায়ে চলার

পথ যা দিয়ে অন্তত দৈনিক ষাট হাজার পথচারী যাতায়াত করতে পারবে। পরিকল্পনা মাফিক ১৯৮৩-এ দৈনিক ৬৯০০০টি এবং ১৯৯৩-এ ১,৩৬,০০০টি দ্রুতগামী যান সেতুর উপর দিয়ে চলাচল করতে পারবে।

হাওড়ার দিকে সেতুপথটি জি, টি, রোড, ৬নং জাতীয় সড়ক [কোনা এক্সপ্রেস ওয়ের সাহায্যে] মধ্য হাওড়া এক্সপ্রেস ওয়ে এবং উপপথ দ্বারা ফোরশোর রোড ও আন্দুল রোডের সংগে যুক্ত হবে। এই সঙ্গে শালিমারে একটি রেল টার্মিনাল ষ্টেশন হ'বে বলে ঠিক হয়েছে।

বৃহত্তর হাওড়া শহরের সেতুসমূহ

বৃহত্তর হাওড়া শহরের সেতুগুলিকে তাহাদের প্রকৃতি অনুযায়ী তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

(১) রেললাইনের উপর পথসেতু—(ক) ব্যাকল্যাণ্ড ব্রীজ (খ) চাঁদমারী ব্রীজ (গ) টিকিয়াপাড়া ফুট ব্রীজ (ঘ) বামনগাছি ব্রীজ।

(২) পথের উপর রেলসেতু (ঘ) মধুসূদন পাল চৌধুরী রোড ব্রীজ (ঙ) নটবর পাল রোড ব্রীজ (চ) শানপুর জলা ব্রীজ (ছ) মাকড়দহ রোড [দাশনগর ষ্টেশন সন্নিকট] ব্রীজ।

(৩) খালের উপর পথসেতু (জ) ইলিয়ট ব্রীজ (ঝ) জগাছা-রোড ব্রীজ এবং (ঞ) বালী খালব্রীজ।

বাকল্যাণ্ড ব্রীজ [ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র সেতু]

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ম্যাপে দেখা যায় বর্তমান হাওড়া ষ্টেশন এলাকায় ধান ক্ষেত এবং বাগানের মধ্য দিয়ে কয়েকটি আঁকাবাঁকা রাস্তা। হাওড়া ষ্টেশন তৈরী হবার পর ১৮৮৪ খ্রীঃ-এ জনসাধারণের সুবিধার্থে

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানী গঙ্গা থেকে প্রায় ৫০০ গজ দূরে পুরাতন বাকল্যাণ্ড ব্রীজটি তৈয়ারী করান। পরবর্তীকালে জেলা শাসক মিঃ বাকল্যাণ্ড এটির উল্লেখযোগ্য সংস্কার করেন। সেতুটি লম্বায় ১৯২৬ ফুট। গাড়ী যাতায়াতের রাস্তাটি ৩৩ ফুট এবং দু'দিকের ফুটপাত ৬ ফুট চওড়া। স্বাধীন ভারতে সেতুটির নূতন নাম হয় ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র সেতু।

পুরাতন সেতুটি জীর্ণ হওয়ায় সি, এম, ডি, এ, হাওড়া উন্নয়ন-সংস্থা ও রেলকর্তৃপক্ষের মিলিত প্রচেস্টায় নূতন বঙ্কিম সেতু নির্মিত হয়েছে। নূতন সেতুটি লম্বায় ৩১২ ফুট, চওড়ায় ৮৫ ফুট এবং রেললাইন থেকে ২৫ ফুট উঁচুতে অবস্থিত। নবনির্মিত ঋষি বংকিম সেতুর উদ্বোধন হয় ২৯-১- ১৯৮১ তারিখে।

চাঁদমারী ব্রীজ [বাঙালবাবুর পোল]

আপজনের ম্যাপে জায়গাটিকে বঙ্গীয় গোলন্দাজ বাহিনীর প্রাক্তন অনুশীলন কেন্দ্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সেইসূত্রে অধুনালুপ্ত মার্টিন লাইট রেলওয়ের হাওড়া ময়দান ষ্টেশন সন্নিকটস্থ ব্রীজটির পোষাকী নাম রাখা হয় চাঁদমারী ব্রীজ। সাধারণের মধ্যে এর পরিচিতি কিন্তু মার্টিন ব্রীজ অথবা বাঙাল বাবুর পোল নামে। এইস্থানে বসবাসকারী বাঙালবাবু অর্থাৎ রামরতন বোস ও তাঁর বংশধরগণের পৈত্রিক নিবাস এবং জমিদারী ছিল পূর্ববঙ্গে।

রেললাইনের উপর দিয়ে উত্তর ও দক্ষিণে জি. টি. রোড-এর সংযোগকারী সেতুটির পথবিস্তার ৩৫ ফুটের চেয়ে ২ ইঞ্চি কম।

টিকিয়াপাড়া ফুট ব্রীজ

ব্রীজটির দৈর্ঘ্য ৩৯৩ ´৪´´ এবং ইহার ফুটপাথের দৈর্ঘ্য ৮´৬´´

বামনগাছি ব্রীজ

গড়ে ২৬ ফুট প্রশস্ত এই ব্রীজটি বেনারস রোডকে এপাড় থেকে ওপাড়ে নিয়ে গেছে।

মধুসূদন পাল চৌধুরী রোড ব্রীজ

রাস্তা থেকে ব্রীজটির তলদেশ মাত্র ১০ ফুট উচ্চে অবস্থিত বলে খুব উঁচু করে ভর্তি লরী এর তলাদিয়ে যেতে পারে না।

শানপুর জলা ব্রীজ

রাস্তা ২ থেকে ফুট উঁচুতে অবস্থিত।

মাকড়দহ রোড ব্রীজ

এক সময় এটির তলা দিয়ে যেত মার্টিন লাইট রেলওয়ে। ব্রীজের উপরে আছে দঃ পূঃ রেল পথের লাইন। নিকটবর্তী ষ্টেশনটির নাম দাশনগর।

ইলিয়ট ব্রীজ

শালিমার রেলষ্টেশনের দক্ষিণে B. E. College এর নিকট স্বর্ণময়ী খালের উপর অবস্থিত। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে জনগণের সুবিধার্থে স্যার গোপাল দাশ শীলের টাকায় বার্ণ এণ্ড কেং এটি তৈরী করেন।

জগাছা রোডব্রীজ

হাওড়া ড্রেনেজ ক্যানেলের উপর অবস্থিত।

বালী খালবীজ

ক্যাপ্টেন গুডউইনের তত্বাবধানে বালীখালের উপর সর্বপ্রথম ১৮৩৪-৩৫ খ্রীঃ-এ একটি ঝুলন্ত কাঠের সেতু নির্মিত হয়। ১৮৪৫-এ

এটি ভেঙে গেলে অপর একটি সেতু নির্মিত হয় যার উদ্বোধন করেছিলেন বাংলার ডেপুটি গভর্নর। সর্বশেষ সেতুটি তৈরী হয় বিবেকানন্দ সেতু নির্মাণের সম সাময়িককালে।

অন্যান্য সেতু

ছোটখাট খাল বা নালাতে আরও অনেক সেতু আছে যেগুলির উল্লেখ তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। ২৭,৫; ১৯০২ তারিখের ষ্টেটসম্যান এ প্রকাশিত একটি সংবাদের অংশবিশেষ হ'ল কলুটোলা নিবাসী বিখ্যাত ধনী স্বর্গত কানাই লাল শীলের পুত্র গোপাল লাল শীল গত রবিবার সন্ধ্যায় পরলোক গমন করেন। তাঁর অন্যান্য দানের মধ্যে একটি হ'ল হাওড়ায় রেলব্রীজ নির্মানের জন্য সরকারের হাতে ৪০০০০ টাকা দান। এই টাকায় কোন ব্রীজ নির্মিত হয়েছে তা এখনও অজ্ঞাত।

হোটেল

পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অংগ হিসাবে দীর্ঘদিন ধরে এদেশের অধিবাসীরা চটি বা যাত্রীদের সাময়িক আবাসস্থলের সংগে পরিচিত। পরবর্তীকালে চালু হ'ল হোটেল। বর্তমানে হাওড়া ষ্টেশনের উত্তর দিকে কয়েকটি আধুনিক হোটেল আছে। ১৮৪ -এর ৮ই নভেম্বর দৈনিক ষ্টেটসম্যান-এ হাওড়া হোটেলের যে বিজ্ঞাপনটি ছাপা হয় তাতে দেখা যায় এখানে থাকা-খাওয়া ব্যতীত শিকারের সুযোগও ছিল। বিজ্ঞাপনটি নিম্নরূপ—

Sport at Howrah

Howrah sporting Hotel and Grounds. The sporting Community of calcutta are respectfully informed that the proprietor of the above Hotel has

most Comfortable accommodation and begs to announce that his grounds are well capable of affording amusement in many English sports; also that Gentlemen wishing to try their dogs will at all times be able to meet with a Jackal or Fox. Pigeons also will be procured for any matches by giving two days notice. Best wines, Beer and spirits may be relied upon. Howrah Hotel, Howrah ghat near the Roman Catholic church.

তৃতীয় অধ্যায়

স্বাস্থ্য

(ক) স্থলের

কলকারখানার শহর হাওড়াকে অবজ্ঞা জানিয়ে অনেকে বলেন কুলী শহর, শহরের খোলা ড্রেন, বর্ষার কাদামাখা পথ দেখে অবশ্য কালি-ঝুলি-মাখা কারখানার কুলীর কথাই মনে হয়।

কাঁচা ড্রেনও যখন ছিল না তখত শহর-স্বাস্থ্য ছিল শোচনীয়। ১৭৫০-এ হাওড়ার দিকে গঙ্গার ধার ছিল কাদাভর্তি, শহর ছিল ম্যালেরিয়ার ডিপো। জেলার দক্ষিণে নীচু জলা জায়গায় ছিল কিছু বন-জঙ্গল। জঙ্গলে সাপ, বুনো শুয়ার, মাঝে মাঝে চিতা বাঘেরও দেখা মিলত। এখনও হাওড়ায় মশার আধিক্য যথেষ্ট তবে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অনেক কম। রাস্তায় জমাজঞ্জাল, খাটা পায়খানা আর খোলা নর্দমা পরিচ্ছন্ন শহর সৃষ্টির পথে পর্বত প্রমাণ বাধার সৃষ্টি করছে। প্রতিদিন সকালে খাটা পায়খানা পরিষ্কার করে যা পাওয়া যায় এক সময় যোগমায়া সিনেমার কাছ থেকে বেলগাছিয়া পর্যন্ত বাষ্পচালিত ট্রেন তা বহন করত। এই আবর্জনা এই ফের-সোনা। জমা আবর্জনাকে পরিশোধন করে জমিতে ছড়িয়ে ফসলের পরিমাণ বাড়ানোর কাজে ব্যবহারোপযোগী করে তোলার উদ্দেশ্যে হাওড়ার দাশনগর ও রামরাজাতলা ষ্টেশনের মধ্যবর্তী আড়ুপাড়া অঞ্চলে একটি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পের উৎপাদন ৩.৫ বর্গ মাইল এলাকার ৩ লক্ষ অধিবাসীর উপকার সাধনে সক্ষম হবে। খাটা পায়খানায় নানা প্রকার অসুবিধার জন্য সি, এম, ডি, এ এগুলিকে সেপটিক পায়খানায় পরিবর্তিত করার জন্য নানাভাবে সাহায্য করছেন।

আবর্জনা ব্যতীত শহর সভ্যতার সাথে অপর যে দু'টি উৎপাতের প্রাদুর্ভাব ঘটে সে দুটি হ'ল ধোঁয়া এবং শব্দ। ইংরাজ শাসকগণের মধ্যে লর্ড কার্জন সর্বপ্রথম ধোঁয়ার উৎপাতে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ও অন্যান্য সুদৃশ্য সৌধগুলিকে কলঙ্কিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষার জন্য ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে শেফীল্ড থেকে নিকলসন সাহেবকে পরামর্শ দেবার জন্য ভারতে আনান। ফল ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বেঙ্গল স্মোক-নুইসেন্স এ্যাক্ট। ভারতের শেফীল্ড হাওড়াতেও এই আইন জারী করা হল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্মোক নুইসেন্স ডাইরেক্টরের অধীন গঙ্গার পশ্চিম পাড়ের এলাকাগুলি হ'ল হাওড়া ও বালি পৌর অঞ্চল, পাঁচপাড়া, রামরাজাতলা, ইছাপুর, সাঁতরাগাছি, শানপুর, দাশনগর প্রভৃতি এলাকা সংস্থাটির কাজ হল (১) চুল্লী, ধোঁয়া বেরোবার নল, চিমনী ইত্যাদির প্ল্যান মঞ্জুর করা ও সেগুলি প্ল্যানমত তৈরী হচ্ছে কিনা দেখা। (২) কারখানার চিমনী থেকে নির্দ্দিষ্ট মাত্রা এবং উপাদানের ধোঁয়া বেরোচ্ছে কি না দেখা (৩) মোটরযান ও জলযান থেকে অস্বাস্থ্যকর ও আপত্তিকর ধোঁয়া বেরোচ্ছে কিনা দেখা এবং মালিক বা চালকদের চাপ দিয়ে ধোঁয়ার উৎপাত বন্ধ করা।

রেলইয়ার্ডে শান্টিং-এর কাজে বাষ্পীয় ইঞ্জিন ব্যবহৃত হয়। National Environmental Engineering Research Institute এই কাজে ইলেকট্রিক ও ডিজেল ইঞ্জিনের ব্যবহার চান। কলকারখানায় আবর্জনা চল্লিশ ফুট পর্যন্ত উঁচু করে রাখা যেতে পারে। এবিষয়ে ইনষ্টিটিউটের সুপারিশ হ'ল—

Introduction of "straight vertical terminating as high from the ground as possible" specially for state Buses to reduce fumigation and noise.

শব্দ শুধু ষ্টেট বাসের নয় প্রাইভেট বাস লরী মোটরের শব্দও যথেষ্ট তীক্ষ্ণ ও কর্ণ পীড়াদায়ক। অতিরিক্ত শব্দে রক্তচাপ বেড়ে যায়, স্নায়বিক বৈকল্য, ক্লান্তি প্রভৃতি দেখা দেয়। উপযুক্ত নগর

পরিকল্পনায় তাই যানবাহনের পথ তৈরী করা হচ্ছে বসতি এলাকা থেকে দূরে।

(খ) জলের

এ'ত গেল ডাঙার কথা, জলের অবস্থাও আদৌ ভাল নয়। যেদিন থেকে হুগলী নদীর দু-ধারে কারখানা শিল্পের জন্ম সেদিন থেকেই নদীর জল দুষিতকরণ হওয়ার শুরু। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা করপোরেশনের ড্রেনেজ ইঞ্জিনীয়ার মিঃ উইলকিনস লিখেছিলেন—

There is no doubt that as the city develops like wise Howrah and other Municipalities in the neighbourhood the question of river pollution looms largly ahead

মন্তব্যটির সারবত্তা স্বীকার করে ১৯২৬-এ বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল হুগলী নদীর জল কতটা দূষিত হয়েছে তা পরীক্ষার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করেন। কিছুকাল আগের এক সমীক্ষায় হুগলী নদীর মোহনায় দৈনিক দুষিত জলের পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে গৃহ ব্যবহার্য ৬০০ গ্যালন এবং শিল্প ব্যবহার্য ৯৭০ লক্ষ টন এবং "At many sampling points dissolved oxygen was found to be less than four million gallons a liter."....

হুগলী নদীর জল যেমন ক্রমশ খারাপ হয়ে পড়ছে, নিম্ন দামোদরের জলও তেমনি হয়ে পড়েছে পেটের পক্ষে বিষ। নদীর জল যাতে আর দুষিত না হয় সে বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গে জল আইন [১৯৭১] অনুযায়ী রাজ্য জল পর্ষদ গঠিত হয়েছে।

(গ) আকাশের

শহর ও তার কাছাকাছি এলাকার বাতাসও বিষভর্তি। যানবাহন ও কলকারখানার ধোঁয়া হাওড়াকে বেশ বিপদের মুখে এগিয়ে নিয়ে

যাচ্ছে। এই দুষিত বাতাসে অধিবাসীদের স্বাস্থ্যহানি ঘটে, ফুল অকালে ঝরে যায়, ফলের আকার ক্রমশঃ ছোট হতে থাকে।

৫।১।৭৬ তারিখের একটি সংবাদে প্রকাশ কলকাতাকে কেন্দ্র করে ১০০ বঃ মাঃ এলাকার বাতাস পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, তা জন স্বাস্থ্যের পক্ষে বিষময়। এ ধরণের বাতাসে হাঁপানী বাড়ে, দৃষ্টি শক্তি ক্ষীণ হয়, সময় বিশেষে ক্যান্সারের জন্ম হয়।

গঙ্গানদীর দু-ধার গার্ডেনরীচ থেকে বেলঘরিয়া এবং শিবপুর থেকে বেলুড়ের আকাশ বিষ-বাতাসে ভর্তি। এর মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা বেলুড়ের, শিবপুরের অবস্থা মন্দের ভাল। লিলুয়া, ব্যাঁটরার অবস্থাও আদৌ ভাল নয়। হাওড়া শহরের দক্ষিণে বোটানিকেল গার্ডেন। গার্ডেনের পূর্বে গঙ্গা। গঙ্গার অপর পাড়ে ২৪ পরগণায় বহু সংখ্যক কারখানা ও একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন চুল্লি। হাওড়ার দিকেও কারখানার সংখ্যা যথেষ্ট। এই সমস্ত কারখানার ধোঁয়ায় বাতাস কি রকম বিষাক্ত হয় তার একটি প্রমাণ গার্ডেনের ফুল বাগান নামে পরিচিত এলাকাটি। আগে যারা ফুল বাগানের ফুলের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হ'তেন তাদের এখন এখানে ফুল দেখা যায় না বলে দুঃখ করতে শুনেছি। ফুল ত হয়ই না উপরন্ত গাছগুলির পাতায় হলদে ছোপ দেখা যায়। বয়োবৃদ্ধেরা আগে গার্ডেনে মৌচাকও দেখতে পেতেন বলে জানিয়েছেন। আমি কোনদিন গার্ডেনে মৌচাক দেখিনি। সম্ভবতঃ আমি প্রথম যেদিন গার্ডেনে আসি তার আগেই আকাশ ভর্তি ধোঁয়ার দাপটে মৌমাছিরা পালিয়েছে। গার্ডেনের গাছে ফুল দেখলেও ফলের অভাব লক্ষ্য করেছি। ফল না হ'লে বীজ হয় না এবং নুতন গাছ জন্মায় না। যদি সব কারখানায় উচু চিমনির ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয় মনে হয় তাহ'লে নিচের বায়ুস্তর কিছুটা বিশুদ্ধ থাকবে যা প্রাণী ও প্রকৃতি উভয়েরই স্বাস্থ্যের পক্ষে কল্যাণপ্রদ হ'বে।

কয়েকজন অষ্ট্রেলীয় বৈজ্ঞানিক তাঁদের দেশে গবেষণা চালিয়ে

এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেচেন যে, ঝাউ গাছের দূষিত বাতাসকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আছে। যদি আমাদের বৈজ্ঞানিকগণ এদেশের আব-হাওয়াতেও সিদ্ধান্তটি কার্যকরী হ'বে বলে মত প্রকাশ করেন তাহলে বোটানিকেল গার্ডেনের গঙ্গার পাড়ে ত বটেই সম্ভবত শহরের কিছু কিছু জায়গায় বা কারখানার আশেপাশে ঝাউ গাছ লাগাবার প্রস্তাবটি বিবেচনা করা যেতে পারে।

পানীয় জল

ডাঃ জেমস মার্টিন নামে শ্রীরামপুরের একজন ব্যাপটিস্ট মিশনারী ১৮৫৭ খ্রীঃ-এ লেখা তাঁর Notes on the sociological Topography of Howrah নামক পুস্তকে হাওড়ায় পানীয় জলের অভাবের কথা উল্লেখ করেছেন।

হাওড়া শহরে পানীয় জলের সন্ধানে যদি একাল ছাড়িয়ে এগিয়ে যাই তাহলে দেখব ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে এক শিবপুর বাসীর আত্মচরিতের পাতায় লেখা আছে—"আমাদের খাবার জলের জন্য তখন গঙ্গাজলের ভারী ছিল। তারা সব বেশীর ভাগ উৎকলবাসী। এক পয়সা কি এরকম দিলে একভার গঙ্গাজল বাড়ীতে দিয়ে যেত। সেই জল আমরা বড় বড় জালার মধ্যে রেখে দিতাম। আর জালার গায়ে একরকম নির্মলা ফল ঘসে দিলে জলটা বেশ শিগ্‌গীর থিতিয়ে যেত, ঠিক জলের কলের ফিলটারের মতো। সে সব জলে কখনও পোকা ধরত না। অনেক দিন পর্য্যন্ত পরিষ্কার থাকত, অপর সব কাজ হত পুকুর জলে।"

শহরে খাবার জলের যোগান দেবার ভার মিউনিসিপ্যালিটির। সে আমলের হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান মিঃ ই. সি ক্র্যাস্টার-যিনি আবার হাওড়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটও—সাহেবকে খাবার জল আনতে হত নদী পেরিয়ে কলকাতা থেকে। তাঁর "দি লিটল

ওর্য়াল্ড অফ এ্যান ইণ্ডিয়ান ডিষ্ট্রিক্ট অফিসার" গ্রন্থের ২০০ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেগিয়েছেন—

Howrah Municipality is the biggest Municipality but behind-handed in the matter of drainage and water-supply.

In those days, however, the people had to chose between dirty tanks or brakish river water, while some of them—I was one, had a supply brought daily from the calcutta hydrants.

যারা কলকাতা থেকে হাওড়ায় খাবার জল আমদানী করতেন তাদের মধ্যে যারা অবস্থাপন্ন তারা বাড়ীতে একটি করে জল-ঘর রাখতেন। জলের ঘরটিকে অত্যন্ত শুদ্ধতা ও শুচিতার সঙ্গে রক্ষা করা হ'ত। জলঘরে যখন তখন যে কোন লোকের যে কোন পোষাকে প্রবেশাধিকার ছিলনা।

কলকাতায় কলের জল আসে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে, হাওড়ায় এর ২৬ বছর পর;

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের কথা। পলতায় প্রায় বিপরীত দিকে শ্রীরামপুরে [হুগলী জেলায়] হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি বার্ণ কোম্পানীকে একটি শোধনাগার সহ একটি জলাধার তৈরী করার ভার দেন। এতদুরে শোধনাগার করার কারণ একটাই। এখানকার জল লোনা নয়। কলকাতায় জল সরবরাহের সময় গঙ্গানদীর জল নিয়ে যে পরীক্ষা হয় তাতে দেখা যায় একমাত্র মহাবিষুব সংক্রান্তির [২২শে মার্চ যেদিন সূর্য নিরক্ষরেখায় প্রবেশ করে] দিনই মোহনা থেকে ১০৫ মাইল দূরে পুরানো ফোর্ট উইলিয়ামের ১৮ মাইল উজানে অবস্থিত পলতার জল অত্যাধিক জোয়ারের জন্য লবণাক্ত হয়। তাই পলতায় বসেছে কলকাতায় পানীয় জল শোধনাগার এবং তার বিপরীত তীরে হাওড়ার। ১৮৯৬-এর জানুয়ারীর প্রথমে কাজ শেষ হ'লে ঐবছরের

১০ই জানুয়ারী বাংলার ছোটলাট আলেকজাণ্ডার মেকেঞ্জী সাহেব হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির জল সরবরাহ ব্যবস্থার উদ্বোধন করেন। ঐদিন হাওড়া শহরে জল সরবরাহের উদ্দেশ্যে জলের ট্যাঙ্কে থিতাইবার জন্য গঙ্গা থেকে প্রথম জল পাম্প করে তোলা হয় এবং ২৫/১/১৮৯৬ তারিখে সেই জল হাওড়া শহরে সরবরাহ করা শুরু হয়। এই ব্যবস্থা আজও অপরিবর্ত্তিত আছে। বল্লভপুরের গঙ্গায় চড়া পড়ায় কোন কোন সময় পরিশোধনাগারের জন্য জল পেতে অসুবিধা হ'লে জোয়ারের জন্য অপেক্ষা করতে হয়।

শ্রীরামপুর টেক্সটাইল কলেজের বিপরীতে দে স্ট্রীটে ৮২ বিঘা জমির উপর হাওড়া মিউনিসিপ্যাল ওয়াটার ওয়ার্কস-এর মধ্যে আছে জল থিতান'র জন্য ৮টি পুকুর এবং পরিশোধনের জন্য ১১টি ফিল্টারবেড। দৈনিক ১২৬ লক্ষ গ্যালন জল হাওড়া শহরের পঞ্চাননতলা রোড, সালিখা, কৈপুকুর, এবং শিবপুর জলের ট্যাঙ্ক [কাউইসঘাট রোড ও জি, টি, রোডের সংযোগ স্থলে] মারফৎ সরববাহ করা হয়। নিয়মিত কর্মী সংখ্যা প্রায় একশ। এছাড়া সাময়িকভাবে মাটি কাটার জন্য কিছু কর্মী নিযুক্ত হন।

ওয়াটার ওয়ার্কস-এর মধ্যে আছে "অলডেন হাউস" নামে একটি বাড়ী। বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বাংলায় এসে ডেনিসরা শ্রীরামপুরে যখন ঘাটী করে, বাড়ীটি সেই সময়ের। মিঃ উইলসন নামে কলিকাতা হাইকোর্টের এক বিচার পতি বহুবছর এই বাড়ীতে বাস করেছেন। বর্তমানে বাড়ীটির ভগ্নাবস্থা, প্রায় অব্যবহার্য।

কলকাতা নিবাসী রাজেন মল্লিক মহাশয় নির্মিত গঙ্গা তীরবর্তী বল্লভপুরের প্রথম মন্দিরটি ওয়াটার ওয়ার্কস-এর সীমানা বহির্ভূত হ'লেও শহর থেকে স্থল পথে মন্দিরে যেতে হ'লে ওয়াটার ওয়ার্কস-এর মধ্য দিয়ে না গিয়ে উপায় নাই। মন্দিরে কোন বিগ্রহ নাই। কেবলমাত্র ফাল্গুনমাসে একদিন ধুমধাম সহ মন্দিরে পূজা হয়। সেদিন ওয়াটার ওয়ার্কস-এর ভিতর দিয়ে মন্দিরে সকলের অবাধ

প্রবেশাধিকার। মন্দির গাত্রে প্রোথিত একটি প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ আছে যে ১৮০৬ খ্রীঃ-এ এটি ছিল মিঃ হেনরীমার্টিন-এর অধিকারভূক্ত। অনেকে তাই এটিকে হেনরীমার্টিনের প্যাগোডা নামে অভিহিত করেন।

জল সরবরাহ ব্যবস্থা চালু হওয়ার সময় হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির পৌর প্রধান ছিলেন মিঃ সি, এ, গ্রীয়ারসন এবং উপ-পৌর প্রধান রায় নরসিংহ দত্ত বাহাদুর।

হাওড়ায় বাড়ী বাড়ী জল সরবরাহের ব্যবস্থা হল দেখে এক রসিক ব্যক্তি ছড়া বাঁধেন—

পুকুর ডোবার জল এবার হ'ল অচল,
বাড়ী বাড়ী সব বসেছে জলের কল।
নথ নাকে গাড়ু হাতে যত নারীর দল,
সারি দিয়ে পুকুর ঘাটে আনবে না আর জল।
কলসী কাঁখে, পথের বাঁকে বাজিয়ে পায়ের মল,
তারা আর যাবে না আনতে তেষ্টার জল।
আর কবে না কেউ "সই জলকে যাই চল,"
এখন থেকে জল দেবে ঐ সাহেবদের কল।
কালে কালে কলিকালে এসব হল কি?
এরপর দেখা যাবে আরো কত ভেলকি।

সত্যই ভেলকি। ১৮৯৯-এর ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ মাসে শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে বাংলার স্যানিটারী ইঞ্জিনীয়ার মিঃ এ, ঈ, সিল্ক প্রদত্ত বক্তৃতা ছয়টির দিকে কান দিলে শুনতে পাওয়া যাবে, মিঃ সিল্ক বলছেন—জল সরবরাহ ব্যবস্থা দুই প্রকারের—এক—কলকাতায় যেখানে সঁকাল ও বিকালে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জলসরবরাহ করা হয়। দুই—হাওড়ার মত যেখানে দিন বা রাত্রির যে কোন সময়ে আমরা পরিশ্রুত জলের সরবরাহ পাই।

জল সরবরাহে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির এই শ্রেষ্ঠত্ব খুব

বেশিদিন বজায় থাকেনি। অবস্থা এমন পর্য্যায়ে পৌঁছেছিল যে ব্যাপকহারে সর্বত্র নলকূপ বসাবার আগে শহরটি প্রতিদিন জলাতঙ্কে অর্থাৎ জল না পাবার আতঙ্কে ভুগত।

হাওড়ার পানীয় জল সরবরাহকে নতুন জীবনদানের জন্য সি. এম. ডি—এ যে প্রকল্পটি হাতে নিয়েছেন তদনুযায়ী বোটানিকেল গার্ডেনের মধ্যে একটি পাম্প হাউস তৈরীর কাজ শুরু হয়েছে। ১৯৭৪-এ পদ্মপুকুরে দৈনিক ৪০০ লক্ষ গ্যালন জল সরবরাহক্ষম একটি জলাধার নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। পরিকল্পনামত ১৯৮২তে এটি চালু হ'লে বালী ও হাওড়া শহরের জলের চাহিদা মিটবে বলে মনে হয়।

মিউনিসিপ্যাল ও মিউনিসিপ্যাল এলাকা বহির্ভূত সি. এম. ডি এ'র নলকূপ ভিত্তিক জরুরী জল প্রকল্পগুলির মধ্যে আন্দুল, মৌড়ী, সাঁকরাইল, ঝোড়হাট, বানুপুর, জগাছা, সাঁতরাগাছি, উলুবেড়িয়া, বালী, দেউলপাড়া, উনসানি, বাঁকড়া, কোনা এবং বালটিকুরী-শানপুর-এর কাজ শেষ হয়েছে এবং চেঙ্গাইল, কোনা, মানিকপুর, সারেঙ্গা, নিবরা পাঁচলা, বাউরিয়া, ফোর্ট গ্লাসষ্টার অঞ্চলের কাজ দ্রুত সমাপ্তির পথে।

বহু জায়গায় নলকূপের সাথে জলের যোগান দেয় পাতকুয়া। ব্যক্তিগত মালিকাধীন-পাতকুয়ার সংখ্যা হাওড়া শহরে যথেষ্ট।

এইভাবে প্রাণীদের জলের সমস্যা মিটলেও প্রকৃতির জলের সমস্যা মিটবেনা যতদিন না গঙ্গার জলে নুনের ভাগ কমান যায়। ২৯.৪.১৯৭৫ তারিখের আনন্দবাজারে পলতার নিকট হুগলী নদীর জলে নুনের পরিমাণ সম্পর্কে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে দেখা যায় নদীর জলে নুনের পরিমাণ থাকে—গ্রীষ্মে—০.২৫০০%, বর্ষায়—০.১৫০% থেকে ৫০০% এবং শীতে—০.০০১০%।

এই নুনগোলা জল মাটিতে মিশে গাছের মুল শিকড়ের ক্ষতি করে। ফলে অল্প ঝড়েই অনেক বড় বড় গাছ পড়ে যায়। হাওড়ার যে অংশ

গঙ্গার ধারে এবং যে সব খাল দিয়ে গঙ্গার জল ঢোকে সেই এলাকায় গাছগুলি এর মধ্যেই এই কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একদা বোটানিকেল গার্ডেনের তদানীন্তন সুপারিন্টেনডেন্ট মিঃ জর্জ, কিং একটি পাম্প বসিয়ে গঙ্গার জল তুলে বাগানের খালগুলিতে জল ভরবার ব্যবস্থা করেছিলেন। বাগানের কয়েকটি খালের সংগে গঙ্গার সরাসরি যোগ আছে। লকগেট খুলে দিলেই খালগুলি জলে ভরে যায়। খালগুলি কাটা হয়েছিল শ'খানেক বছর আগে। ফলে সেগুলির তলা এখন অনেক ভরাট হয়ে এসেছে। নিশ্চয়ই এতদিন গঙ্গার জল ব্যবহার করায় সেই মাটিতে নুনের পরিমাণ বেড়েছে। এর উপর প্রতিবছর গঙ্গার লোনাজল ব্যবহারে মনে হয় গাছের গোড়ার ক্ষতি হওয়াতেই প্রতি বছর ঝড়ে এত গাছ পড়ে।

একই ইতিহাস গঙ্গার জল যে সমস্ত খালে ঢোকে সেখানের গাছ-গাছালির। অতএব হাওড়ার বৃক্ষ সম্পদ রক্ষার জন্যও ফরাক্কা দিয়ে জলপ্রবাহ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

চিকিৎসা

বাংলা দেশে যে সময় কবিরাজী ছিল বৈদ্যবংশীয়দের বংশানুক্রমিক বৃত্তি সে সময় বেতড়ে বহুসংখ্যক বৈদ্যের বাস ছিল। এদের মধ্যে চৈতন্যদেবের সম-সাময়িক গরুড় ধ্বজ সেন-এর উল্লেখ পাওয়া যায় ভরত মল্লিকের চন্দ্রপ্রভা গ্রন্থে—নরহরিদাস তনুজাশ্চতার এতে কুলোজ্জলা জাতাঃ বৈতড় বংশ সমুদ্ভব গরুড় ধ্বজ সেন কনকা কুক্ষৌ। ইত্যাদি

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে থার্সা গ্রামে [থানা—জগৎবল্লভপুর] কবিরাজ কৈমলকণ্ঠাভরণ নাড়ী দেখে রোগনির্ণয়ে সক্ষম ছিলেন। হাণ্টার সাহেব লিখেগেছেন—তিনি আয়ুর্বেদীয় ঔষধ প্রয়োগে কার্বঙ্কল, ফোঁড়া, টাইফয়েড, নিউমোনিয়া, যক্ষা, টিটেনাস ও স্ত্রীব্যাধি সারাতে সক্ষম ছিলেন। এই থানার বাঁকুল গ্রামটিও

এক সময় আয়ুর্বেদ চর্চার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে শালকের হরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী এবং কদমতলার ভোলানাথ অধিকারী কবিরাজী চিকিৎসায় যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। বর্তমানে ধার্সা'র শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ঠাকুর শাস্ত্রী আয়ুবেদাচার্য্য কয়েকটি গ্রন্থেরও রচয়িতা। শিবপুরে সুনামের সাথে চিকিৎসা করতেন কবিরাজ তুলসীচরণ গুপ্ত ও নীলমণি সেন। জেলিয়াপাড়া লেনে আছে একটি আয়ুর্বেদিক ডিসপেনসারী এবং সালকিয়ায় রাধাকৃষ্ণ আয়ুবেদিক চ্যারিটেবল ডিসপেনসারী।

আয়ুর্বেদ চিকিৎসার আমল থেকেই জেলার কোথাও কোথাও ইউনানী প্রথায় চিকিৎসা-ব্যবস্থা চালু আছে।

দেশের অন্যান্য অংশের মত একসময় হাওড়তেও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার গৌরবময় আসনটি এ্যালোপ্যাথীর অধিকারে আসে। ক্রমশঃ সুচিকিৎসার জন্য প্রতিষ্ঠিত হ'ল হাসপাতাল। আপজনের ম্যাপে যে হাঁসপাতালটি দেখান আছে ১৯২৮-এ সেটি হাওড়া ঘাটে একটি দোতলা বাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়ে ১৮৫২ পর্যন্ত সেখানে ছিল। পরে রেললাইন স্থাপনের প্রয়োজনে সেটি চাঁদমারী ব্রীজের নিকট পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে হাঁসপাতালটি ছিল পীড়িত নাবিকদের চিকিৎসাকেন্দ্র, পরে রেলকর্মীরাও এখানে চিকিৎসিত হতে থাকেন।

১৭৬৭-তে সুমাত্রা পয়েন্টে [বর্তমান শালিমার] একটি হাঁসপাতাল স্থাপনের চেষ্টা অর্থাভাবে পরিত্যক্ত হয়। অবশেষে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে যখন ডঃ পামার ছিলেন হাওড়ার সিভিল সার্জেন তখন মুখ্যতঃ তাঁর উদ্যোগেই কলকাতার বাইরে রাজ্যের সবচেয়ে বড় হাঁসপাতাল—হাওড়া জেনারেল হস্‌পিটাল প্রতিষ্ঠার কাজ ত্বরান্বিত হয়। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে হাঁসপাতালটি স্থাপনের পর ডাঃ পামারের প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দিয়ে একটি ওয়ার্ডের নামকরণ হয় পামারওয়ার্ড। ইংরাজ আমলে ইউরোপীয়ানদের জন্য

একটি স্বতন্ত্র ওয়ার্ড ছিল। ১৯৩৭-এ একদা গীর্জা হিসাবে ব্যবহৃত হাওড়া হাসপাতালের সম্মুখের বাড়ীটি পঞ্চম জর্জের সাম্রাজ্য প্রাপ্তির সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে হাসপাতালকে দান করা হলে বাবু রাধাকিষেণ বাগলার অর্থানুকূল্যে সংস্কৃত হয়ে এটি মেটারনিটি ওয়ার্ডে পরিণত হয়। এরপরও হাওড়া জেনারেল হাসপাতালের বহু উন্নতি হয়েছে।

বর্তমান শতব্দীর সাতের দশকের শেষে হাওড়া জেলায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ১১ এবং অনুদান প্রাপ্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা ৩০। শ্রমিক-কর্মচারী রাজ্য-বীমা প্রকল্পের অধীন হাসপাতালের সংখ্যা তিনটি। বলা বাহুল্য কল্যাণকর রাষ্ট্রে সংখ্যাগুলি ক্রমবর্ধমান।

জেলায় সংক্রামক ব্যাধির প্রথম হাঁসপাতালটি ১৮৯৬খ্রীঃ-এ প্লেগ মহামারীর সময় প্লেগ হাঁসপাতল রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। বহুদিন হাঁসপাতাল বলতে বোঝাত কাঁচা মেঝে এবং গোলপাতার ছাউনি দেওয়া কয়েকটি ঘর। ১৯২৯-৩০খ্রীঃ থেকে এটির সংস্কার শুরু হয়। বর্তমানে হাওড়ায় সংক্রামক ব্যাধির একমাত্র হাসপাতাল সত্যবালাদেবী সংক্রামক হাঁসপাতালের অবস্থান জি. টি. রোড-এর উপর মালী পাঁচঘড়া এলাকায়। কলকাতার শ্যামবাজার নিবাসী সত্যবালা দেবী ১৯৪১ খ্রীঃ-এ হাসপাতালটির প্রতিষ্ঠার জন্য হাওড়া পৌরসভাকে ১ লক্ষ টাকা দান করেন। হাওড়া পৌরসভা ১৯৪৬ খ্রীঃ থেকে হাসপাতালটি পরিচালনা করে আসছিলেন; সম্প্রতি এটি রাজ্য সরকারের পরিচালনাধীন।

হাওড়ায় কুষ্ঠরোগীদের জন্য প্রথম বেসরকারী হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠিত হয় ২৬,১,১৯৫৬ তারিখে, নাম ডাঃ বিনয় ভূষন লহরীর স্বর্গীতা মাতার নামে বাসু মেমোরিয়াল লেপ্রসি ক্লিনিক, মালীপাঁচ-ঘড়ায় অবস্থিত এই হাসপাতালটির অবৈতনিক সম্পাদক হিসাবে কর্মরত আছেন ডাঃ দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন-এর হাওড়া জেলা শাখাগুলি জনস্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে আদর্শ গ্রাম প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করার কাজে সচেষ্ট আছেন। বাগনান, শ্যামপুর ও ডোমজুড় শাখাগুলি একাজে যথেষ্ট সক্রিয়। খাদিনান (১৯৭৬) চন্দ্রভাগ (১৯৭৪) ও নারনা (১৯৭৫) গ্রামে আদর্শ গ্রাম প্রকল্প অনুযায়ী কাজ শুরু হয়ে গেছে।

১৯২৪-২৫-এ মেসার্স সাধুরাম তুলারাম হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটিকে একটি এ্যামবুলেন্স উপহার দেন। ১৯২৯-৩০ খ্রীঃ-এ হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির এ্যামবুলেন্স দু'টির একটিকে টানত ঘোড়ায় অপরটিকে চালানো হ'ত মোটর-এর সাহায্যে। এমন আর হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির ঘোড়ায় টানা এ্যামলেবুন্স নাই।

কয়েকটি হাসপাতালের নাম ও প্রতিষ্ঠা বৎসর হ'ল—

১) ঘুসুড়ীর সুরজমল নাগরমল হাঁসপাতাল [১৯৫৯-এর জুলাই থেকে নতুন নাম হনুমান হাসপাতাল]

২) তুলসীরাম লক্ষ্মীদেবী জয়সোয়াল হাসপাতাল - ১৯৪৯ [C. M. D. A. এখানে কয়েকটি অতিরিক্ত শয্যার ব্যবস্থা করেছেন]

৩) কেদারনাথ আরোগ্য ভবন, বালী ১৮৮৬তে ডাঃ কেদারনাথ চ্যাটার্জী প্রদত্ত জমিতে স্থাপিত বীমস্ চ্যারিটেবল ডিস্‌পেনসারির নাম কেদারনাথ আরোগ্য ভবন হয় ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে।

৪) লিলুয়া মেটারনিটি হোম।

৫) যক্ষা হাঁসপাতাল—বোটানিকেল গার্ডেনের কাছে আন্দুল রোডে অবস্থিত।

হাওড়া ময়দানের কাছে আছে লায়ন্স ক্লাব প্রতিষ্ঠিত একটি হাসপাতাল।

হাওড়া জিলা পরিষদ পরিচালিত দাতব্য চিকিৎসালয়গুলি হ'ল—মাকড়দহ কিশোরীমোহন দাতব্য চিকিৎসালয়, মাহিয়ারী কে. পি. রায় দাতব্য চিকিৎসালয়, রাজগঞ্জ চুড়ামণি পাল দাতব্য চিকিৎসালয়।

গড়বেলিয়া চন্দ্রকান্ত দাতব্য চিকিৎসালয়, আমতা দাতব্য চিকিৎসালয়, সিংটি থানা দাতব্য চিকিৎসালয়, শ্যামপুর দাতব্য চিকিৎসালয় এবং বড়দা জ্ঞানদাময়ী দাতব্য চিকিৎসালয়। [উদয়নারায়ণপুর]

বেলুড়ের লিলুয়া চ্যারিটেবল ডিস্‌পেনসারীর প্রতিষ্ঠা হয় দীননাথ ঘোষের প্রচেষ্টায়। জেলার একমাত্র শিশু হাসপাতাল —দীননাথ শিশুসদন ২১ জয়দেবকুণ্ডু লেন, হাওড়া-১। হাঁসপাতালটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৬-এর ২৩শে জানুয়ারী শ্রীমতী অমিয়া সরকারের অর্থানুকুলে।

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে রবার্ট নিকোলাস এখন যেখানে হাওড়া ষ্টেশন সেই এলাকার কোন এক জায়গায় হাওড়া মেডিকেল হ'ল স্থাপন করে এই জেলায় প্রথম প্রাইভেট এ্যালোপ্যাথিক প্র্যাকটিশ শুরু করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় M. D. ডাঃ হেমচন্দ্র সেনের জন্ম শিবপুর সানা পাড়ায়। পরবর্তী কালে জেলায় বহু যশস্বী চিকিৎসক আবির্ভাব ঘটেছে যাদের সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া নানা কারণে সম্ভব নয়। মাত্র কয়েকজনের চিকিৎসকের নাম উল্লেখ করছি—সত্যবান রায়, মণি দে, যোগেশ্বর চক্রবর্তী, শরৎ দত্ত, তারিণী রায়, সুরেশ দাস, পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, সত্যরঞ্জন দে, দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় শীতলচন্দ্র ঘোষ, বেনীচরণ দত্ত, তড়িৎ ঘোষ [নিউরোলজিষ্ট] সত্যব্রত সেন, সত্যেন্দ্র নাথ কুণ্ডু (রেডিওলজিষ্ট), বিভুতি ভুষণ দাস এবং তরুণ চন্দন রায় চৌধুরী।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর হাওড়ার পাইকপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন বাংলাদেশে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার অন্যতম প্রবর্তক ডাঃ মহেন্দ্র লাল সরকার। পরবর্তীকালে শিবপুরের ডাঃ দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায়, মধ্য হাওড়ার ডাঃ গঙ্গাধর মুখার্জী, ডাঃ পুলিন ব্যানার্জী [হাওড়া হ্যানিম্যান হল] রতিকান্ত মুখার্জী (আন্দুল), কেদারনাথ সরকার প্রভৃতি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় কৃতিত্ব

দেখান। ডাঃ ভোলানাথ চক্রবর্তী হলেন পঃ বঃ সরকারের প্রথম হোমিওপ্যাথিক উপদেষ্টা।

১৯২৫ খ্রীঃ-এ স্থাপিত হরিসিং মেডিকেল কলেজের [হোমিওপ্যাথিক] প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি-গঙ্গাধর মুখার্জী, সম্পাদক-খুরুটের ডাঃ নগেন হাইত। কলেজের ছাত্রদের ক্লিনিক্যাল ট্রেনিং হ'ত হাওড়া জেনারেল হাসপাতালে হাওড়ার তৎকালীন C. M. O. ডাঃ গোয়েল-এর তত্ত্বাবধানে। কলেজের ক্লাস প্রথমে হত মল্লিক ফটকের নিকট নগেন হাইতের চেম্বারে, পরে ঈশ্বর দত্ত লেনের একটি পাঠশালায় সবশেষে খুরুট রোডে। ১৯৩২ খ্রীঃ-এ ছাত্রদের সহিত সম্পাদকের বিরোধে এটির বিলুপ্তি ঘটে। শিক্ষক মণ্ডলীতে ছিলেন-গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায় [মেটিরিয়া মেডিকা], ডাঃ পুলিন বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় [অর্গানন] ডাঃ নৃপেন সিংহ [এনাটমী] ডাঃ নগেন হাইত [মেডিসিন] ডাঃ সুধীর ঘোষ [স্ত্রীরোগ] গোপলিদাস প্রভৃতি ডিসেকসান ক্লাশ হ'ত বেলগাছিয়া ভাগাড়ে। আরও আগে রামকৃষ্ণপুরের নিকট জি, টি রোডের উপর জর্জ হোমিওপ্যাথিক কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ডাঃ সুধীর পাঠক। কলেজের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন হাওড়া বার্তা সম্পাদক ডাঃ শম্ভুচরণ পাল। বাঁশতলা শশ্মান ঘাটে কলেজের একটি লাশ কাটা ঘর ছিল। রামরাজাতলায় স্থাপিত শঙ্করমঠ হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালটি হাওড়া ময়দানের কাছে উঠে আসার পর নূতন নামকরণ হয় মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে ৪টি হোমিওপ্যাথিক কলেজকে অনুমোদন দিয়েছেন এটি তার মধ্যে একটি। কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ ও সচিব ডাঃ রামকৃষ্ণ ঘোষ মণ্ডল।

১৯৬১-তে জেলার ৩৭৩ জন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের মধ্যে পাঁচজন ছিলেন মহিলা। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি ১৯৬৩তে দশজন হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল অফিসার নিয়োগ এবং ৩টি

দাতব্য হোমিও চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। নিজবালিকা গ্রামে আছে প্রিয়নাথ হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়।

১৯৫৫-তে হাওড়ার ডাঃ নিতাইচরণ চক্রবর্ত্তী যে হোমিও মেডিকেল ক্লাবটি স্থাপন করেন ১৯৭৫-এ সেটি হোমিও মেডিকেল এ্যাসোসিয়েশন অফ্ ইণ্ডিয়ার সহিত যুক্ত হয়। প্রতিটি পঞ্চায়েতের সহিত একটি করে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় স্থাপন প্রকল্প অনুযায়ী রাজ্য সরকার ১৯৭৭-এ দেউলটির শরৎ পল্লীতে পঃ বঙ্গের প্রথম চিকিৎসালয়টি স্থাপন করেন।

ইন্দোপ্যাথী

১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়ার প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় থেরাপিউটিক্যাল বায়োকেমিষ্ট্রী ও ভারতীয় ভেষজ বিদ্যায় সংমিশ্রণে এক নতুন চিকিৎসা পদ্ধতির প্রচলন হাওড়া শহরে করেন। ৬. ১. ১৯৭৪ তারিখে এই বিদ্যা শিক্ষা দানের জন্য মল্লিক ফটকের নিকট হাওড়া হাট হাই মাদ্রাসা স্কুলে ইনষ্টীটিউট অফ বায়োকেমিষ্ট্রি এণ্ড ইণ্ডিয়ান ড্রাগস নামে একটি কলেজ তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম বছর কলেজের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৩৭৪জন পরবর্ত্তী কালে কলেজের নাম হয় Indian Drug Medical College. কলেজের শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে কয়েকজন হ'লেন ডাঃ রামেন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ গুরুপদ দাস, ডাঃ দুর্গাদাস দত্ত, ডাঃ নুরুল হুদা প্রভৃতি। এই পদ্ধতির চিকিৎসায় বহু দুরারোগ্য ব্যাধির আরোগ্য হইয়াছে। বর্ত্তমান এই কলেজের অবস্থান বকুলতলায়।

নেচারপ্যাথী কলেজ

থানামাকুয়ার অন্তর্গত বকুলতলার এই সান্ধ্য কলেজটিরও প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ প্রসাদ বন্দোপাধ্যায়। নাম মেডিকেল ট্রেনিং কলেজ অফ নেচারপ্যাথী।

পশু চিকিৎসার জন্য শালকিয়ায় আছে রামেশ্বর মালিয়া পশু চিকিৎসালয়। ১৯৭৫-৭৬-এ উলুবেড়িয়াতেও একটি পশু চিকিৎসা হাসপাতাল হয়েছে।

সি. এম, ডি, এ প্রতিষ্ঠিত দু'টি পলিক্লিনিক হ'ল (১) ইন্দুপ্রভা-রায়ের বাড়ী (আন্দুল মোড়) এবং (২) ১৪, দেবেন্দ্র গাঙ্গুলী রোড, শিবপুর।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে একটি অনন্য সাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর

যে সব মহিলার রক্ত এইচ. ও. (ডি), নেগেটিভ গ্রুপের তাহাদের পক্ষে সন্তান প্রসব অসম্ভব এইটিই চিকিৎসকদের অভিমত। সালকিয়ার রামকুমার উপাধ্যায়ের স্ত্রী সচ্চি দেবীর তাই চারবার গর্ভেই সন্তান বিনষ্ট হয়। ইণ্ডিয়ান ড্রাগস্ মেডিকেল কলেজের এবং নেচারপ্যাথি কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সচ্চি দেবীর চিকিৎসা ভার গ্রহণ করার পর ১৯৮০ খ্রীঃ-এর ৩০শে জানুয়ারী একটি নার্সিং হোমে তিনি সুস্থ সন্তানের জন্মদানে সমর্থ হ'ন।

ভারতীয় ভেষজ ও বায়োকেমিক ঔষধ প্রয়োগে ডাঃ প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই অভূতপূর্ব সাফল্য নিঃসন্দেহে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এক নূতন যুগের সূচনা করেছে।

চতুর্থ অধ্যায়

আঞ্চলিক কথা

অমরাগুড়ি—উলুবেড়িয়া মহকুমার আমতা থানার একটি গ্রাম। ভূতপূর্ব জমিদার রায় পরিবারের আদি নিবাস ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার সমরাজপুরে। মুর্শিদকুলীখাঁর তাড়নায় দেশ ত্যাগী হ'য়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই গ্রামে এসে পরিবারটি কয়লা ও ইটের ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। এই বংশের ফকির দাস রায় [জঃ অক্টোবর ১৮৫৩] ছাত্রাবস্থায় কেশবচন্দ্র সেনের প্রভাবে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁর চেষ্টায় অমরাগুড়ি নববিধান ব্রাহ্মধর্মের একটি শক্তিশালী কেন্দ্রে পরিণত হয়। তিনি একটি ব্রাহ্মমন্দির নির্মাণ করান। কেশবচন্দ্র অনেকবার এই গ্রামে এসেছিলেন।

আগুনসা—চৈত্রমাসে বসন্তরোগ যাতে গ্রামে প্রবেশের পথ না পায় সেজন্য গ্রামবাসীরা আগুনের ভাঁড় বা মশাল নিয়ে গ্রামের চারিদিক ঘুরে আগুনের গণ্ডি দিতেন। আগুনসীমা থেকেই গ্রামের নাম আগুনসাঁ। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রথম বাঙালী বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের পৈত্রিক বাসস্থান।

আয়মা—শ্যামপুর থানার একটি কৃষিপ্রধান পল্লী। আয়মা শব্দের অর্থ নিষ্কর।

আদমপুর—থানা জগৎবল্লভপুর। একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে। রেনেলের মানচিত্রে [প্লেট-৭] ইহার অবস্থান দেখান আছে।

আন্দুল—হাওড়া শহরের ৪ মাইল পশ্চিমে সরস্বতী নদীর

পশ্চিমে অবস্থিত। দঃ পূঃ রেল পথের একটি ষ্টেশন। হাওড়া ষ্টেশন থেকে বাসেও যাওয়া যায়।

গ্রামটিকে কবিরাম তাঁর দিগ্বিজয় প্রকাশ গ্রন্থে চান্দুল এবং পারিন্দ নামে অভিহিত করেছেন। মুসলমান আমলে গ্রামটি মজঃফরপুর ও বোরোপরগণার অন্তর্গত ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শুরুতে এলাকাটি ২৪ পরগণার অঙ্গীভূত হয়। পরে হুগলী সবশেষে হাওড়া জেলায় আসে। পুরীর চান্দুল মঠ আন্দুলের কৃষ্ণানন্দ দত্তের কীর্ত্তি। এখানকার রাজবাড়ীটি অন্যতম দ্রষ্টব্য। রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রামলোচন রায় ছিলেন ক্লাইভের দেওয়ান। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে রাজা খেতাব পান। দৌহিত্র বংশীয়েরা বর্তমানে এই পরিবারের উত্তরাধিকারী।

আদরা—আদরা'র অর্থ নক্সা। একসময় এই গ্রামে বহু প্ল্যান বা নক্সা তৈরীতে দক্ষ ব্যক্তির বাস ছিল।

আমতা—হাওড়া শহর থেকে ২৬ মাইল [৪১৮৬ কি মি] দূরে এবং উলুবেড়িয়া মহকুমার উত্তর-পূর্বে দামোদরের তীরে আমতা'র অবস্থান। অতীতে বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র এবং দামোদরের পথে মেদিনীপুর থেকে নুন ও রানীগঞ্জের কয়লা রপ্তানীর প্রধান কেন্দ্র হিসাবে এই জায়গা বিখ্যাত ছিল। পুরাকালের সেই সৌরভটুকু এখনও পাওয়া যায় বন্দর নামে অভিহিত এলাকাটির নামকরণের মধ্যে।

কলকাতার হাটখোলার দত্তদের এখানে নুনের গোলা ছিল। মালাই বা মেলাই চণ্ডীর মন্দিরটি এই বংশের কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত এবং শিবের মন্দিরটি মদনমোহন দত্ত নির্মিত। প্রবাদ এখানে সতীর পায়ের মালাইচাকি পড়েছিল। সম্প্রতি শ্রীত্রিপুর বসু মালাইচণ্ডীর মাহাত্ম্য মুলক পাঁচালী "মেলাইচণ্ডিকা কথা" নামের প্রাচীন তুলট কাগজের একটি পুঁথি মেদিনীপুর জেলার পূর্ব্ব প্রান্তে অবস্থিত রূপনারায়ণ নদ তীরবর্তী ক্ষেপুত গ্রাম থেকে সংগ্রহ

করেছেন। পুঁথির লেখক শ্রীরামচরণ দত্ত। লিপিকাল সন ১২৬২ সাল।

কৌশিকী পত্রিকার ১১শ-১২শ সংখ্যা ১৯৭৮-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ অনুসারে পুঁথিটির বন্দনা'র পরের কয়েকটি পংক্তি হ'ল—

বন্দিলাম গণপতি মুসক বাহনে।
একে ২ বন্দিলাম জত দেবগণে॥
বাল্মীক মার্কণ্ড আদি জত মুনিগণে।
অবনি লোটায় বন্দ সভার চরণে॥
অপরূপ দসভূজা সিংহ বাহিনি।
মেলাই চণ্ডিকা নামে প্রচারে অবণি॥
তাহার চরণ বন্দ হয়্যা একমন।
সবাঞ্ছিত ফল লাভ করিলে শ্রবণ॥

উলুবেড়িয়া—অতীতে অঞ্চলটি উলুখাগড়ার বন দিয়ে ঘেরা ছিল বলেই গ্রামের নামকরণ হয়েছিল উলুবেড়িয়া। অবস্থান—হাওড়া শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে জলপথে ১৯ মাইল এবং স্থল পথে ২০ মাইলদূরে, ২২.২৪ উঃ অক্ষাংশে এবং, ৮৮.০৭ পূঃ দ্রাঘিমাংশে

বাস, রেল ও নৌকা যোগে যাওয়া যায়। মেদিনীপুর খাল ও উড়িষ্যাট্রাঙ্ক রোডের শুরু এখান থেকে। গঙ্গারতীরে আছে সুন্দর একটি কালীবাড়ী। এখানকার ইলিশ মাছ ও পানতুয়া একসময় বিখ্যাত ছিল।

ওয়াদীপুর—ডোমজুর থানার ৪১৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত এই গ্রামের প্রধান অর্থকরী ফসল পান। পাত্র বংশীয়দের প্রতিষ্ঠিত মনসামন্দিরে কার্বঙ্কল সহ সমস্ত প্রকার চর্ম রোগের ওষুধ দেওয়া হয়। চৈত্রমাসে আড়াই শ বছরের পুরাণো গাজনের মেলা বসে। বর্ষাকালে ডোমজুর থেকে নৌকায় যাওয়া যায়।

ওলনপাড়া—একদা ওলন কাজের জন্য বিখ্যাত ব্যক্তিদের বাস

ছিল এখানে। অর্থাৎ পাকাবাড়ী তৈরীর রাজমিস্ত্রী এখানে অনেক পাওয়া যেত।

কলিকাতা—আমতা থানার অন্তর্গত রসপুরের নিকট দামোদর নদ তীরবর্তী একটি গ্রাম। রাজধানী কলিকাতার চেয়ে ধনে জনে মানে খাটো বলে ছোট কলিকাতা [বা রসপুর-কলিকাতা] নামে পরিচিত। কলি [চুণ] এবং কাতা [গুদাম] যুক্ত হয়ে কলিকাতা নামের উৎপত্তি এরকম মতপ্রকাশ করেছেন ভাষাচার্য সুনীতি কুমার প্রমুখ অনেকে। আগে এখানে শামুক পুড়িয়ে চূণ তৈরী হত। নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ আছে।

কোলড়া—পূর্বে গ্রামের পশ্চিম প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত ছিল গৌরী নদী। নদীকুলে বহুৎ কলুর আড়ত বা আড়া থাকায় গ্রামের নাম কোলড়া হয়েছে বলে অনুমান করা হয়।

কুমারপুর-রণমহল—পাতিহাল থেকে এখানে যাওয়া যায়। কুমারপুর মৌজাভুক্ত পাশাপাশি দু'টি গ্রাম। রণমহল গ্রামের উত্তর সীমায় কৌষিকী নদীর অস্তিত্ব বিদ্যমান। কথিত আছে রণমহলের পূর্বনাম ছিল রানীমহল। তখন এখানে গৌড়েশ্বরের রানীরা বাস করতেন। কুমার বা রাজপুত্রগণ থাকতেন কুমারপুর গ্রামে।

কল্যাণপুর—থানা-বাগনান, রেলষ্টেশন-দেউলটি। গ্রামের আদি বাসিন্দারা হলেন বাগ্দী, রাজবংশী, তিওর, নমশূদ্র, কেওরা, কৈবর্ত ও মাহিষ্য এবং রায় পরিবার।

বর্তমান রায়বংশীয়দের উর্দ্ধতন ত্রয়োদশ পুরুষ নৃসিংহ রাম রায় বর্ধমান রাজ কীর্তিচন্দ্রের দানপত্র প্রাপ্তিসূত্রে এখানে বসবাস শুরু করেন। তখন গ্রামটি ছিল মণ্ডলঘাট পরগণার অধীন। শারদীয়া উৎসবের সময় মঙ্গলচণ্ডীর বিশেষ পূজা হয়। ধর্মরাজের পূজারী পণ্ডিত উপাধিকারী ডোম। পারস্য হ'তে আগত মুসলমান সাধক বড়ো সাহেবের আস্তানা এবং কালীঞা শিবের মন্দির

আছে। চৈত্র সংক্রান্তিতে হয় শিবের গাজন। জয়দেব নাটক রচয়িতা হরিপদ চট্টোপাধ্যায়-এর জন্ম এই গ্রামে।

কাসুন্দিয়া—বাদশাহ ফারুকশিয়ারের ফরমান অনুযায়ী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে লীজ দেওয়া পাঁচটি গ্রামের মধ্যে একটি। বোরো ও পাইকান পরগণায় বিভক্ত গ্রামটির বার্ষিক খাজনা ধার্য্য করা হয়েছিল ১২৯ টাকা ১২ আনা ১১ পাই। এটি বর্তমানে হাওড়া শহরের একটি এলাকা।

কদমতলা—ব্যাঁটরার একটি বিশিষ্ট অঞ্চল। অনেকগুলি ছোট ছোট লৌহ ও ইঞ্জিনীয়ারীং শিল্পের কারখানা আছে।

কোনা—২ ও ৬নং জাতীয় সড়কের [দিল্লী ও বোম্বে রোডের] নিকটবর্তী এই গ্রামে C.M.D A.'র পরিকল্পনা আছে একটি নূতন শহর এলাকা সৃষ্টি করার।

খালোড়—আকবরী আমলে বর্তমান বাগনান ষ্টেশন নিকটবর্তী সরকার সাঁতগাঁও-এর অন্তর্গত খালোর গ্রামটির নাম ছিল খারর। কালক্রমে গ্রামের নামানুসারে একটি পরগণার নামকরণ হয়। প্রায় ৪০০ বছর আগে রাজা কন্দর্পনারায়ণ কাঠের একটি মহাকালী মূর্তি নির্মাণ করান। এ সম্পর্কে "সংক্ষিপ্ত পল্লীচিত্র"-এ যোগেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী লিখেছেন—

"খালর পরগণা প্রধানত: খালর গ্রামস্থ রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়ের জমিদারী হইয়াছিল, ঐ কন্দর্পনারায়ণ-ই খালর গ্রামস্থ দক্ষিণাকালিকা দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। উহার নিকট হইতে খালর পরগণা সাওড়া ফুলির রাজার অধিকারে গিয়েছিল, পরিশেষে উহা ত্রিবেনী-বেড়ার সিংহ মহাশয় দিগের জমিদারী ভুক্ত হইয়াছে।"

খাস-জালালসি—ডোমজুড় দিয়া যাওয়া যায়। গ্রামের দুই মাইল দুর দিয়া মোটর বাস যাতায়াত করে। গ্রামে নয়টি পাড়া আছে—মালপাড়া, বাগপাড়া, রায়পাড়া, মুসলমান পাড়া, খাঁড়াপাড়া, আদক পাড়া, কল্যে পাড়া, মাঝি পাড়া প্রভৃতি।

গ্রামে একটি মন্দির স্বরূপ নারায়ণ [কচ্ছপাকৃতি], নিরঞ্জন [তালশাঁস আকৃতির] এবং ভগবতী নামে অভিহিত তিনটি শিলা আছে। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে উক্ত বিগ্রহ সমূহের বারদিনব্যাপী গাজন উৎসব হয়।

খড়িয়প বা খাড়োপ—আমতার পাশ্ববর্তী দামোদর নদের তীরবর্তী গ্রামটির ভূতপূর্ব জমিদার বসু বংশীয়দের প্রতিষ্ঠিত শ্মশান কালীর পূজা ও মেলা বিখ্যাত। বর্তমান পরিচালকবর্গের অন্যতম হ'লেন সলিল কুমার বসু। মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতাদের নাম ও সময় সম্পর্কে মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ শ্লোকটি হ'ল—

ষড়-বেদ-সপ্ত-চন্দ্রাঙ্কে শাকে মার্গ শশিক্ষয়ে।
শ্মশানে কালিকা পূজা প্রবৃত্তা শব—পদ্মনি।
কাশীনাথ বৈদ্যনাথৈ বঁসু জাতৈঃ সহোদরৈঃ
হৃদয়ী কৃত্য তৎ-পাদং মারী ভয় নিবারনাৎ॥

অর্থাৎ মারী ভয় নিবারণ হেতু ১৭৪৬ শকাব্দে কাশীনাথ ও বৈদ্যনাথ বসু কর্তৃক মন্দিরের প্রতিষ্ঠা। পূজার শুরু কিন্তু আরও আগে। পূজা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মেলার বর্ণনা—

কাড়া টং টং টিকারা পটহ নহবতাবাদিতাকং স ঘন্টাঃ
নানালোকা প্রসন্নাঃ পরম বুধবরাঃ স্বাগতাঃ নন্দিতা শ্চ।
নানাস্থানে স্বয়াপা হসন পতনবৎ সম্প্রলাপ প্রমত্তাঃ
মা মা শব্দাঃ সদাস্মিন্ সকল জন সুখে কালিকা প্রাঙ্গনে চ।

চারিদিকে খড়ি গাছ এবং অপ্ বা জলের আধিক্য হেতু গ্রামের নামকরণ হয়েছিল খড়ি—অপ্। বসুবাড়ীর পিছনে ফিঙ্গা দীঘি নামে এক দীঘি আছে ৭´×৮´ ইঞ্চি উঁচু একটি ঢিপি ফিঙ্গা ঢিপি বা রাজপাট নামে পরিচিত। প্রবাদ ঢিপির তলায় চাপা আছে ফিঙ্গে বা ভৃঙ্গ রাজার প্রাসাদ। রাজা জাতিতে ছিলেন কোচ [তিওর কিংবা ব্যগ্র ক্ষত্রিয় হওয়াও সম্ভব]। খড়োশ্বর শিব তাঁরই প্রতিষ্ঠিত।

গয়েশপুর—ডোমজুর-জগদীশপুর রোড দিয়া এই গ্রামে যাওয়া যায়। ৪ঠা মাঘ গয়েশ-উদ্-দীন পীরের আবির্ভাব উপলক্ষে চারি শত বৎসরের প্রাচীন মেলা হয়। গ্রামে একটি গড়ের ভগ্নাবশেষ আছে। গড়ের বিস্তার গয়েশপুর থেকে জোদ্গিরি পর্য্যন্ত একমাইল ব্যাপী।

গোলাবাড়ী—হাওড়া শহরের অন্তর্গত শালকিয়ার যে অঞ্চলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নুনের গোলা ও গুদামঘর ছিল কালক্রমে সে অঞ্চলটি গোলাবাড়ী নামে আখ্যাত হয়।

গড়ভবানীপুর—পেঁড়ো থেকে ৫ মাইল পশ্চিমে আমতা থানার একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। এখানকার রাজারা মুঘল আমলেও বেশ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। কথিত আছে, রাজা রুদ্র নারায়ণের পত্নী রানী ভবশঙ্করী পাঠানদের সঙ্গে যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করায় আকবরের নিকট থেকে রায়বাঘিনী উপাধি পেয়েছিলেন।" হুগলী বা দক্ষিণরাঢ় গ্রন্থ প্রণেতা অম্বিকাচরণ গুপ্তের মতে মুসলমানদের আমলে প্রায় দুই শত বৎসর পূর্বে এক বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ রাজা এখানে রাজত্ব করিতেন। এই রাজ্য প্রতিষ্ঠাতার নাম উমেশচন্দ্র। রাজা নবাবকে বার্ষিক একটি স্বর্নমুদ্রা, কয়েকটি খাসী ছাগল এবং একমন ছাতু মাত্র কর দিয়া রাজত্ব ভোগ করিতেন। রামজীবন স্মার্ত্তবাগীশ নামে জনৈক সুপণ্ডিত ব্যাসোক্ত ব্রাহ্মণ তাঁহার সভাপণ্ডিত ছিলেন। উমেশচন্দ্রের পুত্রের নাম গৌরী চরণ। তিনি পিতৃগুণে গুণবান বা শক্তি-সামর্থ্যশালী না থাকায় রাজ্যাধিকারে বঞ্চিত হ'ন। রাজলক্ষ্মী কৈবর্ত্ত জাতীয় রামকিশোর রায়কে আশ্রয় করিলে অদ্যাপি তাঁহার বংশীয়েরা গড়ভবানীপুরের জমিদার। যদি বিবরণটি সত্য হয় তাহলে ঘটনাটি নিশ্চয়ই বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্র কর্তৃক কবি ভারত চন্দ্রের পিতৃরাজ্য অধিকারের পরবর্তী কোন সময়ের এবং কোন স্বাধীন রাজার নয়, কোন জমিদারের মাত্র।

ঘুসুড়ি—শালকিয়া এবং লিলুয়ার মধ্যবর্তী হাওড়া শহরের অন্তর্গত গঙ্গা তীরবর্তী এক বর্ধিষ্ণু পুরাতন জনপদ।

"১৫৪০ খ্রীঃ ডি বারোস বাঙ্গালার যে মানচিত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতে নিম্নবঙ্গে এইকয়টি স্থানের উল্লেখ আছে। সাতগাঁ, আগড়পাড়া, বরাহনগর, যক্ষ এবং বাঁটরা।

... ... ১৭৯৪ খ্রীঃ ১১ই সেপ্টেম্বর গবর্ণমেন্ট কাউন্সিলে কলিকাতার যে সীমা নির্ণয় হয়, তাহাতে দেখা যায় বাগবাজারের সম্মুখে গঙ্গার পশ্চিমে এখনকার ঘুসড়ির নাম সে সময় পর্য্যন্ত যক্ষপুর ছিল।" কলিকাতার ইতিবৃত্ত—প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, পৃঃ ২৭।

অথচ আনুমানিক ১৪৯৫ খ্রীঃ-এ লেখা বিপ্রদাস পিপ্‌লাই-এর মনসামঙ্গলে "ঘুষুড়ি"র নাম পাওয়া যায়।

চিংড়াজোল—আমতা থানা। ঝিখিরা'র দঃ-পশ্চিমে এবং কলকাতার প্রায় ৫০ মাইল পশ্চিমে চিংড়াজোল গ্রাম। এক সময় মার্টিন রেলপথ ব্যতীত কোলাঘাট থেকে ষ্টীমার যোগে বাকসী অথবা পানসিউলিতে নেমে শুধুমাত্র বর্ষাকালে নৌকায় এখানে যাওয়া যেত। বিখ্যাত কীর্ত্তনওয়ালা নকুড়চন্দ্র অধিকারীর বাস ছিল। গ্রামের উত্তর-পূর্বে মণ্ডল পাড়া। মণ্ডলরা মাহিষ্য এবং বৈষ্ণব। এঁদের আদি পুরুষ ধর্মদাস মণ্ডল এখানে আসেন খালনার সন্নিকটস্থ হরিসা গ্রাম থেকে। এই বংশের সূর্য্য কুমার মণ্ডল [১৭ই আষাঢ় ১২৫৮—২০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭] ছিলেন বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতি ও মাহিষ্য ট্রেডিং ব্যাঙ্কের পৃষ্ঠপোষক।

চররাধাপুর—পূর্বভারতীয় বহি-র্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাম্রলিপ্ত [বর্তমান তমলুক] বন্দরের গুরুত্বের কথা ইতিপূর্বেই স্বীকৃত হয়েছে। রূপনারায়ণ তটপ্রান্তবর্তী হাওড়াও যে এই গৌরবের অংশভাগী ছিল তা আর একবার প্রমাণিত হয়েছে শ্যামপুর থানার চররাধাপুর গ্রামে পাওয়া একটি পোড়া মাটির মূর্ত্তি থেকে। আশুতোষ মিউজিয়ামে রক্ষিত এই মূর্ত্তির মুখ দু'টি, মাথায় রোমান

শিরস্ত্রাণ এবং একটি বলয় আছে। প্রাচীন রোমক যুদ্ধ দেবতা জানুস-এর সঙ্গে মূর্তিটির সাদৃশ্য বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ায় এটিকে প্রায় দু'হাজার বছর আগেও গ্রীক ও রোমান ব্যবসায়ীদের বাংলায় আসা যাওয়ার প্রমাণ হিসাবে গণ্য করা হ'চ্ছে।

চন্দ্রভাগ—বাগনান ষ্টেশন থেকে বাসে যাওয়া যায়। চন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায় নির্মিত ১৮১৩ খ্রীঃ এর ১৩টি শিবমন্দির আছে।

চাকপোতা—আমতা থানার একটি গ্রাম। কথিত আছে পূর্বে গ্রামের উত্তর পাড়ায় বাস করত অনেক ঘর কুমোর। তাদের ছিল অনেক চাক বা চক্র যা দিয়ে মাটির হাঁড়ি প্রভৃতি তৈরী হয় এবং গ্রামের চতুর্দিকে পুঁতে যাওয়ার মত কাদা থাকায় গ্রামের নাম চাকপোতা। আর একটি প্রবাদ—এখানেই কর্ণ ও অর্জুনের মধ্যে যুদ্ধ হয় এবং কর্ণের রথের চাকা এখানে পুঁতে যায় বলেই গ্রামের নাম চাকপোতা। গ্রামের পাশের মাঠটির নাম চক্ দুগ্‌গোর মাঠ। এই গ্রামে কবি নিমাই মান্না প্রতিষ্ঠিত "সংস্কৃতি" সংস্থা হাওড়ার একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। গ্রামের পূর্বদিকে আছে দাদখালী 'দ' নামে এক বিরাট জলাশয়। বহুবার দ'য়ের তলদেশ থেকে গাছের ফসিল পাওয়া গেছে। প্রচণ্ড খরাতেও দ' য়ে প্রচুর জল থাকে।

জোকা—জমি জায়গা মাপ জোক করার বিশেষজ্ঞদের বসতি হেতু গ্রামের নাম জোকা। গ্রামের কোলে পরিবারের এক পূর্ব-পুরুষ ভাল আমিন ছিলেন বলে জানা যায়।

জয়পুর—জেলার পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমান্তবর্তী মাহিষ্য প্রধান বর্ধিষ্ণু গ্রাম। জয়পুর থেকে রসপুর পর্য্যন্ত মাইল পাঁচেক পথে শুধু গোরস্থানের উপর-ই নয় শ্মশানে এমনকি বাড়ীর কাছাকাছি কোন জায়গায় দাহ করার পর সেই জায়গায় বহু হিন্দুর সমাধি মন্দির দেখা যায়। সমাধি মন্দিরগুলি অনেকটা মেগালিথিক যুগের আদিম জাতির সমাধি মন্দিরের অনুরূপ।

জগৎবল্লভপুর—হাওড়া শহরের ১৭ মাইল উত্তরে-পশ্চিমে কানা-দামোদর নদ তীরবর্তী গ্রাম। পূর্ব নাম মামদানীপুর। আকবরের সেনাপতি মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ কিছুকাল এই গ্রামে বাস করায় নাম হয় জগৎবল্লভপুর। এই অঞ্চলের কানা দামোদর খুঁড়ে দেড় হাজার বছর আগের সাড়ে তিন ফুট উঁচু একটি বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গেছে। ২৮.১২ ৬৮ তারিখের হাওড়া-বার্তায় প্রকাশ এখানে দুষ্প্রাপ্য ব্রহ্ম শিলা ধরণের একটি চৌকোনা ব্যাসাল্ট ফলক পাওয়া গিয়েছে যার দুদিকেই আছে অনেক ছোট ছোট খোদাই শিলার মাঝখানে আছে স্মিতবদন ও ত্রিনয়ন বিশিষ্ট বিষ্ণুমূর্তি। প্রস্তর ফলকটিতে আঘাত করা মাত্র ধাতব আওয়াজ শোনা যায়। প্রায় দুই শত বৎসরের প্রাচীন সিংহবাহিনী দেবী ও স্বয়ম্ভু হটেশ্বর শিবের মন্দির আছে।

জালপাই—বাগনান থানার ওড়ফুলি এবং বরুন্দা দু'টি মৌজাতে একটি করে জালপাই গ্রাম আছে। শ্রীতারপদ সাঁতরা'র লেখা থেকে জানা যায়, এখন যেখানে 'আনন্দ নিকেতন' আগে সেখানেই ছিল বরুন্দা মৌজার জালপাই গ্রাম। অষ্টাদশ শতকে নুন তৈরীর কেন্দ্র হিসাবে রূপনারায়ণ নদতীরবর্তী বাগনান থানার এইসব গ্রামগুলি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। নুন তৈরীর জন্য নির্দিষ্ট এলাকাকে বলা হত জালপাই। "মেদিনীপুরের ইতিহাস" রচয়িতা যোগেশ চন্দ্র বসু'র মতে পাই শব্দের অর্থ জন্য এবং "জাল" হ'ল জ্বলন এর অপভ্রংশ। অর্থাৎ এইসব জনপদ সে সময় ছিল জঙ্গলাকীর্ণ এবং সেই জঙ্গলের কাঠ নুন তৈরীর জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত।

জুজারসা—হাওড়া-উলুবেড়িয়া বাসপথে ধুলাগড়িতে নেমে দেউলপুরগামী পিচ-রাস্তা ধরে প্রায় তিন মাইল রাস্তা [৪.৮ কি.মি.] উত্তর-পশ্চিমে গেলে পাঁচলা থানার অন্তর্গত জুজারসা [জে.এল নং ৮] গ্রামে পৌছানো যায়। এখানে এক গৌড়ীয় রাজার ভগ্ন প্রাসাদ. দীঘি ও একটি টিপি আছে। রাজার নাম জানা যায় না। কিংবদন্তী, রাজা যুদ্ধে যাবার সময়ে দু'টি পায়রা সংগে নিয়ে যান। একটি পায়রা যুদ্ধ জয়ের প্রতীক, অপরটি পরাজয়ের। যুদ্ধে জয়লাভ হওয়া সত্ত্বেও কোন কারণে ছাড়া পেয়ে পরাজয়ের চিহ্ন বহনকারী পায়রাটি উড়ে প্রাসাদে রানীর কাছে এলে পরাজয় অনুমানে রানী ধনদীঘিতে ডুবে আত্মহত্যা করেন। রাজাও এই শোক সংবাদে সেই দীঘিতে ডুব দেন। এখনও এখানকার শ্বেত খানার ডাঙ্গা, দেউলপোতা, ফরম খানার পুকুর, শত বিঘা আয়তনের ধনদীঘি, মহিষ পুকুর, হরিদ্রাপোতা, রাজার কোঠা প্রভৃতি সেই গৌড়েশ্বরের স্মৃতি বহন করছে। গ্রামে ব্রাহ্মণ পাড়া, মিদ্দে পাড়া ইত্যাদি চোদ্দটি পাড়া আছে।

ঝাপড়দহ—সরস্বতী নদীর একটি প্রকাণ্ড দহ থেকেই ডোমজুর থানার এই গ্রামটির নামকরণ হয়েছে।

ঝুমঝুমি—থানা শ্যামপুর। মান্না-মণ্ডল-মল্লিক কোম্পানীর সিদ্ধেশ্বরী কটন মিল এই গ্রামের উল্লেখযোগ্য শিল্পোদ্যোগ।

ডোমজুড়—হাওড়া ষ্টেশন থেকে প্রায় ১০ মাঃ দূরে সরস্বতী নদীতীরবর্তী প্রাচীন গ্রাম। মুখ্যত তন্তুবায় এবং কৃষিজীবি সম্প্রদায়ের কিছু লোক—অন্ততঃ পাঁচশঘর—শ দেড়েক বছর আগে এই গ্রাম থেকে বোম্বাই পাড়ি দেন। এঁরা বর্তমানে বোম্বাইয়ের জাভেরি অঞ্চলবাসী এবং সোনা ও হীরার গহণার কারিগর হিসাবে সুনামের অধিকারী। গ্রামটিতে সেন্টের শিশির ঢাকনা ও গহণা রং করার বহু কারখানা আছে।

তাজপুর—আমতার নিকট অবস্থিত প্রাচীন গ্রাম। হাওড়া জেলা বোর্ডের এককালীন সভাপতি মন্মথ নাথ রায়ের পৈত্রিক নিবাস।

তেলকলঘাট—বার্ণ কোম্পানীর কারখানা সন্নিকটস্থ গঙ্গার তীরে

জেসপ এণ্ড কোং প্রতিষ্ঠিত [১৮৩০] একটি বেশ বড় তেলের কল থাকাতেই যায়গাটির এই নাম। যখন তেলকলঘাটে মার্টিন লাইট রেলওয়ের টার্মিনাল ষ্টেশন ছিল তখন দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য হাওড়া ময়দান থেকে একজন লোক তেলকলঘাট পর্য্যন্ত ইঞ্জিনের আগে আগে পথচারীদের সতর্ক করার জন্য ঘণ্টা বাজিয়ে ছুটত। তেলকলঘাট রোডের বর্তমান নাম নিত্যধন মুখার্জী রোড।

দেউলপুর—এই গ্রামে গোলুইপাড়া, শিউলিপাড়া, মালপাড়া প্রভৃতি ১১টি পাড়া আছে। জনশ্রুতি স্বপ্নাদিষ্ট বর্ধমান-রাজ-সিংহবাহিনী নামে আখ্যাত দারুনির্মিত দুর্গা মূর্তি এবং বর্তমান মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

নারণা—ডোমজুর-জগদীশপুর রোড দিয়ে ভাস্কর অথবা পার্বতীপুর হয়ে এই গ্রামে পৌছান যায়। একদিন যে এলাকায় ছিল বাঁশ, বেত ও সাঁইগাছের গভীর জঙ্গল, এবং জঙ্গল সন্নিহিত শশ্মানে কাপালিক ও তান্ত্রিক সন্ন্যাসীদের সাধনক্ষেত্র, ডোমজুর থানার মজা কৌশিকী নদীতীরস্থ সেই নারণা গ্রামটি আজ শৈব- ও শাক্ত তীর্থক্ষেত্র বিশেষ। কালী ও পঞ্চানন্দের মন্দির বিখ্যাত। কালীমন্দিরে কালীপূজার পরের দিন প্রতিপদে মহাধূমধামে পূজা হয়। মন্দিরের একটি প্রস্তর ফলকে লেখা আছে, সন ১২১৪ সালে বা ১৭২৯ শকাব্দে কলিকাতা নিবাসী রামনারায়ণ মল্লিক ইহার নির্মাতা। অনুমান আরও প্রায় ২৫০ বছর আগে প্রথম মন্দিরটি তৈরী হয়। তারও আগে খড়ের চালা ঘরে ছিল দেবীর ঘটে অধিষ্ঠান। দেবীর বর্তমান পাষাণ মূর্তির প্রতিষ্ঠা ১৩৩১ সালে। তার আগে ছিল মৃণ্ময়ী মূর্তি। পঞ্চানন্দের পুরোহিতরা দেন বাতের ও পক্ষাঘাতের এবং কালীর পূজারীরা দেন রক্তপিত্তের ওষুধ। চড়কে মেলা এবং বৈশাখী পূর্ণিমায় ফুলদোল হয়।

নারীট—আমতার সন্নিকটস্থ প্রাচীন গ্রাম। মহামহোপাধ্যায়

মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন এবং তাঁর পুত্র প্রথম ভারতীয় একাউন্ট্যান্ট জেনারেল মন্মথ নাথ ভট্টাচার্য্যের জন্মস্থান।

নিজবালীয়া—হাওড়া ষ্টেশন থেকে ৬৩নং রুটের যে সব বাস বড়গাছিয়া হ'য়ে যাতায়াত করে সেই বাসে পাতিহাল গ্রামে নেমে দক্ষিণে গেলে হাওড়া থেকে প্রায় ১৮ মাইল দূরে অবস্থিত অতীতের প্রসিদ্ধ বালিয়া পরগণার কেন্দ্রভূমি নিজবালিয়া গ্রামে পৌছান যাবে। আইন-ই-আকবরী অনুসারে বালিয়া পরগণার রাজস্ব ছিল ৯৪.৬২৫ দাম। শেরশাহের আমলে এখানে রাজত্ব করতেন রণসিংহ। এখন রাজা নাই, রাজত্বও নাই। আছে মাত্র গড়বালিয়া নিমাবালিয়া, যমুনাবালিয়া বাদেবালিয়া প্রভৃতি বালিয়া শব্দ সংযুক্ত কয়েকটি গ্রামের অস্তিত্ব এবং নিজবালিয়া গ্রামে দেবী সিংহ বাহিনীর মন্দির ও মূর্তি। বর্ধমান রাজ কৃষ্ণরাম নিজবালিয়ার রাজা চৈতন্য সিংহকে [১০৯০ সাল] পরাজিত ও নিহত করে রাজ্যটি নিজ অধিকারভুক্ত করেন। দেবী-সিংহবাহিনী ছিলেন সম্ভবতঃ বিজিত রাজবংশের কুলদেবী। দেবীর সেবার জন্য বর্ধমান রাজ দরবার থেকে দু'হাজার বিঘা জমি দান করা হয়েছিল। ১১৯৭ সালে কলিকাতা নিবাসী রামনারায়ণ মল্লিক মন্দিরটির সংস্কার সাধন করেন। সিংহ বাহিনী দেবীর দারু নির্মিত মূর্তিটির বাঁদিকের হাতগুলিতে আছে অসি, বাণ, পাশ ও বরদান মুদ্রা এবং ডানদিকের হাতগুলিতে ঢাল, ধনুক, শঙ্খ ও অভয়মুদ্রা। পদতলে সিংহ। যজ্ঞেশ্বর ঘোষ প্রতিষ্ঠিত (১২৯৬ সালে) ১৩ চূড়ার রথ যাত্রা উপলক্ষে দু'দিন ব্যাপী মেলা বসে।

নতিবপুর—উলুবেরিয়া মহকুমার একটি গ্রাম। অধিবাসীরা অধিকাংশই দিন মজুর। বহুসংখ্যক হোগলা ব্যবসায়ী মুসলিম সম্প্রদায় বাস করেন। ৬ হাত × ২ হাত একশ হোগলা পাটির দাম তিনশ থেকে চারশ টাকা। খদ্দের আকর্ষণের জন্য এঁরা বোম্বে রোডের ধারে কিছু পাটিবুনে চালা ঘরের মত ছাউনি দিয়ে সাজিয়ে

রাখেন। বর্ষার সময়ে গ্রামের হাটে বাজারে এই সব পাটি বিক্রী হয়।

নবাসন—থানা জগৎবল্লভপুর। গ্রামটি গহলীপাড়া, কুলিপাড়া, প্রভৃতি সাতটি পাড়ায় বিভক্ত। ব্রাহ্মণপাড়ায় অবস্থিত কতোয়ালী পীর নামক জনৈক পীরের সমাধি স্থানে ১লা মাঘ পীরের উরস উপলক্ষে মেলা বসে।

পিছলদহ—ফোর্ট মর্নিংটন পয়েন্টের উত্তর-পশ্চিমে শ্যামপুর থানার একটি গ্রাম। চৈতন্য মঙ্গল অনুসারে পুরী যাওয়ার পথে চৈতন্যদেব শান্তিপুরের নিকট ভাগীরথী অতিক্রম করে বর্ধমান জেলার অম্বিকা কালনা, কুলীন গ্রাম ও হুগলী জেলার শিয়াখালা হয়ে পিছলদহ গ্রামে আসেন। এখান থেকে তিনি মেদিনীপুরের তমলুকের পথে অগ্রসর হন।

প্রশস্থ—মাকড়দহ বাজার থেকে ৩ কিঃ মিঃ দূরবর্তী এই গ্রামের পোটো পাড়ায় মণ্ডল, পাল, সূত্রধর উপাধিধারী বহু দক্ষ মৃৎশিল্পীর বাস।

পেঁড়ো—প্রাচীন বর্ধিষ্ণু এলাকা। রায়গুনাকর ভারতচন্দ্রের জন্মস্থান। ফকির পাড়ায় আলী সাহেবের দরগা আছে।

পাইকপাড়া—জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত। খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকার ও ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশের জন্মস্থান।

পাতিহাল—অধুনালুপ্ত মার্টিন লাইট রেলওয়ের একটি ষ্টেশন। ব্যায়ামবীর ভীমভবানীর জন্মস্থান। এই গ্রামের গঙ্গাধর দে বিশ্বাস ব্রিটিশ আমলে বেনিয়ান বা মুৎসুদ্দীর কাজে যোগদান করে কলকাতার কলেজষ্ট্রীট অঞ্চলে বাস করতেন। এঁর বড় ছেলে শ্যামাচরণ দে বিশ্বাস (যাঁর নামে এখানে একটি রাস্তা আছে) ছিলেন "কম্পট্রোলার অফ্ কারেন্সি" অফিসের প্রথম ভারতীয়

গেজেটেড অফিসার—এ্যাসিস্ট্যান্ট কম্পট্রোলার। কবি বিষ্ণু দে'র জন্ম এই বংশে।

পাঁচলা—অতীতে রেশম চাষের, বর্তমানে মশারীর থান ও পরচুলা তৈরীর জন্য বিখ্যাত।

পুঁইল্যা—মৌড়ীগ্রাম ষ্টেশন হ'য়ে সাইকেল রিক্সায় গ্রামে যাতায়াত করা যায়। গ্রামের সীমান্তে সরস্বতী নদী এবং মধ্যস্থলে গোরাচাঁদ পীর ও ওলাবিবির নির্দিষ্ট স্থান আছে।

পুরুলপাড়া—রেলষ্টেশন বাগনান। গ্রামের দক্ষিণ সীমানায় রূপনারায়ণ নদ। নদীতীরবর্তী এলাকা পলিপূর্ণ ও উর্বরা। জমিতে ঝিঙ্গা ও ধুন্দুলের চাষ হ'ত। ধুন্দুলের খোসা গায়ে সাবান মাখার কাজে ব্যবহৃত হয়। এই খোসার স্থানীয় নাম পুরুল। অনুমান পুরুলের আধিক্যহেতুই গ্রামের এইরূপ নামকরণ। দ্বাদশ শতাব্দীর ষষ্ঠদশকে বর্ধমান রাজ মণ্ডলঘাট পরগণার জমিদারী পান। পুরুলপাড়া সে সময় মণ্ডল ঘাট পরগণার অন্তর্গত ছিল। বর্ধমান রাজ পরগণার কিছু অংশ কন্যাকে দান করেন এবং বাকী অংশ সাতক্ষীরার চৌধুরীদের পত্তনী দেন। চৌধুরীদের প্রায় সমুদয় অংশ কিনে নেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। পরে দ্বারকানাথের অংশ কেনেন মহিষাদলের রাজারা। ১২৫৮ সালে মতিলাল শীল মহিষাদলের রাজা লচমন গর্গের নিকট থেকে পুরুলপাড়া অংশটি কিনে নেন। ১৩৩২ বঙ্গাব্দে একটি পুকুর খোঁড়ার সময় চৌদ্দ হাত নীচ থেকে দুটি কালো পাথরের শ্লেট পাওয়া গেছে যা গ্রামের অনন্তরাম প্রামাণিকের বাড়ীতে আছে।

পূর্ণাল—বর্ধমানের মহারাজের নিকট থেকে ভূ-দান পেয়ে জনৈক পূর্ণকুঁতি কোন সময়ে এই গ্রামে বসবাস শুরু করেন। তাঁকে কেন্দ্র করে আরও কিছু পরিবারের বাস শুরু হয়। এঁদের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী ন পাড়া'র অধিবাসীদের জমি-জায়গা নিয়ে বিরোধ

শুরু হ'লে মহারাজা পূর্ণকুঁতির জমির সীমানা বড় খাল দিয়ে ঘিরে দেন। পূর্ণ'র আল থেকেই গ্রামের নাম পূর্ণাল। এখনও কুঁতি পরিবার এখানে বাস করেন।

ফোর্ট মর্ণিংটন পয়েন্ট—জেলার দক্ষিনাংশে রূপনারায়ণ ও ভাগীরথীর সংযোগস্থলে শ্যামপুর থানার অন্তর্গত গাদিয়ারা গ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণস্থান। লর্ড ক্লাইভ এখানে ১টি দুর্গ তৈরী করেছিলেন। দুর্গটি কালক্রমে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। জায়গাটিকে মাকরা-পাথরও বলে।

ফুলেশ্বর—রাজাপুর খাল এই গ্রামের মধ্য দিয়ে গিয়েছে।

বাগাণ্ডা—হাওড়া শহরের ১৬ মাইল পশ্চিমে শ্যামপুর ১নং ব্লকের বাগাণ্ডা গ্রামে ছিল উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জীর [স্বনামধন্য W. C. Banarjee] পৈত্রিক বাসস্থান। বসবাসের উদ্দেশ্যে তাঁর পিতামহ পিতাম্বর ব্যানার্জী বাগাণ্ডা থেকে কলকাতায় আসেন।

বাছারি—থানা শ্যামপুর। কথিত আছে তমলুকের কোন এক রাজা বাছরি-খাজরি এলাকার বাগদী রাজাকে পরাস্ত করে তাঁর রাজধানী ধ্বংস করেন। পাণিত্রাসের শরৎ স্মৃতি মন্দিরে বাছরি গ্রামে প্রাপ্ত প্রত্নসম্পদের কিছুটা রক্ষিত আছে।

ব্যাতোর—গ্রামটির পূর্বে শিবপুর পশ্চিমে সাঁতরাগাছি। তরুণী সরস্বতী নদী যে সময় গ্রামটির পাশ দিয়া প্রবাহিতা ছিলেন তখন ছিল এই গ্রামের স্বর্ণযুগ। সে সময় নদীতীরে বেতবনের দ্বারা বেষ্টিতা অবস্থায় চণ্ডিকা দেবী [ব্যাতাই চণ্ডী নামে প্রসিদ্ধা] পূজিতা হ'তেন। দেবীমূর্তিটি প্রস্তর-নির্মিত। বর্তমানে দেবীর মন্দির শিবপুরের ব্যাতাইতলায়। বর্তমানে স্থানে অধিষ্ঠিতা হইবার পূর্বে শিবপুরে মন্দিরটির পূর্বতন অবস্থান সম্পর্কে ১৮৮০তে জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী লিখে গেছেন—"...মাতা বেত্রচণ্ডিকার মন্দির আমরা বরাবর দেখেছি ক্ষেত্র ব্যানার্জী লেন, হালদার বাড়ী আমাদের মধু মাষ্টারের স্কুল যেখানে ছিল।

বালিটিকুরী—ভূতপূর্ব মার্টিন লাইট রেলওয়ের একটি ষ্টেশন। হাওড়া—ডোমজুর বাসরুট পথে অবস্থিত গ্রামটিতে আছে সদানন্দ বাবাজী প্রতিষ্ঠিত সদানন্দ মঠ। "দুই সতীনের দীঘি" নামে একটি প্রাচীন দীঘি আছে। মাটিতে বালির পরিমাণ বেশি বলে গ্রামটি কোন সময় নদীর অংশবিশেষ ছিল মনে করা হয়। আদি বাসিন্দারা প্রধাণতঃ বাগদী ও ডোম। বসন্ত চক্রবর্তী নামে এক ব্যক্তি বর্ধমানের মহারাজার কাছ থেকে গ্রামটির জায়গীর পান। গ্রামের পূর্বে বিরাভিঙ্গী, পশ্চিমে ধার্সা ও বাঁকড়া, উত্তরে কোনা এবং দক্ষিণে দাশনগর শিল্প প্রধান এলাকা। ইন্দো- জাপান প্রোটোটাইপ প্রডাকসন এণ্ড ট্রেনিং সেণ্টার এবং সেন্ট্রাল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট আছে। এ ছাড়া আছে রাজ্ঞি, মোমবাতি, ধূপ ও টালি তৈরীর কারখানা।

বাঁ্যাটরা—নরসিংহ দত্ত কলেজের পিছন দিক থেকে কদমতলার প্রান্তদেশ পর্য্যন্ত ইহার বিস্তৃতি। এলাকাটি উত্তর বাঁ্যাটরা এবং দক্ষিণ বাঁ্যাটরা এই দুই ভাগে বিভক্ত। ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে আঁকা ডি বারোস-এর মানচিত্রে বাঁটরা'র উল্লেখ আছে। চন্দ্রনাথ ব্যানার্জী তাঁর "এ্যান এ্যাকাউন্ট অব্ হাওড়া—পাষ্ট এণ্ড প্রেজেন্টে" গ্রন্থের দশম পৃষ্ঠায় নরসিংদেব চক্রবর্তী নির্মিত বাঁ্যাটরার একটি ভাঙা মন্দিরের উল্লেখ করে লিখেছেন, 'মন্দিরটি কত দিনের পুরানো বলা শক্ত'। প্রাণকৃষ্ণ দত্ত রচিত কলিকাতার ইতিবৃত্ত গ্রন্থের ৩৫ পাতায় লেখা আছে"—এক্ষণে যাহাকে হাবড়ার হাট বলে তাহা অতি প্রাচীন হাট, পূর্বে [ইহা] বাঁ্যাটরার হাট বলিয়া পরিচিত ছিল"। ঐ গ্রন্থের-ই ৪১ পৃষ্ঠায় আছে—"ডি, বারোসের বাটোরই মুকুন্দরামের বেতড় হওয়া সম্ভব এবং উহা পূর্বে সম্ভবতঃ বহুদুর বিস্তৃত থাকায় কতক-অংশ বাঁ্যাটরা এবং কোন স্থান পূর্ব্ব নামে বেতড়ের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে।"

ব্রাহ্মণ পাড়া—কানা দামোদর গ্রামের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বেসরকারী ভাইস চ্যান্সেলার স্যার

দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী এবং তাঁর ভাই বিখ্যাত শল্য চিকিৎসক সুরেশ প্রসাদের পৈত্রিক বাসস্থান। ব্রহ্মময়ী কালীর সাড়ম্বরে পূজা হয় কার্ত্তিকী অমাবস্যায়। এরূপ বিরাট কালী প্রতিমা এ-অঞ্চলে দ্বিতীয় নাই। ১লা মাঘ কতোয়ালী পীর সাহেবের স্মরণ-উৎসব এবং চৈত্রে ধর্মরাজের গাজন হয়।

বলুহাটি—অধুনালুপ্ত হাওড়া শিয়াখালা লাইট রেলওয়ের হাওড়া জেলাস্থ শেষ ষ্টেশন। সরস্বতী নদী তীরবর্তী গ্রামটিতে প্রতি মঙ্গল ও শুক্রবার হাট বসে। প্রবাদ, হাটের প্রতিষ্ঠাতার নামছিল বলাই মল্লিক। বলাই হাট থেকেই গ্রামের নাম হয়েছে বলুহাটি মন্তব্য করেন ভুবনেশ্বরীতলা বাসী প্রধান শিক্ষক ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

বানীবন—নিকটবর্তী রেলষ্টেশন উলুবেড়িয়া। রাজাপুর খাল দিয়া নৌকা যোগে যাতায়াত করা যায়। পৌষ মাসে হজরত জঙ্গল বিলাস পীরের তিরোভাব উপলক্ষে পাঁচদিন ব্যাপী মেলা হয়। অবিভক্ত বাংলায় এক সময় ছাত্রী নিবাস যুক্ত বালিকা বিদ্যালয় একমাত্র এই গ্রামেই ছিল। বহু ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বীর বাস আছে।

বুড়িখালী—নিকটবর্তী রেল ষ্টেশন বাউরিয়া। চৈত্রসংক্রান্তির তিন দিন আগে ধর্মরাজের গাজন উৎসবের শুরু, শেষ সংক্রান্তির দিন, গাজনে ধর্মরাজের ঝাঁপ-অনুষ্ঠানের আগে পীরের ঝাঁপ অনুষ্ঠান হয়।

বৈঁচী—রেলষ্টেশন বাগনান। পূর্বে এ-জায়গায় বৈঁচীবন ছিল। মাহিষ্য ও কোরঙ্গা জাতি অধ্যুষিত গ্রাম। বিজয়ার দিন দক্ষিণরায় ও জয়চণ্ডীর পূজা হয়। দক্ষিণরায়ের মুর্তিটি পাথরের।

বেগরী—থানা-ডোমজুর। প্রবাদ এখানে হাবসীরাজার গড় ছিল। গড়ের দুটি অংশ ভিতর গড় ও বাহির গড়। বাহির গড় কথাটির অপভ্রংশে বেগড়ি।

বড়গাছিয়া—অধুনালুপ্ত হাওড়া-আমতা এবং হাওড়া চাঁপাডাঙ্গা লাইট রেলওয়ের জংশন ষ্টেশন ছিল। এখানে প্রায় ১১০ হাত উঁচু

গীর্জা এবং সিমাফোর টেলিগ্রাফের জন্য নির্মিত ১৬৫ ফুট উঁচু একটি ইটের মিনার আছে।

বাইনান—কলিকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি নাসিম আলিসাহেবের জন্মস্থান।

বীরশিবপুর—হাওড়া থেকে ২৩ মাইল দূরের একটি রেলষ্টেশন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বসু পরিবার নির্মিত সীতারামের মন্দিরে তিন-চার ইঞ্চি পরিধিযুক্ত আধাচ্যাপ্টা একটি গোলাকার কষ্টি পাথরকে সীতারাম রূপে পূজা করা হয়। অনুমান ইহা নেপাল হইতে আনীত। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দেও এখানকার মাঠে শিকারীরা পাখী শিকার করতে আসতেন। মাইল চারেক দুরে কানসোনা গ্রামে আছে পীর গোরাচাঁদের আস্তানা ও পুকুর। রোগমুক্তির কামনায় সকল ধর্মের লোকই এই পুকুরে স্নান করেন। গ্রামে একটি বৈষ্ণববেদান্তমঠ আছে।

আন্দুলের রাজাদের নিকট হইতে মৌড়শী পাট্টা নিয়ে বর্ধমানের বিড়শি নামক স্থানের কোন ভূস্বামী বর্তমান বীরশিবপুর এলাকায় বসবাস শুরু করেন। তালুক বিড়শি-ই সম্ভবতঃ বীরশিবপুর এলাকার রূপান্তরিত হয়। রেলষ্টেশনের দেড় কিলোমিটার দুরে কলিকাতা-বোম্বাই ৬নং জাতীয় সড়কের পাশে হরিনারায়ণচক, চণ্ডীপুর এবং আমড়াবাড়িয়া এই তিন গ্রামের মধ্যবর্তী পাঁচ একর ভুমির উপর ১৩৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব বেদান্তমঠ। প্রবাদ মহাপ্রভু নীলাচল যাত্রাপথে এখানে বিশ্রাম করেছিলেন। সেই বিশ্রাম স্মৃতি স্মরণে অদ্যাপি বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে একটি বার্ষিক উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়।

বাঙালপুর—বাঙাল পদবীধারী বহু সংখ্যক ব্যক্তির বাস ছিল। শেষপর্যন্ত পশ্চিম পাড়ায় রায়পাড়া অংশে ৩ ঘর বাঙাল পদবীধারী ব্যক্তি ছিলেন যাঁরা তাদের উপাধি দাস-এ পরিণত করেছেন। নিকটবর্তী রেলষ্টেশন বাগনান।

বাগনান ঃ—উলুবেড়িয়া থেকে ১২ মাঃ দূরে অবস্থিত। উড়িষ্যা ট্রাঙ্ক রোড এই গ্রামের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। স্বাধীনতার বেদীমূলে উৎসর্গকৃত প্রাণ বাঘাযতীন অনেকদিন এখানে আত্মগোপন করে ছিলেন। কবি মোহিত লাল মজুমদার এখানে বহুদিন বসবাস করেছিলেন।

বাউড়িয়া—উলুবেড়িয়া থেকে ৫ মাঃ এবং হাওড়া থেকে ১৬ মাঃ দূরের এই গ্রামটি ডাচদের কাছ থেকে ইংলণ্ডের United Company of Merchants কিনে নেন। ১৭৯০-এর ১লা জুলাই ইউনাইটেড কোম্পানীর কাছ থেকে গ্রামটি কেনেন মিঃ আলেকজাণ্ডার কিড। বিক্রয় দলিলে লেখা ছিল জায়গাটিতে যেন কফি চাষ করা হয়। চাষ করাও হয়েছিল। কিন্তু কফি হল না, তাই অবশেষে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতের প্রাচীনতম তূলা কল—বাউরিয়া কটন মিল ১৮১৭ মতান্তরে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে। মিলের প্রথম বাড়িটি তদানীন্তন ল্যাংকাষ্টার কটনমিলের অনুকরণে তৈরী করা হয়। তারও আগে যে বাড়ীটি ছিল সেই বাড়ীতে নাকি রবার্ট ক্লাইভ কিছুকাল বসবাস করেছিলেন। এখন এখানে ফোর্টগ্লষ্টার জুটমিল ও লরেন্স জুটমিল নামে দুটি পাটকল আছে।

বাজেশিবপুর ঃ—রামকৃষ্ণপুর ও শিবপুরের মধ্যবর্তী এলাকা। আইনের বই 'Wilson's Glossary' অনুযায়ী ফারসী কথা 'বাজির' অর্থ অতিরিক্ত। কোন সময় সেটেলমেণ্ট বা জরীপ করার সময় শিবপুর গ্রামের যে অংশটুকু বাদ পড়ে গেছল, সেই এলাকা বাদে শিবপুর [বাজি-শিবপুর ও হতে পারে] বলে পুরাতন দলিল পত্রে উল্লিখিত হয়েছে এ রকম মতপোষণ করেন হাওড়া কোর্টের প্রবীন আইনজ্ঞ অধ্যাপক বলাই চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বাজি-শিবপুর থেকে বাজে শিবপুরের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব।

বেলুড়—চতুঃসীমা—উত্তরে বালী, দক্ষিণে সালকিয়া, পূর্বে গঙ্গা পশ্চিমে লিলুয়া। পুরাতন দলিল পত্রে কৃষ্ণচন্দ্রপুর নামে

এলাকাটিকে পরিচিত হতে দেখা যায়। কৃষ্ণচন্দ্রসিংহ (লালাবাবু) ছিলেন পাইকপাড়ার রাজা। আরও পুরানো দলিলে বেলুড়িয়া বা বেলুড়্যা নামও পাওয়া যায়। অনুমান বালু + আড়ি (অর্থবেড়া) = বালুয়াড়ী = বেলুড়। কোন একসময় হয়ত বেলুড়ের দক্ষিণ দিয়ে বালীখালের ন্যায় একটি জল নিষ্কাশন পথ ভাগীরথী এবং সরস্বতী নদীকে যুক্ত করত। বেলুড় মঠের দক্ষিণ থেকে দাওনা-গাজির ঘাট পর্যন্ত ওড় খালের কিছু কিছু চিহ্ন এখনও দেখা যায়।

বেলুড়মঠ প্রতিষ্ঠাকালে সন্নিহিত অঞ্চলটি ছিল জঙ্গলময়। চার বছর ধরে বিদেশে বক্তৃতা করে স্বামীজি যা অর্থ পান তা রাখাল মহারাজকে দেন। সেই অর্থে বেলুড়ে গঙ্গার ধারে জমি কিনে মঠ প্রতিষ্ঠা করা হয়। মঠ প্রতিষ্ঠার সময় জঙ্গল কাটার জন্য যেসব সাঁওতালকে নিয়োগ করা হত স্বামীজি তাদের সান্নিধ্য পছন্দ করতেন। সাঁওতাল দলপতি কেষ্টা একদিন স্বামীজিকে বল্ল—'ওরে স্বামীবাপ তুই আমাদের কাজের সময় আসিস না। তোর সঙ্গে কথা বল্লে আমাদের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। আর বুড়ো বাবা (স্বামী অদ্বৈতানন্দ) আমাদের এসে বকে। এই কথায় স্বামীজির চোখ বেদনায় ছলছল করে উঠল। তারপর একদিন স্বামীজি তাদেরকে লুচি, তরকারী মেঠাই মণ্ডা খাইয়ে বল্লেন—"তোরা যে নারায়ণ! আজ আমার নর নারায়ণের ভোগ দেওয়া হল।"

বালী—হাওড়া সদর মহকুমার দ্বিতীয় শহর বালীর অবস্থান হাওড়া থেকে ৬ মাইল ও কলিকাতা থেকে ৭ মাইল দূরে গঙ্গার পশ্চিমতীরে ২২°১৯ উঃ অক্ষাংশে এবং ৮৮°২৩ পূঃ দ্রাঘিমাংশে, চতুঃসীমা—উঃ-বালীখাল, পূঃ-গঙ্গা, দঃ-হাওড়া মিউনিসিপ্যাল এলাকা পঃ—পূর্ব্ব-রেলপথ। রেললাইনের পশ্চিম থেকে বালী খালের দক্ষিণ শাখা পর্যন্ত জায়গাটি বালী ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্গত। হুগলী

জেলার উত্তর পাড়া একসময় ছিল বালী-গ্রামের একটি পাড়া এবং "গ্রহ বিপ্রকুলাচার" গ্রন্থে কোতরঙ্গ বালী নামটি পাওয়া যায়।

কোতরঙ্গ বালী আর কোট মৌড়েশ্বর,
ডাকপাক নবকুল ইহার ভিতর।

বালীনামের উৎপত্তি সম্পর্কে বলা হয় নদী—পশ্চিম থেকে পূর্বে সরে যাবার পর [কিংবা বন্যার জল সরে গেলে] চরের বালী পরিষ্কার করে আদি অধিবাসীরা যখন এখানে বাসস্থান সংগ্রহ করে তখন তারা জায়গাটির নামকরণ করে বালী। কবিরাম প্রণীত সপ্তদশ শতকের ভৌগলিক গ্রন্থ "দিগ্বিজয়-প্রকাশ" এ জনপদটি বালুকঃ নামে উল্লিখিত হয়েছে যথা—

শিবপুরং সমারভ্য বালুকঃ হি দ্বিজপদ
শ্রীরামপুরং দিব্যং ভদ্রেশ্বরস্য সন্নিধো।

ভূতাত্ত্বিক গঠন অনুযায়ী বিশেষজ্ঞগণের সিদ্ধান্ত নদী গর্ভ হতে বালীগ্রামের উৎপত্তি দেড় হাজার বছরের আগে নয়। আদিশূরের আমলে পাঁচ জন ব্রাহ্মণের সংগে গৌতম-গোত্রীয় দশরথ বসু, সৌকালীন গোত্রীয় মকরন্দ ঘোষ, বিশ্বামিত্র-গোত্রীয় কালীদাস মিত্র, পুরুষোত্তম দত্ত ও বিরাট গুহ প্রমুখ পাঁচজন কায়স্থ এদেশে আসেন। তার মধ্যে কুলীন মকরন্দ ঘোষের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ নিশাপতি বালীতে বসবাস ও বালী সমাজের পত্তন করেন। মৌলিক দত্ত বংশীয়রাও বালীতে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। ১৮২০-এ শ্রীরামপুরের পাদ্রী ওয়ার্ডসাহেব উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠানগুলির এক বিবরণী তৈরী করেন, যাতে বালীর তিনটি সুখ্যাত চতুষ্পাঠীর অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উত্তরপাড়ায় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার [১৮৪৬] পর বালীর বাসিন্দাদের ইংরাজী শিক্ষার পথ সুগম হয়।

বিদ্যাসাগরের আশীর্বাদপুত বালী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। অপর দুটি প্রাচীন বিদ্যালয় ব্যারাকপুর মধ্য

ইংরাজী [১৮৬০] এবং বিভার্স টমসন স্কুল [১৮৮৫, বর্তমান নাম শান্তিরাম বিদ্যালয়]। ১৮৫৫-৫৬তে বর্তমান বেলুড় স্কুল প্রাঙ্গণে মিশনারীদের চেষ্টায় একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ম্যালেরিয়ার প্রকোপে ও ছাত্রাভাবে অল্পদিনেই বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৭০-এ যে বালিকা বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়, ১৮৮৭-তে তার নামকরণ হয় মেকলে বিদ্যালয়। ১২৬৩ সালের মাঘ সংখ্যায় উত্তর পাড়া পাক্ষিক পত্রিকায় লেখা হয়—"Bally" Government Aided school-এর কয়েকজন ছাত্র Junior Scholorship পরীক্ষায় উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সম্পাদক দ্বারা প্রথমে মনোনীত হইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ L. Klit সাহেবের নিকট আদেশ লিপি প্রাপ্ত হইয়াছেন"।

বালীগ্রামের ঈশ্বর মুখোপাধ্যায় বেন্টিকের দেওয়ান ছিলেন। সমাচার দর্পণে [১৮১২] প্রকাশ বালীর কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর পারসী দপ্তরের প্রধান মুন্সি ছিলেন এবং যোগ্যতার সংগে ১৮২২ পর্য্যন্ত এ চাকরী করেন। শ্রীচরণ, বীরেশ্বর ও শান্তিরামের নেতৃত্ব এবং ১৮৭৫ থেকে ৮০'র মধ্যে বালীতে সাধারণ সভার প্রতিষ্ঠা গ্রামটির উন্নতিকে তরান্বিত করেছে। ওয়েলিংটন ক্লাবের প্রতিষ্ঠা বৎসর ১৮৮৮। বালীতে গঙ্গায় বাচ খেলার শুরু ৮৮৯ থেকে।

পঞ্জিকা প্রস্তুত ও জ্যোতিষী চর্চায় বালীর ঐতিহ্য অবিস্মরণীয়। ১৮১৯'র সমাচার দর্পণে উল্লেখ আছে নবদ্বীপ, খানাকুল ও বালীতে পঞ্জিকা প্রস্তুত হয়। কুড়ি বছর পরে লেখা 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার অভিমত—"নবদ্বীপ অধিকারী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়বাহাদুরের অনুমত্যানুসারে ও বালীর পণ্ডিতগণের মতানুসারে সে সকল পঞ্জিকা প্রস্তুত তাহা পণ্ডিতেরা আদর করেন।" সন ১২৯৯ সালের [ইং ১৮৯২ -৯৩ সনাতন হিন্দু পঞ্জিকায় লেখা আছে প্রবীণ পঞ্জিকাকার বালী-গ্রামের শ্রীচন্দ্র বিদ্যানিধি গণিত]। গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকার শতবার্ষিকীতেও

উল্লেখ আছে বালীর শ্রীচন্দ্র বিদ্যানিধি পঞ্জিকা স্থাপনাবধি তাঁদের প্রধান গণক ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনিই এই গৌরবের শেষ অংশীদার।

"উনবিংশ শতকে বালী গ্রামের শিক্ষা ও সংস্কৃতির রূপ রেখা" প্রবন্ধে শ্রী শীতাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—৩০০ বৎসর পূর্বে আচার্য বংশের অচ্যুত পঞ্চানন অসাধারণ জ্যোতিষী পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া সরকারী বিবরণীতে উল্লেখ দেখিতে পাই। কিংবদন্তী আছে গ্রহরাজ শণিদেব তাঁহার বিদ্যা পরীক্ষার জন্য স্বয়ং তাহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। গত শতকের মধ্যভাগেও লক্ষ্ণৌ-এর নবাব ওয়াজেদ আলী খাঁ এই বংশের সাধকদের গণনায় সন্তুষ্ট হয়ে হাওড়ার চক্রবেড়িয়ায় এলাকায় জায়গীর দান করেন। বর্তমানে উহা পুরাতন জানবাড়ী নামে খ্যাত।

ভুঞেড়া—নিকটর্তী রেলষ্টেশন বাগনান। অনুমান মুঘলযুগে হুগলী জেলা থেকে হৃদয় নাথ ভুঞের পূর্ব পুরুষগণ ঐগ্রামের প্রথমবাসিন্দা। ভূঞের আড়া [উঁচু পাড়-জলনিকাশের হ'ক বা জমির সীমানা নির্দেশক হ'ক] থেকে গ্রামের নাম ভূঞেড়া। গ্রাম্য-দেবতা বুড়োশিব। পূর্ণাল গ্রামের জিতেন ঘোষেরা ছিলেন প্রথমে বুড়ো শিবের পূজারী। কোন কারণে সেই ঠাকুর ভুঞেড়া গ্রামে আসার পর পঞ্চগ্রামের দেবতা হিসাবে পরিগণিত হ'ন। গ্রামের পাশ দিয়া কোন সময় একটি গাঙ ছিল। তখন জল পথে যাতায়াত হ'ত।

মাজু—কলকাতা থেকে ২৪ মাইল এবং পেঁড়ো থেকে ৫ মাইল দূরে পূর্বে কৌশিকী নদী বা কানা দামোদর এবং পশ্চিমে কাঁছয়ার মাঠ মধ্যে মাজুগ্রামের অবস্থান। গ্রামটি উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্য মাজু এই তিন ভাগে বিভক্ত।

মেল্লক—অনুমান বিভিন্ন মেল [গোষ্ঠী]-ভুক্ত কুলীন ব্রাহ্মণদের বাস-থাকাতেই গ্রামের নাম মেল্লক। জমিদার মুকুন্দ প্রসাদ রায়-চৌধুরী কর্তৃক ১৬৫১-তে নির্মিত টেরাকোটা কাজ সমন্বিত আটচালা

ধরণের শ্রীশ্রীগোপাল জীউর মন্দিরটি প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদরূপে পরিগণিত।

মৌরী—হাওড়া থেকে ৭ মাইল দূরে অবস্থিত। দঃ পূঃ রেল-পথের একটি ষ্টেশন। ষ্টেশন থেকে দেড় মাইল দূরে মহীয়াড়ি গ্রাম। এখানকার জমিদার কুণ্ডু চৌধুরীদের গৃহদেবতা লক্ষ্মীজনার্দন। রাস উপলক্ষে গ্রামে মেলা বসে।

মুনসিডাঙ্গা—ডোমজুড় থানার অন্তর্গত মুসলমান প্রধান গ্রাম। এখানকার জুম্মা মসজিদ বিখ্যাত।

মহিষরেখা—বাগনান থেকে দু'মাইল দূরে দামোদরের তীরে অবস্থিত। মহকুমা সদর উলুবেড়িয়ায় স্থানান্তরিত হওয়ার আগে পর্যন্ত ইহা ছিল মহকুমা সদর।

মানকুর—সপ্তগ্রামের জমিদার রামেশ্বর রায়কে ১৬৭৩-এ আওরঙ্গজেব যে জমিদারী স্বত্ব দান করেন মানকুর গ্রাম তার মধ্যে একটি। অম্বিকাচরণ গুপ্তের "হুগলী বা দক্ষিণরাঢ়" গ্রন্থানুসারে হাওড়া জেলায় রূপনারায়ণ নদের তীরবর্তী স্থান, যার প্রধান কেন্দ্র ছিল এই গ্রাম। অষ্টাদশ শতকের কবি কৃষ্ণকিংকর তাঁর শীতলা মঙ্গল কাব্যে আত্মপরিচয় দান কালে বলেছেন মানকুরকে কেন্দ্র করে রূপনারায়ণ নদের দু পাশে হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলার বেশ কিছু বর্ধিষ্ণু গ্রাম মানকুর পরগণার অন্তর্গত ছিল।

মুগকল্যাণ—থানা বাগনান। গ্রামের প্রাচীন বর্ধিষ্ণু বংশ হিসাবে ঘোষালরা অন্যতম। প্রবাদ বহুপূর্বে উড়িষ্যার কয়েকটি পরিবারে বোবা [মুক] শিশুর জন্মের পর স্বপ্নাদেশ হয় কলিকাতায় কালিঘাটে পূজা দিলে শিশুরা রোগ মুক্ত হবে। কালিঘাটে পূজা দিবার উদ্দেশ্যে শিশুদের নিয়ে তাদের অভিভাবকগণ হাঁটাপথে কালীঘাটের উদ্দেশ্যে রওনা হলে এই গ্রামে এসেই থেমে যান। কালক্রমে শিশুরা রোগ মুক্ত হ'লে গ্রামের নাম হয় মুক কল্যাণ তারই অপভ্রংশ মুগকল্যাণ।

মণ্ডলঘাট—রূপনারায়ণ নদের পূর্বদিকে তমলুকের ঠিক বিপরীত

দিকে অবস্থিত প্রাচীন গ্রাম। তাম্রলিপ্ত বন্দরের সাথে সাথে ইহারও বাণিজ্য প্রাধান্য বিনষ্ট হয়। মুসলিম যুগে এই গ্রামের নামানুসারে একটি পরগণার নামকরণ হয়। আইন-ই আকবরী অনুসারে মণ্ডলঘাট পরগণার রাজস্ব ছিল ৯,০৬,৭৭৫ দাম। ইউরোপীয় নাবিক-বণিক-গণের রচনায় রূপনারায়ণ নদের একাংশকে মণ্ডল ঘাট নদী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

মানসিংহপুর—বড়গাছিয়ার একমাইল দক্ষিণপূর্বের এই গ্রামে উড়িষ্যা অভিযান কালে গৌরীগঙ্গা নদীর দু'পাশে ছাউনি করে মানসিংহ কিছুকাল বাস করেছিলেন বলেই গ্রামটির এইরূপ নামকরণ।

মাকড়দহ—ডোমজুর থানার অন্তর্গত গ্রামটির লৌকিক নাম মাকড়দা। হাওড়া ষ্টেশন থেকে ৬৩ নং বাসে মাকদার বাজারে নামলেই বাঁদিকে দেখা যায় গ্রামের অধিষ্ঠাত্রীদেবা মাকড়চণ্ডীর মন্দির। ফাল্গুন মাসের দোল পূর্ণিমার পর পঞ্চমী তিথিতে হয় মাকড়চণ্ডীর পঞ্চম দোল। গ্রামের চৌধুরী বংশের প্রতিষ্ঠাতা রামেশ্বর চৌধুরী কোনা থেকে এসে এই গ্রামে বসবাস করতে থাকেন। পুরাণো দলিলে গ্রামটির নাম রামেশ্বরবাটী বলেও উল্লিখিত হয়েছে। রামেশ্বরবাবু বালী থেকে রাজেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়কে এনে মাকড়চণ্ডীর পূজক নিযুক্ত করেন। রামেশ্বর চৌধুরীর জমিদারী পরবর্তীকালে মাহিয়ারী কুণ্ডু-চৌধুরীরা কিনে নেবার পর এই বংশের রামকান্তকুণ্ডু ১২২৮ সালে দেবীর বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করান। ১৩৭৫ সালে বিড়লা জনকল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক মন্দিরটি সংস্কৃত হয়।

দেবীমূর্তি সম্পর্কে প্রবাদ, পূর্বে মাকড়চণ্ডীর মূর্তিটি ছিল বিশাল। মূর্তির বিশালতায় বিব্রত পূজকের তিরষ্কারে দেবী পাতাল প্রবেশে উদ্যতা হলেন। পরে পূজকের ক্রন্দনে ও আকুল প্রার্থনায় বর্তমান রূপটুকুই অবশিষ্ট রইল। অনেকে বলেন, মাতৃপুর থেকে মাপুরদহ অপভ্রংশের মাকড়দহ নামটির উৎপত্তি। আর একটি কিংবদন্তী—একটি বিশালকায় মকর মন্দির সম্মুখস্থ সরস্বতী নদী গর্ভে বাস করত।

মকর বাসকারী দহ কালক্রমে মকরদহ থেকে পরিবর্তিত হয়েছে মাকরদহে।

রাজগঞ্জ—পাটকলের জন্য বিখ্যাত। অতীতে কলকাতা থেকে ষ্টীমার যোগে যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল।

রসপুর—দামোদর নদতীরবর্তী আমতা থানার অন্তর্গত আমতা থেকে প্রায় ৪ মাইল দূরে অবস্থিত রসপুর গ্রামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় কবিচন্দ্র রামকৃষ্ণ রায়ের শিবায়ণ কাব্যে। বালিয়া পরগণার অন্তর্গত এই গ্রামটির ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ছিল একটি প্রসিদ্ধ শিবায়নকেন্দ্র। গ্রামসংলগ্ন দামোদরের পরপাড়ে ছিল মণ্ডলঘাট এবং উত্তর পূর্বে ভুরশুট পরগণায় অবস্থান। এক সময় দামোদরের কিয়দংশ রসপুর নদী নামে পরিচিত ছিল। রসপুরের রায়পাড়ায় প্রায় ৩০০ বছরের প্রাচীন রায় বংশের রাধাকান্ত জীউর মন্দির আছে। অনেকে গড়চণ্ডী দেবীকেই রসপুরের প্রধান গ্রাম্য দেবীর সম্মান দেন। দ্বিভুজা গড়চণ্ডী দেবীর সামনে আছেন ষষ্ঠী, কালী, পঞ্চানন, মনসা, শীতলা, জয়চণ্ডী ও দক্ষিণরায়। গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে কায়স্থ ও মাহিষ্যগণই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

রামকৃষ্ণপুর—হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত গঙ্গাতীরের রামকৃষ্ণপুর চড়া ঘাট এক সময় চালের আড়তের জন্য বিখ্যাত ছিল। রামকৃষ্ণপুর চাঁদপাল ঘাট লঞ্চ সার্ভিস আছে। ১৩০৫ সালে স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণপুর লেনে নবগোপাল ঘোষের বাড়ীতে রামকৃষ্ণ-দেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এসে রামকৃষ্ণ প্রণাম মন্ত্রটি রচনা করেন।

বাদশাহ ফারুখশিয়ারের ফরমান অনুযায়ী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে লীজ প্রদত্ত এই গ্রামের খাজনা ছিল ১৬৯ টাকা ১৫ আনা ৩ পাই। আন্দুলের মল্লিকরা ১৮২২-এ হাওড়া শহরের দশ আনা অংশের মালিক হরিশচন্দ্র রায়ের কাছ থেকে রামচন্দ্রপুর অঞ্চলটি বন্দোবস্ত নেন। সে সময় ডাঃ প্রবোধ ব্যানার্জী রোড জি, টি রোড সংযোগস্থলে ছিল ১২/১৪

ফুট উঁচু ব্যাটেলমেন্ট নক্সা করা দু'টো থাম। বেড় ছিল ১৪ ফুট। থাম দু' টো পেড়িয়ে গেলেই দক্ষিণে ছিল জমিদার বাড়ী, উত্তরে তাদের বাগান—যার নাম ছিল লিচু বাগান আর পূর্বদিকে হুগলী আটা কল যেখানে তে-মাথার সৃষ্টি করেছে সেখানেও ছিল অনুরূপ দুটো থাম। পুরাতন জমিদার বাড়ীর চৌহদ্দীর মধ্যেই বর্তমান পুলিশ সুপারিনটেন্‌ডেন্টের কোয়াটার। ১৮৮৪-তে এই বাগান আর বাড়ী কলিকাতার মতিলাল শীলের কাছে বাঁধা রাখা হয়। বন্ধক দেওয়া টাকা আদায় না হওয়ায় কালক্রমে শীলেরা সম্পত্তিটির দখল নেন।

রতনপুর—থানা শ্যামপুর। কুলগাছিয়া অথবা বাগনান রেলষ্টেশন দিয়ে রিক্সায় অথবা গ্রাম থেকে দু'মাইল দূরস্থ দামোদর নদী দিয়ে নৌকাযোগে যাতায়াত করা যায়। কৃষিপ্রধান গ্রাম। চৈত্রসংক্রান্তিতে রতনমালা দেবীর বার্ষিক পূজা ও শিবের গাজন হয়। রতনমালা দেবীর নামানুসারেই গ্রামের নামকরণ হয়েছে। দেবীর একহাতে খড়্গ অপর হাতে বরাভয় পায়ের নীচেয় শিব, দু'পাশে দুই ভৈরব এবং জয়া ও বিজয়া। দেবীর পাকা মন্দির বর্ধমানের রাজাদের তৈরী। রতনমালার গাজনে দুইদিন ব্যাপী মেলাতে আট-দশ হাজার নরনারীর সমাবেশ হয়।

লিলুয়া—হাওড়া থেকে ৩ মাইল দূরে। পূর্ব রেলপথের ষ্টেশন ও রেল কারখানা আছে। এক সময় রেলে কর্মরত বহু ইংরাজ কর্মচারীর বাস ছিল এবং মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের বাগান বাড়ী ছিল। যে জায়গায় এখন রেলের কারখানা আগে সেটি বেলুড় গ্রামের অন্তর্গত ছিল। ষ্টেশন সন্নিহিত একটি জলা লিলুয়ার বা নেলোর জলা নামে পরিচিত ছিল।

শালকিয়া—বাদশাহ ফারুখশিয়ারের ফরমান অনুযায়ী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে লীজ প্রদত্ত হাওড়ার পাঁচটি গ্রামের মধ্যে শালকিয়া একটি। বোরো ও পাইকান এই দুই পরগণায়

বিভক্ত গ্রামটির খাজনা ধার্য্য করা হয়েছিল ২৭৭ টাকা ১৪ আনা ৩ পাই।

ইংরাজ আমলের আগেও এই গ্রামে একটি দেওয়ানী আদালত ছিল। ঘুসুড়ি, ভোটবাগান, মালীপাঁচঘরা, বামনগাছি, পিলখানা প্রভৃতি এই গ্রামের এক একটি পাড়া। ঘুসুড়িতে গঙ্গার বুকে একটি বড় চড়া আছে। এই ধরণের চড়া পড়েই সরস্বতী নদী মজে গেছে। ১৮০০ থেকে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে গঙ্গা এই অঞ্চলের প্রায় ১১০ ফুট পূর্বে সরে গেছে। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি পুকুর কাটবার সময় ১৫ ফুট নীচের ডিঙ্গি নৌকা এবং দড়ি নোঙ্গর পাওয়া গিয়েছিল। ১৮৬১-তে ৩ ফুট নীচেয় পাওয়া গিয়েছিল গাছের সন্ধান।

শ্যামপুর—তিনদিকে দামোদর, রূপনারায়ণ ও ভাগীরথী বেষ্টিত জেলার সর্ব দক্ষিণ প্রান্ত।

শিবগঞ্জ—শ্যামপুর থানার শিবগঞ্জ গ্রামের পূর্বনাম কাশিমনগর। উনিশ শতকের মাঝামাঝি দুর্ভিক্ষ ও বন্যায় গ্রামটি জন শূন্য হয়ে পড়ে। পরে এলাকাটি নারীট-গাজিপুরের জমিদার শিবরায়ের জমিদারীর অন্তর্ভূক্ত হওয়ার পর তার নামানুসারে নুতন গঞ্জের পত্তন হয়—শিবগঞ্জ।

শশাটি—রূপনারায়ণ নদ তীরবর্তী প্রাচীন গ্রাম। শ্যামপুর থানায় ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তনকারীদের অন্যতম শ্রী গোবিন্দ চন্দ্র মণ্ডল এই গ্রামে প্রথম উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

শালিমার—বেতাইতলার দক্ষিণে শিবপুরের দক্ষিণ প্রান্তস্থপল্লী। প্রাচীন বেতোড় বন্দরের সম্মুখস্থ সরস্বতী নদীর মজা চড়ায় শালিমারের উদ্ভব। এলাকাটির পূর্ব নাম মাঝের হাট।

এখানে বোটানিকেল গার্ডেনের প্রতিষ্ঠাতা কর্ণেলকিড ১৬৬৭-তে তৈরী লাহোরের শালিমার বাগের অনুরূপ একটি বাগানবাড়ী নির্মাণ করান। পারস্য দেশীয় স্থপতিবিদ শালিমার বাগের নির্মাতা শা আলী মর্দ্দান খাঁর নামানুসারেই 'শালিমার' নামকরণ। কলিকাতাস্থ সুপ্রীম-

কোর্টের বিচারপতি স্যার জন রয়েড এখানকার "শালিমার-হাউস"-এ থাকতেন। বাংলার শেষ ডেপুটি গভর্ণরও এখানে বাস করতেন। পরে একই বাড়ীতে স্থাপিত হয় শালিমার রোপওয়ার্কস।

শিবপুর—শিবপুরের উত্তরে রামকৃষ্ণপুর, দক্ষিণে সাঁকরাইল পশ্চিমে সাঁতরাগাছি, পূর্বে ভাগীরথী। অঞ্চলটি মূলত ভাগীরথীর পলিমাটির কল্যাণেই বর্তমান রূপ পেয়েছে। কিড সাহেবের বিবরণী এবং মার্কউডের মানচিত্র অনুযায়ী সপ্তদশ শতাব্দীর অষ্টম দশক পর্য্যন্ত শিবপুর ছিল বেতোর গ্রামের অন্তর্গত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আন্দুলের রামচন্দ্র রায় এই এলাকায় শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করার পর থেকেই শিবপুর নামের উৎপত্তি। রায়মশাই লর্ড ক্লাইভ ও ভ্যান্সিটার্ট-এর দেওয়ানী করে প্রচুর ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হন।

১৮৭৬-এ প্রকাশিত ষ্ট্যাটিসটিক্যাল একাউন্ট অব্ হুগলী গ্রন্থে লেখা আছে—ফোর্ট উইলিয়ামের বিপরীত দিকে অবস্থিত শিবপুর গ্রামটি বর্তমান শতকের শুরুতে ছিল নগণ্য, কিন্তু এখন এটি শহরে পরিণত হওয়ার পথে। কলকাতার সরকারী অফিসের কেরানীরাই প্রধানত এখানকার বাসিন্দা।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ারের পাতায় লেখা আছে—'Sibpur—subarb of Howrah Town, Hugli District, Bengal, situated in latitude 22.34 west and longitude 88ত 16 east opposite Fort william. The place has grown since the begining of the present century from a small village into a flourising town, inhabited chiefly by government and other clerks and by labourers employed in the various mills and foundries on the Cast Indian Railway works."

মামার বাড়ীর স্মৃতিচারণা প্রসঙ্গে গ্রামটি সম্পর্কে ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেগেছেন—পঞ্চাশ বৎসর আগে এ অঞ্চলে একটি বর্ধিষ্ণু ভদ্র গ্রাম ছিল;—যে সংস্কৃতি বাঙ্গালা দেশকে তাহার বৈশিষ্ট্য দিয়াছে সেই সংস্কৃতির হাওয়া এখানে পুরামাত্রায় বহিত—সেই সংস্কৃতির একটি ছোট-খাট কেন্দ্র ছিল শিবপুর গ্রাম।

শাঁকরাইল—আন্দুল ষ্টেশনের প্রায় ২ মাইল দূরে সরস্বতী-হুগলী নদীর সঙ্গম স্থলে অবস্থিত বর্ধিষ্ণু গ্রাম। দক্ষিণ পূর্ব রেলপথের একটি ষ্টেশন। প্রবাদ, চৈতন্যদেবের পুরী যাত্রাকালে গ্রামের অধিকারীগণ শঙ্খে রোল [রোল = আওয়াজ] তোলায় গ্রামের নাম হয় শঙ্খরোল অপভ্রংশে শাঁখরাইল।

স্থানটি একসময় বেশ বড় ব্যাবসা কেন্দ্র ছিল। গ্রামের পূর্ব দিকে সরস্বতী নদী ছিল প্রবল বেগে বহমানা। এখন যেখানে থানা সরস্বতী-হুগলী নদীর সঙ্গম স্থলে তখন প্রতিসপ্তাহে নৌকায় হাট বসত। এইসব নৌকায় আসত বড় বড় পাকা কুমড়া, তরমুজ লবণ প্রভৃতি যেগুলি পাইকারী দরে বিক্রীত হত। শীতকালে পূর্ববঙ্গ থেকে আসত নৌকা ভর্তি কই, মাগুর, সিঙ্গি প্রভৃতি জাওলা মাছ। বিক্রী হত এক বা দু'আনা খুঁচি [বাঁশের চেঁচাড়ির কুনকে]। এক খুঁচিতে এক থেকে দেড় কেজি ওজনের সবরকম মাছ থাকত, গ্রামে ধানের আড়ৎ বা গোলাও ছিল। নৌকা ব্যতীত যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম ছিল গোরুর গাড়ী।

গ্রামস্থ বিশালাক্ষী দেবীর মন্দিরটির নির্মাতা রাজা মহামাণিক্য মদন মোহন রায়, যিনি হেষ্টিংসের সমসাময়িক এবং বর্ধমান রাজার দরপত্তনি তহশীলদার ছিলেন। বিশালাক্ষীদেবীর পাকা মন্দির কবে নির্মিত হয় জানা যায় না, তবে সংস্কারের সময় লেখা আছে ১১৭৯ সাল। শাঁকরাইল জুটমিলের আশেপাশে ইটনাপুকুর, বিশালাক্ষী পুকুর, গজমাতা পুকুর, চাপাপুকুর

নেলপুকুর, কামারপুকুর প্রভৃতি বড় বড় পুকুরগুলি মদন রাজাই খনন করিয়েছিলেন এবং নিকটেই ছিল তাঁর রাজ বাড়ী ও মদন রাজার বেড় নামে একটি দীঘি যার মধ্য হ'তে আবির্ভূতা হ'ন দেবী বিশালাক্ষী। প্রবাদ কোন যুদ্ধে পরাজিত রাজা ও রানী মনের দুঃখে ও ইজ্জৎ বাঁচাবার জন্য নেল পুকুরে ডুব দেন। শাঁকরাইল থেকে ২।৩টি গ্রাম দুরে হাতিশাল গ্রামে মদন রাজার হাতি, ঘোড়াঘাটায় ঘোড়া এবং মহিষগোঠ গ্রামে মোষ থাকত। রাজা মদন রায়ের প্রথমা স্ত্রী ছিলেন রামভক্ত, তাঁর একমাত্র কন্যা কাত্যায়নীর বিয়ে হয় সাঁতারাগাছি নিবাসী ও রামরাজা'র পূজার প্রবর্ত্তক অযোধ্যা রামের পিতামহ চন্দ্রশেখর চৌধুরীর সংগে। এই বিবাহে কোন সন্তান না হওয়ায় চন্দ্রশেখর দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। সেই দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রের দুই পুত্র অযোধ্যা রাম ও শিবরাম। অযোধ্যারাম সাঁত্রাগাছিতে এবং শিবরাম পায়রাটুঙ্গীতে বসবাস করতে থাকেন।

বেলভেডিয়ার জুট মিল নামে এ্যাণ্ড্রু ইয়ুলএর একটি জুট মিল শাঁকরাইল গ্রামে ছিল। পঞ্চম জর্জ এই জুট মিল পরিদর্শন উপলক্ষে এখানে আসেন। তাঁর আগমনের সুবিধার জন্য গঙ্গাতীরে যে জেটি-টি নির্মাণ করা হয় তা আজও র্তমান। শাঁকরাইল অভয়চরণ হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠা ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে জমিদার নৃপেন্দ্র নারায়ণ ঘোষ এবং শিক্ষাব্রতী সূর্য্যকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায়। এই বৎসরের Class VII-এর ছাত্র চণ্ডীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশ াজও জীবিত। শাঁকরাইল বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীনন্দলাল াস মহাশয় গ্রামের শিক্ষা প্রসার সহ বহু জনহিতকর কার্য্যের সহিত যুক্ত। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত শাঁকরাইল ইন্দিরা ক্লাব গ্রামের একটি পুরাতন সংস্থা।

সিংটি—জেলার উত্তর-পশ্চিমে কানা দামোদর তীরস্থ পুরাতন গ্রাম। নিকটেই শিবপুর নামে একটি গ্রাম আছে। গ্রামের এক মাইল দুরে দামোদর নদ। গ্রামে বামুন পাড়া, খাঁ পাড়া, হাড়ী-

পাড়া, শোলাংকী পাড়া প্রভৃতি অনেক পাড়া আছে। মাঘ মাসে বসে প্রায় সাতশত বছরের পুরানো ভাই খাঁ পীরের উৎসব ও মেলা।

প্রবাদ, ভুরিশ্রেষ্ঠরাজ রুদ্রনারায়ণ পাঠান সর্দার কতলু খাঁ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করে সিংহবাহিনী দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। সিংহ থেকেই গ্রামের নাম প্রথমে সিংহটি কালক্রমে সিংটি হয়।

সারেঙ্গা—শাঁকরাইল থানার অন্তর্গত ভাগীরথী নদী তীরবর্ত্তী গ্রাম। জনশ্রুতি, নদীপথে যাবার সময় একজন মুসলমান সা রং কোন কারণে ডাঙ্গায় নামার পর এই গ্রামেই মারা যান। সেই সারে: গাঁ থেকে সারেঙ্গা নামের উৎপত্তি।

সামতাবেড়—রূপনারায়ণতীরস্থ গ্রামটি অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শেষ জীবনের বাসস্থান। পাশেই পানিত্রাস গ্রামে শরৎ স্মৃতি মন্দির আছে। এখানে বার্ষিক শরৎ মেলা হয়।

সাঁতরাগাছি—হাওড়া শহরের পশ্চিমে অবস্থিত এই গ্রামে ঐতিহ্য সম্পন্ন চৌধুরী বংশের বাস প্রায় পৌনে তিনশ বছরের। চৌধুরী বাড়ীর মেয়েদের বিবাহ -পুর্ববঙ্গাগত সান্যাল, লাহিড়ী, ভাদুড়ীদের সাথে হতে থাকায় গ্রামে বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের বসবাস বৃদ্ধি পায়।

সেওড়া—রংপুর কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডাঃ ডি, এন, মল্লিকের জন্মস্থান।

সারদা—আমতা থানার কুশবেড়িয়া অঞ্চলের অন্তর্গত কৃষি প্রধান গ্রাম। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র এই গ্রামের কেশরকুনী আচার্য বংশে বিবাহ করেন। একসময় গ্রামটি ছিল মণ্ডলঘাট পরগণার অন্তর্গত।

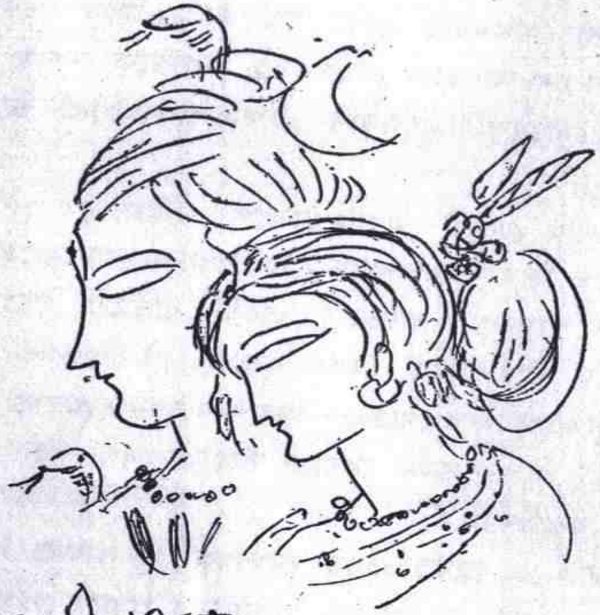
হরিনারায়ণপুর—বাগনান থানার মুগকল্যান গ্রামের নিকট

অবস্থিত। বাগনান রেল ষ্টেশনের প্রায় মাইল তিনেক দক্ষিণের এই গ্রামটি একসময় নদী-বন্দর ছিল বলে অনুমান। গ্রামের দম্‌দমা নামক একটি উঁচু ঢিবি খুঁড়ে প্রাক-পাল যুগের কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে। আবার খ্রীষ্টিয় দ্বাদশ শতকের বিষ্ণুমূর্তি এবং লিপি সম্বলিত পোড়া মাটির ফলকও পাওয়া গেছে যেগুলির এখনও পাঠোদ্ধার হয়নি। গ্রামে ত্রিভূজাকৃতি কালচে-সবুজ রঙের একটি মাত্র নবাশ্মর আয়ুধ [Neolith celt] পাওয়া গেছে। এটির গঠন বৈশিষ্ট্য ও কারীগরী সাদৃশ্য দেখে অনুমান করা যেতে পারে যে অস্ত্রটির নির্মাতা নব্যপ্রস্তর যুগের অধিবাসীরা।

গ্রামে ফাল্গুনী পূর্ণিমা'য় সিংহবাহিনী দেবীর মেলা হয়।



বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দ



"কুহেলী গেল, আকাশে আলো
দিল যে পরকাশি
ধূর্জটির মুখের পানে
পার্বতীর হাসি।"
— রবীন্দ্রনাথ

শারদীয়া চতুর্থী
১৩৮০
৯ অক্টোবর ১৯৭৩

হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে
সাদরে ... স্মরণে

পঞ্চম অধ্যায়

স্মরণীর ঘটনা—বরণীয় নাম

ওয়ারেন হেষ্টিংস যখন বাংলার গভর্ণর, তখন শিবপুর দক্ষিণ পাড়ায় এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাস ছিল, নাম গিরিশ তর্কপঞ্চানন। ভু কৈলাশ রাজবাড়ীর জনৈক কর্তা ছিলেন তর্কপঞ্চাননের শিষ্য। একদিন গুরুপত্নীর অনুরোধে শিষ্য এক লাখ টাকা কতটা গুরুমাকে সেটি দেখাবার জন্য গুরুদেবের মাটির দাওয়ায় এক লাখ টাকা সাজান। টাকা সাজান শেষ হ'লে গুরুমা তা দর্শন করে শিষ্যকে টাকাগুলি ফেরৎ নিয়ে যেতে বলেন। শিষ্য সবিনয়ে জানালেন শুধুমাত্র দেখাবার জন্য নয়, গুরুমাকে দানের উদ্দেশ্যেই এ'টাকা আনা। এমন সময় তর্ক পঞ্চানন বাড়ী ফিরে এ স এসব কথা শুনে শিষ্য ও পত্নী দু'জনকেই ত্যাগ করতে উদ্যত হলেন। শিষ্যের অনেক অনুনয়ে সন্তুষ্ট হ বার পর টাকাগুলির যাতে সদ্ব্যয় হয় সেজন্য নির্দেশ দিলেন ঐটাকায় শিবপুর মন্দিরতলার শিবমন্দির এবং ভোজ গঙ্গার ধারে একটি চতুষ্পাঠী ও অতিথিশালা নির্মাণের। সেদিনের ভোজগঙ্গা-ই আজকের ভোজগঙ্গা পুকুর—এ অভিমত কৈপুকুর নিবাসী শ্রীবিজয় মজুমদারের।

আর এক ব্রাহ্মণ নরসিংহদেব চক্রবর্তীর জমিদার হওয়ার কাহিনীটি আরও চমকপ্রদ। কথিত আছে নবাব ভাগীরথী বেয়ে সসৈন্যে চলেছেন যুদ্ধ যাত্রায়। গঙ্গায় স্নানরত নরসিংহদেব হাত তুলে নবাবকে আশীর্বাদ জানালেন যুদ্ধে জয়লাভের পর শ্রদ্ধানত নবাব নরসিংহদেবকে কিছু উপহার দিতে চাইলে নরসিংহদেব তা নিতে অস্বীকার করেন। নবাব সরকার থেকে তখন উত্তর ও দক্ষিণ ব্যাঁটরা এবং ইছাপুর গ্রাম তিনটি প্রতিটি গ্রাম বার্ষিক একটাকা খাজনায়

নরসিংহ দেবকে পত্তনী দেওয়া হয়। ব্যাঁটরায় নরসিংহদেব গোবিন্দ দেবের একটি মন্দির নির্মাণ করান। সংস্কারের অভাবে মন্দিরটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলে গোবিন্দদেব শিবপুরের ভট্টাচার্য পাড়ায় স্থানান্তরিত হ'ন। কারণ এখানকার ভট্টাচার্যেরা নরসিংহ দেবের বংশধর।

প্রায় দেড়শ বছর আগে বালীর আচার্যবংশের একজন জ্যোতিষবিদ্ হাওড়া শহরের চক্রবেড়িয়ায় বসবাস শুরু করেন। এই বংশের জনৈক রামধন এবং তাহার পুত্র চন্দ্র মানব জীবনের ভূত-ভবিষ্যৎ গণনা করতেন। দক্ষিণা ছিল একটি পয়সা একটি সুপ[রি এবং এক কুনকে [পাঁচ ছটাক] চাল। পরবর্তীকালে আর এক জ্যোতিষী এই এলাকায় বাসা বাঁধেন। এই পরিবারের পরবর্তী কর্তার নাক চ্যাপটা থাকায় সাধারণের কাছে তিনি খাঁদাজান নামে অভিহিত হ'ন। জনশ্রুতি হিন্দু ব্যতীত বহু ইউরোপীয়ান, ইউরেশিয়ান এবং ইসলাম ধর্মাবলম্বীগণও ভূত ভবিষ্যৎ জানতে এনার কাছে আসতেন।

লর্ড ডালহৌসীর শাসনকালে চক্রবেড়িয়ার কিছু অংশের নাম ছিল বেলকুলী। ডালহৌসী বেলকুলীতে অযোধ্যার নির্বাসিত নবাব ওয়াজিদ আলী শাকে একটি ফুলের বাগান উপহার দেন। অপুত্রক নবাবের মৃত্যুর পর সরকার আবার জমিটি অধিগ্রহণ করেন।

হাওড়া জেলার "রাম" নামধারী চার বিখ্যাত ব্যক্তিকে নিয়ে এক সময় ছড়া বাঁধা হয়েছিল—

ধনে বড় রাম গোবিন্দ মণ্ডল, রামজয় কেরানী মানে,
সং-এ শ্রেষ্ঠ রাম বসু, রামকিশোর রায় দানে।

রামগোবিন্দ মণ্ডল ছিলেন জয়পুর গ্রাম নিবাসী ধনাঢ্য জমিদার। বর্ধমান রাজের কেরাণী রামজয় বাবুর নিবাস ছিল রাউতারা গ্রামে। শালিখা নিবাসী রাম বসু সং-এর গান ও কবিতা রচনায় দক্ষ ছিলেন। দানশীল রামকিশোর রায়ের বাস ছিল তাজপুর গ্রামে।

হাওড়া এবং বঙ্গসাহিত্যাকাশের সূর্য ও চন্দ্র

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে আলোকিত বঙ্গসাহিত্যাকাশের প্রথম চন্দ্র বঙ্কিমবাবু এবং সূর্য রবীন্দ্রনাথ। এই চন্দ্রের ও সূর্যের আড়াল-আবডাল থেকে নয়, কাউকে মধ্যস্থ রেখেও নয়, একেবারে সোজাসুজি মুখোমুখি—প্রথম সাক্ষাৎকারটি হয়েছিল হাওড়া শহরে।

হাওড়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটরূপে বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে যখন হাওড়া ময়দানের কাছে ২১২, পঞ্চাননতলা রোডের [বর্তমানে দেশপ্রাণ শাসমল রোডের] একটি বাড়ীতে থাকতেন, তখনই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন. একথা তিনি 'জীবনস্মৃতি'তে লিখে গেছেন—'অবশেষে যখন হাওড়ায় তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তখন সেখানে তাঁহার বাসায় সাহস করিয়া দেখা করিতে গিয়াছিলাম।'

চন্দ্রের ও সূর্যের প্রথম সাক্ষাৎকারটি সাফল্য লাভ না করায় 'সাহস' করাটি যে দুঃসাহস দেখানোর পর্যায়ে পৌঁছেছিল, সেকথা স্বীকার করে রবীন্দ্রনাথ লেখেন ঃ

'দেখা হইল, যথাসাধ্য আলাপ করিবারও চেষ্টা করিলাম, কিন্তু ফিরিয়া আসিবার সময় মনের মধ্যে যেন একটা লজ্জা লইয়া ফিরিলাম। অর্থাৎ আমি যে নিতান্তই অর্বাচীন, সেইটা অনুভব করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, এমন করিয়া বিনা আহ্বানে তাঁহার কাছে আসিয়া ভাল করি নাই।' [জীবনস্মৃতি পৃষ্ঠা ১৩৯]।

১৮৮১'র ১৪ই ফেব্রুয়ারী বঙ্কিমচন্দ্র হাওড়ায় আসেন বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের ব্যক্তিগত সহকারীরূপে। পুনরায় ১৪, ২, ১৮৮৩-তে ড. ম্যাজিস্ট্রেট এবং ডেপুটি কালেক্টর রূপে এবং শেষবার ১০. ৭. ১৮৮৬ তে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট বা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বলে নয়, সাহিত্যসম্রাট বলেই রবীন্দ্রনাথ আগ্রহ

করে হাওড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। সেদিন নিরাশ হ'লেও সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ হাওড়া থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছিলেন। সেই সাহায্য এসেছিল হাওড়ার এক সাহিত্যসাধক অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী মারফৎ। অক্ষয় চৌধুরীর জন্ম আন্দুলের বিখ্যাত চৌধুরী বংশে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহপাঠী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু অক্ষয়চন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে তাঁর বাল্যবয়সের সাহিত্য-দীক্ষাদাতা বলে উল্লেখ করেছেন। 'ভারতী' পত্রিকা প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অক্ষয়চন্দ্রও ছিলেন। হাওড়া শহরের খুরুট [বর্তমানে নেতাজী সুভাষ রোডে] বাস করতেন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য। তিনি যখন সাপ্তাহিক হিতবাদীর প্রধান সম্পাদক, তখন সাহিত্য-সম্পাদকরূপে নিযুক্ত করেন রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথের তথা বাঙালা সাহিত্যের ছোটগল্প রচনার সূত্রপাত এই সময়ের 'হিতবাদী'তেই। ঘটনাকাল ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে।

বঙ্গসাহিত্যাকাশের আর এক চন্দ্র—শরৎচন্দ্র ব্রহ্মদেশ থেকে ফিরে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বাসা বাঁধেন হাওড়া শহরের শিবপুর অঞ্চলে। মাত্র একবারই হাওড়ার মাটিতে এই চন্দ্র—সূর্যেরও সম্মিলন ঘটেছিল।

হাওড়ায় শরৎচন্দ্র

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে রেঙ্গুন থেকে একমাসের ছুটি নিয়ে বাংলাদেশে হাওড়ার খুরুট রোড অঞ্চলে বসবাস করেন। এর পর ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ব্রহ্মদেশ ফেরৎ শরৎচন্দ্র বাসা বাঁধেন হাওড়া শহরের বাজে শিবপুর অঞ্চলে। নামে বাজে শিবপুর হ'লেও কাজে অঞ্চলটি শিবপুরেরই অন্তর্গত। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়া শহর ছেড়ে পানিত্রাসে যাবার আগের কয়েক মাস অবশ্য তিনি শিবপুরেরই ৪৯/৪, কালীকুমার মুখার্জী লেনে অবস্থান করেন।

শিবপুরে শরৎ জীবনের তিনটি সু-বিভক্ত স্তর লক্ষ্য করা যায়, (১) সাহিত্য-সৃষ্টি (২) রাজনীতির চর্চা (৩) সাহিত্য সভা-সমাবেশে যোগদান। প্রথমেই বলি সাহিত্য সৃষ্টির কথা যার শুরু অবশ্যই হাওড়ায় আসার আগেই, কিন্তু চরমোৎকর্ষ হাওড়া বাসকালেই। তাঁর শিবপুর থাকাকালীন প্রথমে প্রকাশিত হয়, বৈকুণ্ঠের উইল, অরক্ষনীয়া, তারপর ক্রমান্বয়ে শ্রীকান্ত ১ম পর্ব্ব, দেবদাস, নিষ্কৃতি, কাশীনাথ, চরিত্রহীন, স্বামী, দত্তা, শ্রীকান্ত—২য় পর্ব্ব, ছবি, গৃহদাহ, নারীর মূল্য, দেনাপাওনা। শেষ প্রশ্ন ও শ্রীকান্তের—৪র্থ পর্ব্বের লেখার সূচনাও হাওড়ার বাজে শিবপুরে থাকাকালীন. নাট্যকার শরৎচন্দ্র সেখানে 'ষোড়শী' নাটক লেখেন। বসুমতী কর্তৃক শরৎ গ্রন্থাবলী প্রকাশের সূচনাও এই সময়। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে অকসফোর্ড 'ইউনিভারসিটি প্রেস' শ্রীকান্ত'র—১ম পর্ব্বের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করলে শরৎচন্দ্রের আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভের পথ সুগম হয়। রোঁমারলা শ্রীকান্ত পড়ে অভিভূত হয়ে বলেন—লেখকের অবশ্যই নোবেল পুরস্কার পাওয়া উচিত। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কিছুদিন নির্মল চন্দ্রের সহযোগে "রূপ-রঙ্গ" নামক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তাঁর শিবপুর বাসের প্রথম পর্বে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্র নাথের সংগে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে। সেই সময়েই মামা উপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর খোঁজ খবর নিতে হাওড়ায় আসেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জগত্তারিণী স্বর্ণ-পদক পান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

শরৎচন্দ্র রাজনীতিতে যোগদান করেন ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে। কিছুকাল হাওড়া কংগ্রেসের সভাপতিও ছিলেন। জনসাধারণের রাজনৈতিক, সচেতনতার অভাবে বিরক্ত হ'য়ে একবার তিনি সভাপতির পদ ত্যাগ করেন। বস্তুতঃ শরৎচন্দ্রের রাজনীতি করা যতটা না কংগ্রেসের প্রতি আকৃষ্ট হলে তার চেয়ে বেশী দেশবন্ধুর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে। কিছুদিন সাহিত্য চর্চা বন্ধ রেখে রাজনীতি

করেছিলেন দেশবন্ধুর প্রভাবে ও প্রীতিবশে। তাঁর দেশবন্ধু প্রীতি শেষ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

হাওড়া শহর ছেড়ে পানিত্রাসে যাওয়ার সাথে সাথে রাজনীতির সংগে শরৎচন্দ্রের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়—যদিও পানিত্রাসের বাড়ীতে বিপ্লবীদলের বহু নেতার যাতায়াত ছিল। একরাত্রে বিপিন গাঙ্গুলী মশাই রাসবিহারী বোস-কে পাঠাবার উদ্দেশ্যে হাজার চারেক টাকা সংগ্রহের জন্য পানিত্রাসে গেলে শরৎচন্দ্র তাকে বড়বৌ ও ছোটবৌ অর্থাৎ হিরন্ময়ী দেবী এবং প্রকাশের বৌয়ের গয়নাগুলি দিয়াছিলেন—বাড়ীতে নগদ টাকা নাথা কায়।

বর্তমান লেখকের সংগে তিনজনের পরিচয় আছে—যাঁরা শিবপুরে থাকাকালীন শরৎচন্দ্রকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। এঁরা হ'লেন হাওড়া কোর্টের লব্ধ প্রতিষ্ঠ এ্যাডভোকেট, অধ্যাপক ও সাহিত্যিক শ্রীবলাই চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবপুরের দীনবন্ধু ইনষ্টিটিউশন [ব্রাঞ্চ]-এর প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ও কল্লোল যুগের সাহিত্যিক সন্ন্যাসী চরণ সাধুখাঁ এবং ব্যাঁটরা মধুসূদন পাল চৌধুরী স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক শ্রীঅযোধ্যা নাথ অধিকারী। এঁদের কাছে শুনেছি বাজে শিবপুর এসোসিয়েশন, শিবপুর ইনষ্টিটিউট, শিবপুর সাহিত্য সংসদ এবং পারিজাত সমাজের সাথে শরৎচন্দ্রের বিশেষ যোগাযোগ ছিল।

শিবপুরে থাকাকালীন শরৎচন্দ্র বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সাহিত্য শাখার সভাপতিত্ব করতে মুন্সিগঞ্জে [ঢাকা] যান। কাশী প্রভৃতি স্থানেও সাহিত্য সমাবেশে যোগ দেন যেগুলি বাদ দিয়ে স্থানীয় দু'একটি সভা—সমিতির কথাই এখানে আলোচনা করছি।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের শেষদিকে অর্থাৎ ১৩৩০ বঙ্গাব্দের ১৬ই আষাঢ় হাওড়া টাউন হ'লে শিবপুর ইন্‌ষ্টিটিউট একটি

সাহিত্য সভার আয়োজন করেছিলেন। সভায় শরৎচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন এবং "আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ" শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। একই মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎ চন্দ্রকে দেখবার জন্য সভায় বহু জন সমাগম হয়। কোন কোন জায়গায় লেখা আছে শরৎচন্দ্রের প্রবন্ধটি সভাপতির ভাষণ রূপে পঠিত। প্রকৃতপক্ষে প্রবন্ধটি হ'ল শিবপুর ইনষ্টিটিউটের সাহিত্য শাখার সভাপতির ভাষণ রূপে পঠিত। শ্রীসন্ন্যাসী চরণ সাধুখাঁ যিনি ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন, শিবপুরে থাকেন এবং শিবপুর ইনষ্টিটিউটের সংগেও যুক্ত ছিলেন তিনি আমায় জানিয়েছেন যে সেদিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র ছিলেন শিবপুর ইন্‌ষ্টিটিউটের সাহিত্য শাখার সভাপতি। বলা বাহুল্য শিবপুর ইন্‌ষ্টিটিউটের সাহিত্য বিভাগ, ক্রীড়া বিভাগ প্রভৃতি কয়েকটি বিভাগ ছিল।

প্রয়োজনবোধে আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ প্রবন্ধটির প্রথম দু'টি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করছি যার মধ্যে সন্ন্যাসীবাবুর বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে।

"শিবপুরের এই ক্ষুদ্র সমিতির সাহিত্য শাখার পক্ষ হইতে আপনাদিগের সংবর্দ্ধনার ভার একজন সাহিত্য ব্যবসায়ীর হাতে পড়িয়াছে। আমি আপনাদিগকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিতেছি। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই কয়েকটি সাহিত্যিক জমায়েত হইয়া গিয়াছে; তাদের আয়োজন ও আয়তনের বিপুলতার কাছে এই ক্ষুদ্র অধিবেশনটি আরও ক্ষুদ্র, কিন্তু আপনাদের পদার্পণে এই ক্ষুদ্র বস্তুটি আজ যে গৌরব লাভ করিবে তাহাকে কিছুতেই যে আর ছোট বলা চলিবে না, এই লোভই আমরা কোন মতে সংবরণ করিতে পারি নাই।

সমস্ত বিশ্বের বরণীয় কবি আজ আমাদের সভাপতি। অনেক কষ্টে তাঁহাকে সংগ্রহ করিয়াছি; শুধু কেবল তাঁহাকে মাঝখানে

পাইবার লোভেই নয়,—এই সভাপতি লইয়া অনেক ক্ষেত্রে অনেকেরই মর্ম্মপীড়ার কারণ ঘটে। আমরা তাই স্থির করিয়াছিলাম যে এমন এক ব্যক্তিকে আনিয়া হাজির করিব যাঁহার সর্ব্বোচ্চ স্থানটি লইয়া তর্ক না থাকে,—এই আনন্দ-উৎসবের মাঝখানে মর্ম্মদাহের যেন আর লেশমাত্র অবকাশ না ঘটে।"

১৩৩০ সালের ১৬ই আষাঢ় অর্থাৎ ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের পূজার ছুটির আগে শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের অধ্যাপক সুরেন্দ্র নাথ মৈত্র [খ্যাতনামা লেখিকা শ্রীমতী লীলা মজুমদারের মেশোমশায়] মহাশয়ের আহ্বানে ঐ কলেজে শরৎচন্দ্র একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

১৯২৭-এর ১৭ই সেপ্টেম্বর বাংলা ৩১শে ভাদ্র ১৩৩৪ সালে শিবপুর সাহিত্য সংসদের উদ্যোগে পালিত হয় প্রকাশ্যে প্রথম শরৎচন্দ্রের জন্মোৎসব। উপলক্ষ শরৎচন্দ্রের পঞ্চাশোত্তীর্ণ জন্মদিন পালন। সভা হয়েছিল ৪৯/৪ কালী কুমার মুখার্জী লেনে। এই উপলক্ষে "জন্মদিনের উপহার" নামে ৩২ পৃষ্ঠার একটি স্মরণিকা গ্রন্থও প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির প্রথম লেখা শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রশস্তি—'শতংজীব'। এছাড়া এতে আর যাদের লেখা আছে তারা হলেন যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় [পূর্ণিয়া] কুমুদ রঞ্জন মল্লিক, মোহিত লাল মজুমদার, রাধারানী দত্ত [পরে দেব] সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, গিরিজা কুমার বসু, জগদীশ গুপ্ত, প্যারী মোহন সেনগুপ্ত, হেমচন্দ্র বাগচী, সুধীর চন্দ্র রায়, সরোজ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ন্যাসী সাধু খাঁ, জগৎবন্ধু মিত্র এবং সুবোধ রায়। সবশেষে শিবপুর সাহিত্য সংসদের সদস্যগণ কর্তৃক স্বস্তিবাচন। গ্রন্থটির কয়েকটি লেখা কালিকলম থেকে পূর্ণমুদ্রিত। কবিদের ভিতর সন্ন্যাসী সাধুখাঁ ব্যতীত বেনী মিত্র লেনের নিবাসী কালিদাস নাগের মামা জগৎ বন্ধু মিত্র ছিলেন কল্লোল যুগের কবি এবং হাওড়াবাসী।

উদ্যোক্তাদের দাবী শরৎচন্দ্রের জন্মদিন উপলক্ষ্যে এইটিই প্রথম সভা।

স্মরণিকার শেষ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত শিবপুর সাহিত্য সংসদের সভ্যগণ কর্তৃক স্বস্তিবাচন এর প্রথম স্তবকটি ছিল নিম্নরূপ—

স্বস্তি বাচন

ওঁ সাহিত্য সাধক ঋষি ললিত কথাছন্দ
শরৎচন্দ্র দেবতা শুভ জন্মবাসর উৎসবে বিনিয়োগ—

হে সৌম্য আপনি ১২৮৩ সালে ৩১শে ভাদ্র অশ্লেষা নক্ষত্রান্বিত ত্রয়োদশী তিথিতে এই অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সে দিন বুঝি অন্তরীক্ষে দেবতারা আনন্দ পুলকিত আঁখি নত করিয়া ধরীত্রির পানে চাহিয়াছিলেন। যেদিন এই মহামানবের উদ্ভব হয় সেই দিন জগৎবাসীর পক্ষে পরম স্মরণীয় দিন। তাঁরই স্মৃতি পূজায় আমরা আপনাদিগকে ধন্য কৃতার্থমন্য জ্ঞান করিতেছি।

এর আগে শিবপুর সাহিত্য সংসদ ১৩৩৩ সালের ফাল্গুন মাসে অর্থাৎ ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী প্রবোধলাল মুখোপাধ্যায়ের জি, টি, রোডের বাড়ীতে প্রথম শরৎ সম্বর্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বিজয়চন্দ্র মজুমদার। কলিকাতা থেকে অনেক সাহিত্যিক এবং সম্ভবতঃ মোহিত লাল মজুমদার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শিবরাম চক্রবর্তী প্রভৃতিও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। শরৎচন্দ্র পানিত্রাস থেকে নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে এসে সভায় উপস্থিত হন।

১৯৩৩-এ অর্থাৎ ৩১শে ভাদ্র ১৩৪০ সালে হাওড়ার তৎকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান পারিজাত সমাজের উদ্যোগে হাওড়া টাউন হলে শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। উপলক্ষ্য তাঁর অষ্ট-পঞ্চাশৎ জন্ম দিবস পালন। সভাপতি ছিলেন হাওড়া পৌর সভার তৎকালীন উপ-পৌরপ্রধান খ্যাতনামা ব্যবহারজীবি খগেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায়। সভায় শরৎ চন্দ্রকে যে অভিনন্দন পত্র দেওয়া হয়, সেটির রচয়িতা ছিলেন—প্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে ব্যোমকেশ অধিকারী। অভিনন্দন পত্রটির কিছু অংশ হ'ল—

পারিজাত সমাজের অন্যতম সম্মানিত সদস্য অপরাজেয় কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের করকমলে—

হে বানীর বরপুত্র।

অতীত ভাদ্রের এক সংক্রান্তিতে জন্মগ্রহণ করিয়া তুমি ভাদ্র সংক্রান্তিকে স্মরণীয় করিয়া তুলিয়াছ। প্রতি "সংক্রান্তি-সম্মিলনে" পারিজাত সমাজে আনন্দধারা ক্ষরিত হইয়াছে, কিন্তু আজ এই ভাদ্র সংক্রান্তিতে আমাদের মাঝখানে তোমাকে পাইয়া আমরা ধন্য হইলাম তোমার অষ্টপঞ্চাশৎ জন্মদিবসের উপলক্ষ্য হইতে পারিয়া আমাদের মিলন অনুষ্ঠানও পরিপূর্ণ হইল।

তোমারই আলেখ্য দর্পণে বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীকে চিনিলাম। বাল্যে কৈশোরে, যৌবনে ও বার্ধ্যক্যে বাঙালী নর-নারীর বিভিন্ন বিচিত্র রূপ দেখিয়া জানিলাম—এই আশ্চর্য পৃথিবী অপেক্ষাও অদ্ভুত মানুষের চরিত্র। হে সত্যদ্রষ্টা, তোমায় নমস্কার।

ভাদ্র সংক্রান্তি মিলন ১৩৪০ — তোমার গুণমুগ্ধ

[১৩৭ সংখ্যক বাসর] — পারিজাত সমাজের সভ্যগণ।

৭৫, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া।

মঞ্চে ও চলচ্চিত্রে শরৎ-কাহিনীর প্রবেশ তার হাওড়া বাসকালেই ১৯১৮'র ৩রা আগষ্ট ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত হয় বিরাজবৌ। কিন্তু মঞ্চে শরৎ-সাহিত্যের গৌরবময় প্রবেশ ১৯২৭-এর ৬ই আগষ্ট ষোড়শী নাটক দিয়ে। সর্ব প্রথম বাংলা নির্বাক চলচ্চিত্র নির্মিত ১৯১৯-এ বিল্বমঙ্গল। আর ১৯২২ এ চিত্রায়িত হয় শরৎচন্দ্রের আঁধারে আলো।

বেলুড়ে স্বামী বিবেকানন্দ

বেলুড়ে মঠ প্রতিষ্ঠতার পূর্বে নিকটস্থ নীলাম্বর বাবুর বাগানবাড়ী ভাড়া করে মঠের কাজ চালান হ'ত। নীলাম্বর বাবুর বাগান বাড়ীতেই ১৮৯৮ খ্রীটাব্দের ২৫শে মার্চ স্বামী বিবেকানন্দ ভগিনী নিবেদিতাকে ব্রহ্মচর্য দীক্ষা প্রদান করেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মে স্বামীজি আলমোড়া যান। সেখান থেকে যান কাশ্মীর। ১৮ই অক্টোবর তিনি বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর বাগান বাড়ীতে ফিরে আসেন। ১১ই নভেম্বর স্বামীজির ইচ্ছায় বেলুড়মঠে শ্রীশ্রী-সারদা মায়ের আগমন ঘটে। আনুষ্ঠানিক ভাবে বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর। সেদিন শ্রী-রামকৃষ্ণ দেবের দেহাবশেষ যে কৌটায় রক্ষিত হ'য়ে নীলম্বর বাবুর বাগান বাড়ীতে তাঁর শিষ্যগণ কর্তৃক পূজিত হ'ত সেই কৌটাটি স্বামীজি কাঁধে করে এনে বেলুড়মঠে স্থাপন ও পুজা করেন। এরপর স্বামীজি বিদেশ যাত্রা করেন। প্যারিসের ধর্ম-ইতিহাস মহ সভায় যোগদান শেষে কয়েকটি দেশ ঘুরে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর হাওড়া ষ্টেশনে পৌছে তিনি একটি ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে হাওড়া ষ্টেশন থেকে বেলুড় মঠে আসেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী মঠের ট্রাস্টডীড তৈরী হয়। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট হ'লেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। স্বামীজি বেলুড় মঠ থেকে মায়াবতী যান। মায়াবতী থেকে বেলুড় ফিরে এসে তিনি পূর্ববঙ্গে যান। ঢাকায় থাকাকালীন তিনি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য তিনি গৌহাটি ও শিলং যান। শিলং থেকে তিনি বেলুড়ে ফিরে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বেলুড়ে কাটান। মাঝে একবার ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে বুদ্ধগয়া ও কাশী ঘুরে আসেন। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা জুলাই স্বামীজি ধ্যানযোগে বেলুড় মঠে-ই দেহত্যাগ করেন।

ভাষাচার্য্য সুনীতিকুমার এবং শিবপুর

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভাষাতত্ত্ববিদ ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর রাসপূর্ণিমায় ও চন্দ্র গ্রহণের প্রাক্কালে হাওড়া শহরের শিবপুর এলাকার ১৪ হেম ব্যানার্জি লেনে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। মাসিক সন্দেশ পত্রিকার আষাঢ় ১৩৮৪ সংখ্যায় সুনীতি কুমার সম্পর্কে প্রকাশিত অধ্যাপক প্রণব মুখোপাধ্যায়-এর রচনার অংশবিশেষ হ'ল—

"এ হেন মানুষটি নাকি আমাদের বাড়িতে জন্মেছিলেন। .... ছোটবেলায় পিতৃবিয়োগের পর তাঁর এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ পর্যন্ত ছাত্রজীবন আমাদের বাড়ি অর্থাৎ তাঁর মামার বাড়ি শিবপুরে কেটেছে। আমার দাদু ছিলেন তাঁর মামা। .... এইতো কয়েক বছর আগেই আমাদের বাড়ির হাতে লেখা পত্রিকায় তিনি স্বাক্ষর করেছেন, ছবি একেছেন, প্রথম স্বাক্ষর ছিল তোমাদের সম্পাদক মশাইয়ের! তাই দেখে সুনীতিকুমার খুবই উল্লসিত হ'লেন। তারপর আনমনে রবিঠাকুরের সাগরিকার লাইন লিখলেন—"কুহেলীগেল, আকাশে আলোদিল যে পরকাশি।

ধুর্জটির মুখের পানে পার্বতীর হাসি।"

সঙ্গে আঁকলেন শিব শিবাণীর অপূর্ব সুন্দর ছবি। আমরা অবাক হ'লাম—তিনি কত বড় আর্টিষ্ট। বড়রা অবাক হ'লেন না। তাঁরা শুনেছিলেন তাঁর আঁকার কথা। তিনি নাকি ছোটবেলায় মামার বাড়ির সারা দেওয়ালে কাঠ কয়লা দিয়ে ছবি এঁকে বেড়াতেন।"

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় কবি ও শিক্ষক

খ্রীষ্টীয় ১৯১০ সালের নভেম্বর মাস। হাওড়া জিলা স্কুলে এক নতুন শিক্ষকের আবির্ভাব ঘটল—নাম করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ধাম হাওড়া ময়দান নিকটস্থ মধুসূদন বিশ্বাস লেনে।

হাওড়ার সঙ্গে করুণানিধানের সম্পর্ক বৃত্তটির কেন্দ্রভূমি এই বিদ্যালয়। ছাত্ররা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছে স্নেহ-করুণা এবং সময় বিশেষে ছাতা পেটা'র বিধান।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে এই স্কুলে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন বিধু ভূষণ ভট্টাচার্য্য। তার পুত্র বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য হাওড়া জিলা স্কুলে এবং করুণানিধানের ছাত্র স্মৃতি চারণ করতে গিয়ে বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য লিখে গেছেন।

"'প্রথমেই মনে পড়ে আত্ম ভোলা মধু শ্লোক কবি শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে। তিনি বিদ্যালয়েরই শিক্ষক ছিলেন! আমাদের শিখিয়েছেন কত পাঠ, আবার খেয়েছি ছাতা পেটা, তেমনি পেয়েছি স্নেহ'।

করুণানিধানে সম্পর্কে বৈদ্যনাথ বাবুর স্মৃতি এত স্পষ্ট হওয়ার কারণ তাঁর ভবিষ্যৎ সাহিত্য-জীবনের উপর শিক্ষক করুণানিধানের প্রভাব অসীম। প্রতি বছর মহালয়ার ভোরে তাঁর লেখা মহিষাসুর-মর্দিনী বেতার যোগে প্রচারিত হয়ে বাংলার আকাশ বাতাস আকুল করে তোলে। বানীর বড় পুত্র না হলেও বরপুত্র তিনি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বাণীকুমার। স্বীয় সাহিত্য সাধনা সম্পর্কে বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য ওরফে বাণীকুমারের মন্তব্য—'কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু আমার স্কুলের শিক্ষক নন। কত রসের প্রেরণা ও তাঁর কাছে পেয়েছি। ভাবরসের লীলা তাঁরি অনুপ্রাণনীয় আমার চিত্ত লোক কলকল্লোলে হয়ে ওঠে মুখরিত। স্কুলের কাছেই একটি বটগাছ ডাল-পালা মেলে ঝুড়ি নামিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শিক্ষাদানের অবকাশে যখন করুণানিধান এই গাছ তলায় কাগজ কলম হাতে নিয়ে বসতেন তখন নেমে আসত কবিতার আকারে কল্পনার ঝুড়ি। এই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র হাওড়া বিবেকানন্দ ইনষ্টিটিউশনের অবসর প্রাপ্তন শিক্ষক শ্রীঅবনী ভুষণ দাস জ্যোতির্ভুষণের স্মৃতিতে দৃশ্যটি অক্ষয় হয়ে আছে। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে পর্যন্ত করুণানিধান এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষক

হিসাবে যুক্ত ছিলেন। বহুদিন পরে স্কুলটি সম্পর্কে তিনি লিখে গেছেন।

"বছর চল্লিশ পূর্বে আমি এই স্কুলের শিক্ষক ছিলাম। তখন ছাত্রগণের মনে উচ্চাঙ্গ চিন্তার আবহ রচনার জন্য যে আদর্শ জাতির পক্ষে যথার্থ কল্যাণকর তাহাই শিক্ষা দিতাম। তখন প্রধান শিক্ষক জে. এন. মুখার্জী এম. এ বার এ্যাটর্নি মহাশয়। এই বিদ্যামন্দিরে নিয়মানুবর্ত্তিতা এবং শিষ্টচার অক্ষুন্ন ছিল। আমরা শিক্ষক ভ্রাতৃগণ প্রীতি সূত্রে আবদ্ধ ছিলাম। বাঙ্গালীর ছেলেদের ভবিষ্যৎ জীবন সুগঠিত করিবার গুরু দায়িত্ব লইয়াছিলাম। ছাত্র সমাজেও জ্ঞান-পিপাসা প্রশংসনীয় ছিল, আমরা তাহাদিগকে আদর দরদ দিয়াই পড়াইতাম। অভিভাবকগণও আমাদের সহায় ছিলেন। দেশের সর্বত্র বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ঐকান্তিকী সাধনা হয়েছিল।

করুণানিধান হাওড়া থাকতে থাকতে একদিন রীতিমত ব্যস্ত হয়েই শান্তিপুরে চলে গেলেন, তারপর কয়েক সপ্তাহ পরেই আমার বড় দাদা মারা গেলে শান্তিপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে [মানুবালা দেবী। কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় জন্ম বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ—সাহিত্যবাণী প্রকাশনী।]

অক্ষয়দত্তের ঘোড়া ও বালীর কনিষ্ঠ বোটানিক গার্ডেন

খ্যাতনামা ব্রাহ্মগণের অন্যতম গ্রথিত যশা লেখক অক্ষয় কুমার দত্তের শেষ জীবন কাটে বালি গ্রামের শোভনোদ্যান নামক উদ্যান বাটিতে। বিদ্যাসাগর মশাই উদ্যান বাটিটিকে চারুপাঠ চতুর্থ ভাগ নামে অভিহিত করতেন। এখানে গৃহসজ্জা হিসাবে ছিল প্রস্তরীভুত জীবজন্তু, নানাপ্রকার শঙ্খ, শামুক প্রভৃতি। রাসায়নিক ও আনুবীক্ষণিক পরীক্ষা করা ও দেখার ব্যবস্থা ছিল। দেশবিদেশের এত বিভিন্ন ধরণের গাছের সমাবেশ বাগানে ছিল যে স্থানীয় অধিবাসীগণ

এটির নামকরণ করেছিলেন "কনিষ্ঠ বোটানিক গার্ডেন।" এখানে বাসকালেই তিনি রচনা করেন ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগ।

রোজ সকালে বেড়াবার জন্য অক্ষয় বাবুর একটি ঘোড়ার গাড়ী ছিল। গাড়ীটি ছিল ভীষণ ভারী এবং ঘোড়াগুলি মন্থর গতি-বিশিষ্ট। জোরে গাড়ী চালালে অক্ষয়বাবুর মাথা ঘুরত। ফলে গাড়ী চলত খুব আস্তে। সাধারণের নিকট সেকালে বালী গ্রামের জড়বুদ্ধি সম্পন্ন বালকদিগের আখ্যা ছিল—"অক্ষয় দত্তের ঘোড়া।"

অমৃতলাল বসু[রসরাজ]—কিছুকাল সালকিয়ার কামিনী লেনে বাস করতেন।

অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—হাওড়ার জন কিং কোম্পানীর ক্যাশিয়ার ছিলেন। বাস শিবপুর বাজারের নিকট। অন্নদাবাবু ছিলেন শিবপুর সাহিত্য সংসদের প্রাণপুরুষ। গ্রন্থ শিবপুর কাহিনী।

[ডঃ] অশোক কুণ্ডু—(জঃ ৪. ২. ১৯৪২) অধ্যক্ষ পুরাশ কানপুর হরিদাস নন্দী মহাবিদ্যালয়। সম্পাদক—সাহিত্যিক বর্ষ-পঞ্জী (বঙ্গীয় সাহিত্যকোষ)। গ্রন্থ—বংকিম অভিধান প্রভৃতি।

(ডঃ) অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়—(জঃ ৩, ৬, ১৯২০) ১৪২ ভট্টাচার্য পাড়া লেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ, কলি, বিশ্ব বিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশিত রচনা—ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ (১৯৪৪-৪৫)। তাঁর রচিত বহু গ্রন্থের মধ্যে কয়েকটি হ'ল—প্রাচীন বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১ম-৪র্থ খণ্ড) বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর এবং সাহিত্য জিজ্ঞাসায় রবীন্দ্র নাথ (১ম ও ২য় খণ্ড)। সাহিত্য গবেষণার জন্য ১৯৭৪—এ শিশির কুমার ঘোষ পুরস্কার পান।

অজিতকুমার দাস—[জঃ ৩-১-১৯৪২] সালকিয়া। যুগ্ম সম্পাদক নিঃ ভাঃ বঃ সাঃ সম্মেলন, হাওড়া শাখা। কবি ও প্রাবন্ধিক। কাব্য গ্রন্থ—দু'টি নয়ন মেলে।

অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী—[১৮৫০-১৮৯৮] আন্দুল। এটর্ণী। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে রামনারায়ণের নব নাটক প্রথম অভিনীত হয় ১৮৬৭-তে। এই নাটকে একটি স্ত্রী চরিত্রে মহলা দিয়েও তিনি শেষ পর্যন্ত মঞ্চাবতরণ করেননি। এ সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের মন্তব্য—"স্ত্রী বেশে সজ্জিত আমাদের কবি বন্ধু অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী কিছুতেই সাহস করিয়া দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখীন হইতে পারিলেন না।"

অরবিন্দ নাথ বসু—পৈত্রিক নিবাস জয়পুর গ্রাম। জয়পুর ফকিরদাস ইন্‌ষ্টিটিউশানের উচ্চতর মাধ্যমিক বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্পের সহিত যুক্ত আছেন। ১৯৪৮—এ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের "ফুড টেকনোলজি" বিভাগের অধ্যাপক হ'ন। ১৬-৮-৭১ থেকে ২০-১০-৭৯ পর্য্যন্ত ছিলেন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। কিছুকাল কোচিনের সেন্ট্রাল ইনষ্টিটিউট অফ ফিশারিজ টেকনোলজির ডিরেক্টার এবং ফুড এণ্ড এগ্রিকালচারাল অরগানাইজেশন অফ্ দি ইউনাইটেড নেশনস্ এর পরামর্শ দাতা হিসাবেও কর্মরত ছিলেন।

অশোক সেনগুপ্ত—কালীকুণ্ডুলেন। শিক্ষক। গল্পগ্রন্থ—যে কোন নিশীথে।

আবদল গফ্ফার—চন্দ্রপুর, গ্রন্থ-নুরবখত, নওবাহার (১২৮৮)।

আলামোহন দাস—জন্ম ১৩০১ সালের চৈত্র মাসের শেষ রবিবার। দেশ-উদয়নারায়ণপুর থানার অন্তর্গত খিলা গ্রাম। ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত বিদ্যা এবং দু'টি টাকা সম্বল করে কলকাতায় এসে খৈ-মুড়ি ফিরি করা দিয়ে কর্ম জীবন শুরু করে কালক্রমে দাশব্যাঙ্ক, আরতি কটন মিল, ভারত জুট মিল, ইণ্ডিয়া মেশিনারী কোং, এশিয়া ড্রাগ কোং, দাশ স্যুগার করপোরেশন, গ্রেট ইণ্ডিয়া ষ্টীমশিপ কোং,

হাওড়া ইন্সিওরেন্স প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেন এবং পিতার স্মৃতিরক্ষার্থে খিলায় গোপীমোহন শিক্ষা সদন স্থাপন করেন। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় তাঁকে কর্মবীর উপাধিতে ভূষিত করেন এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত দাশনগরকে মরণোন্মুখ বাঙালীর তীর্থ ক্ষেত্র বলে অভিহিত করেন।

ব্যবসায় জগতে প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য তাঁকে অনেক ধরণের বিপদের সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল। এই রকম একটি বিপদের কথা সন্দেশ চৈত্র ১৩৮৭-তে লিপিবদ্ধ করেছেন শ্রীমতী আরতি দাশ। ঘটনাটি হ'ল—নিজেদের কারখানায় তৈরী ওজন কাঁটা বসাতে পরেশনাথ পাহাড়ের পাশ দিয়ে গিরিডি যাবার পথে আলামোহন দাশ চলেছেন বনের মধ্য দিয়ে জনৈক ঘোষ বাবুকে সঙ্গী করে। হঠাৎ ঘোষবাবু পড়লেন এক ময়াল সাপের খপ্পরে। সাপটি ঘোষবাবুর প্রায় হাঁটু পর্য্যন্ত গিলে ফেলেছে এমন অবস্থায় দাশবাবু সাপের মুখে বুট জুতোর লাথি মেরে তাকে কাবু করে ঘোষ বাবুকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী গ্রামে নিয়ে যান। গ্রামের অধিবাসীরা সবাই মনে করেছিল ঘোষবাবু মারাগেছেন। কিন্তু তাদের কথায় কান না দিয়ে আলামোহন দাশ তিনদিন ধরে রোগীর পরিচর্যা করে তাকে বাঁচিয়ে তোলেন। পরিচর্যাটি হ'ল এই কদিন ধরে তার মুখে একটু একটু করে খাঁটি ঘি দেওয়া। কারণ থুরুটে তিনি এক ডাক্তারের সাপে কাটার চিকিৎসা দেখেছিলেন। সেই ডাক্তার বাবুর চিকিৎসা পদ্ধতি ছিল—রোগীর ওজন অনুযায়ী মন প্রতি একপোয়া ঘি একটু একটু করে রোগীর জিভে দেওয়া এবং জ্ঞান সম্পূর্ণ ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তাকে শুতে না দেওয়া।

ঈশান চন্দ্র বসু—হাওড়া জিলা স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভ্য ছিলেন। বাঙাল বাবুর বংশধর। কবি সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত এবং অধ্যাপক প্রফুল্ল কুমার ঘোষ এঁর দুই জামাতা।

কালীপ্রসাদ ঘোষ—[৫,৮, ১৮০৯—১২-১১-১৮৭৩] পৈত্রিক নিবাস, পৈতাল গ্রাম। সুপ্রীম কোর্টের জুরী [১৮৩৪], অবৈতনিক

বিচারক। ইংরাজীতে কবিতা ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। গ্রন্থ The Hindu Festival [১৮২৮], The shair and other poems [১৮৩০], Memoriers of Indian Dynesties [১৮৩৪]. On Bengali works and writers প্রভৃতি। সম্পাদক—The Hindu Intelligence [মা ১৮৪৫-৫৮], যুগ্ম সম্পাদক বিজ্ঞান-সেবধি, ১৮৩২ এপ্রিল।

কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ—১৮৪২ খ্রীঃ-এ প্রতাপপুরে জন্ম। গ্রন্থ-কুসুমাঞ্জলি ব্যাখ্যা বিবৃতি (১৮৯২) সাংখ্যদীপনি (১৯০০)। সম্পাদিত গ্রন্থ-চতুবর্গ চিন্তামণি (১৮৮৯), নীতিসার (১৮৮৪) প্রভৃতি।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভাঃ—১৮৫২ থেকে ১৮৬৮ খ্রীঃ পর্যন্ত বিশপস্ কলেজের অধ্যাপক ছিলেন।

করিমুদ্দিন জন্ম হাওড়া, গ্রন্থ-বেনজির বন্দরে মুনিব। (১২৭৯)

কামিনী সুন্দরী দেবী—শিবপুর। ছদ্মনাম দ্বিজতনয়া। গ্রন্থ —উর্বশী নাটক [১৮৬৬, মহিলা রচিত প্রথম বাংলা নাটক], বালা বোধিনী'কা [১৮৬৮]।

কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী—[১৭৯০-১৮৮২ খ্রীঃ] চিরকুমার তান্ত্রিক সাধক। রাজপুতানা, পাঞ্জাব, অযোধ্যা, এলাহাবাদ, উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান ও হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল সহ মোট ৩২টি জায়গায় কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর চেষ্টায় পাঞ্জাবে কালী-ভক্তি বিশেষ প্রসার লাভ করে।

কিশোরী মোহন গাঙ্গুলী—চরক সংহিতার অনুবাদক। অনেক সংবাদপত্র এবং পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং Reis and Raiyat-এর সম্পাদক ছিলেন। বিদ্যাবত্তার জন্য ১৮৯৮-এ সরকার থেকে লিটারারী পেনসন পেতেন।

কালী কৃষ্ণ দত্ত—ক্যালকাটা ষ্টীম নেভিগেশন কোং'র পরামর্শ-দাতা কমিটির একমাত্র ভারতীয় সদস্য ছিলেন। মুখ্যতঃ তাঁর চেষ্টাতেই

কলকাতা থেকে মেটেবুরুজ, রাজগঞ্জ, ও সাঁকরাইল পর্যন্ত হোরমিলার কোম্পানীর জাহাজ লাইন স্থাপিত হয়।

কুমার মিত্র হেমচক্রবর্ত্তী লেন। কথাশিল্পী।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য—হাওড়া শহরের খুরুট [এমন নেতাজী সুভাষ] রোডে কিছুকাল বাস করেন। কালীবাবুর বাজারের কাছে তাঁর নামে একটি রাস্তা আছে। প্রথমে প্রেসিডেন্সীতে অধ্যাপক পরে রিপণ কলেজের অধ্যক্ষ হ'ন। তিনি যখন সাপ্তাহিক হিতবাদীর প্রধান সম্পাদক তখন পত্রিকাটির সাহিত্য সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প রচনার সূত্রপাতও এই সময়ের হিতবাদীতে। তিনি কিছুকাল হাওড়া কোর্টে আইন ব্যবসা করেন এবং ১৩-৮-১৯৩২-এ হাওড়ায় বাসকালীন পরলোক গমন করেন।

কৃষ্ণ চৈতন্য শাস্ত্রী, পঞ্চতীর্থ—জঃ ২৯শে শ্রাবণ ১৩১৯ ধার্সা, সাঁতরাগাছি। আয়ুর্বেদ চর্চায় লিপ্ত। বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক। বহুগ্রন্থ রচয়িতা।

কিরণচন্দ্র দত্ত—জুলাই ১৮৭৬—৯-১২-১৯৬০। ব্যাঁটরা। গিরিশ লেকচারার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪৭। বিবেকানন্দ মিশন ও রামকৃষ্ণ সারদা মঠের প্রতিষ্ঠাতা—সম্পাদক। গ্রন্থকার-গিরিশ গৌরব, চারুস্মৃতি, বন্দনা (ক) সাধনা (সন্দর্ভ ও গীত), অর্চনা প্রভৃতি। যুগ্ম-সম্পাদক বিশ্ববাণী [মাঃ ১৩৩৬]।

কেশবচন্দ্র রায় চৌধুরী - শিবপুরস্থ ধর্মতলা লেন নিবাসী। কলিকাতার পি, জি, (অধুনা শেঠসুখলাল কারনারী মেমোরিয়াল) হাঁসপাতালের সচিব থাকাকালীন পঃ বঙ্গ থেকে প্রথম কলম্বো পরিকল্পনায় ইংল্যাণ্ডে ওভার-সীজ হস্পিটাল এ্যাডমিনিস্টেটরস কনফারেন্স (১৯৬৪)-এ ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন।

(ডাঃ) কেদার নাথ চক্রবর্ত্তী হাওড়ার হোমিও ডিগ্রী কলেজের উপাধ্যক্ষ ও চিকিৎসক।

কমল মল্লিক—জন্ম ১৯৩৬। ৬, ধর্মতলা লেন। সরোদ বাদক

স্বকীয় বাদন শৈলী ও রাগবিন্যাসের অনুপম কলা কৌশলে সুদক্ষ। শ্যাম গঙ্গোপাধ্যায় ও আলি আকবর খাঁর শিষ্য। অলইণ্ডিয়া রেডিও মিউজিক কমপিটিশনে প্রথমস্থান অধিকার করে ২৪-১০-১৯৫৯-এ তদনান্তীন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদের নিকট থেকে স্বর্ণপদক লাভ করেন! ১৯৭৩ থেকে আকাশবাণী কলিকাতার নিয়মিত শিল্পী। ১৯৮০-তে লণ্ডন ও আফ্রিকায় ভারতীয় সাংস্কৃতিক দলের সদস্য হিসাবে যন্ত্রসংগীত পরিবেশন করেন।

খাতের মুন্সি মহম্মদ—বান্ধবপুর বা গোবিন্দপুর গ্রামে জন্ম। গ্রন্থ—গোলে হরমুজ (১২৬১), শাহনামা (১২৮২) তুতিনামা (১২৯৭), যামিনীভান (১২৯৮) প্রভৃতি।

গিরীশচন্দ্র ঘোষ—২৭-৬-১৮২৯—২০-৯-১৮৬৯। বেঙ্গলী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। জীবনের শেষ পাঁচবছর বেলুড়ে কাটান। হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকা প্রতিষ্ঠা, পরিচালনায় ও সম্পাদনায় হরিশ মুখার্জীকে বিশেষ সাহায্য করেন। হাওড়ার canning Institute-এ বহু সুন্দর বক্তৃতা দিয়েছেন।

গীষ্পতীকাব্যতীর্থ— ?—১৯২৭। সহঃ সম্পাদক সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ। সম্পাদক হাওড়া হিতৈষী [সাময়িক পত্র]।

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়—১৬-১০-১৯১০ — ১-১-১৯৮০। বাঁকুড়ায় জন্ম হলেও সমগ্র কর্মজীবন অতিবাহিত হয় হাওড়ায়। প্রথমে রেলে করণিক পরে রামকৃষ্ণপুরের শিব ও অমিয়া হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেন। কাব্যগ্রন্থ—রাজকন্যা ও পরিচিত মুখগুলি।

গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রায়বাহাদুর—১৩-১-১৮৫৩—৪-১২-১৯২৭। শিবপুরবাসী প্রথম জেলা ও দায়রা জজ। দীনবন্ধু উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম।

গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিরত্ন, রায়সাহেব—জন্ম ২২-৮-১৮৭০ শাঁখরাইল। গ্রন্থ-ভাগবত কুসুমাঞ্জলি, শান্তিসোপান, Arjons Morals প্রভৃতি।

চিন্তামণি ঘোষ—১৮৪৪-১৯২৮। বালী। ভারতীয় মুদ্রণ শিল্পে চিন্তামণিবাবুর দান অসমান্য। মাত্র ১৩ বৎসর বয়সে এলাহাবাদের ইংরাজী সংবাদপত্র পাইনীয়ারে চাকুরী গ্রহণ করেন। পরে গ্রহণ করেন সরকারী চাকুরী। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদের সৈন্য বিভাগ থেকে একটি হাত মেসিন কিনে ইণ্ডিয়ান প্রেস নামে একটি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ১৯১০-এ তিনি উত্তর প্রদেশে প্রথম শক্তি চালিত মুদ্রাযন্ত্র এবং পরে লিথোগ্রাফিক পদ্ধতিতে মুদ্রণ শুরু করেন। সরস্বতী নামে একটি হিন্দী পত্রিকাও তিনি প্রকাশ করতেন।

চারুচন্দ্র সিংহ—১৮৭৫—১৯২৯। হাওড়া কোর্টের খ্যাতনামা ব্যবহারজীবি, সরকারী উকিল এবং পাবলিক প্রসিকিউটর ছিলেন। দীর্ঘকাল হাওড়া পৌর প্রতিষ্ঠানের সদস্য এবং ১-৪-১৯২০ থেকে আগষ্ট ১৯২৮ পর্য্যন্ত পৌর প্রধান ছিলেন।

কর্মসূত্রে এঁনার প্রপিতামহ নদীয়া জেলা থেকে এসে রামকৃষ্ণপুরের রাজবল্লভ সাহা লেনে বসবাস শুরু করেন। চারুবাবুর জন্ম হাওড়ায়। এন্ট্রান্স পাশ করেন হাওড়া জিলা স্কুল থেকে। থাল্লালাল, নন্দলাল, রবীন্দ্রলাল ও অচিন্ত্যলাল এঁর চারপুত্র।

(ডাঃ) চন্দন রায় চৌধুরী—শিবপুর ধর্মতলা নিবাসী কৃতী চিকিৎসক। মেডিসিনে পি, এইচ, ডি। অধ্যাপক কলেজ অফ্ মেডিসিন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৮১-তে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও মেডিসিন ফ্যাকাল্টির সদস্যরূপে নির্বাচিত হয়েছেন।

জগন্নাথ প্রসাদ বসু মল্লিক—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আন্দুলের এক জমিদার বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। কবি ও অভিধানিক। গ্রন্থ-শব্দকল্প তরঙ্গিনী (অমরকোষের বঙ্গানুবাদ, ১৮৩১) শব্দকল্প লতিকা (১৮৩৮) সম্পাদিত—অমরকোষ (১৮৩১)। প্রকাশক রত্নাবলী মাসিক ১৮৩২।

জগন্মোহিনী দেবী—বালির চন্দ্রমোহন মজুমদারের কন্যা। স্বামী ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। গ্রন্থ—জগৎহার (সঙ্গীত)

জনার আলি—বালিয়া পরগণার ধসা গ্রামে জন্ম। গ্রন্থ—ফজিলতে দরুদ ও জিবারতে কবর হাফাকাত দনিত (নিবন্ধ), জোবেদা খালম (১২৯২) প্রভৃতি।

[ডঃ] জয়ন্ত গোস্বামী বিদ্যাভূষণ ভক্তিসিদ্ধান্ত বাচস্পতি—প্রধান অধ্যাপক বাংলা বিভাগ শ্যামপুর সিদ্ধেশ্বরী কলেজ। গ্রন্থ—বাংলা গদ্য প্রসঙ্গ, সমাজ চিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন। পত্রিকা সম্পাদনা প্রবাহিনী (ত্রৈ) বাংলার মুখ (ত্রৈ)। স্ত্রী ডঃ মায়াঞ্জনা গোস্বামীর সহিত একত্রে রচনা করেছেন বিবেকানন্দের সাহিত্য (১ম ও ২য় খণ্ড)

জলি সেনগুপ্ত—২০০, রামকৃষ্ণপুর লেন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নিয়মিত গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখেন। রবীন্দ্র সাহিত্যের আদিপর্ব বিষয়ে গবেষণা পত্র দাখিল করেছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে।

জিয়াদ আলী—জন্ম অক্টোবর ১৯৪৩। চকোলী, রামেশ্বর নগর বাউরিয়া. গ্রন্থ—সাহিত্য ও সংস্কৃতি, চিন্তায় অবক্ষয়বাদ প্রভৃতি।

জীবনকৃষ্ণ শেঠ—জন্ম ১০-৭-১৯০৬। পি ৪১।২৪ নটবর পাল রোড, হাওড়া-৫। অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। গ্রন্থ—রবীন্দ্র নাটক প্রসঙ্গ, অমৃতের উৎস সন্ধানে প্রভৃতি।

ঠাকুরদাস দত্ত—১২০৭—২১-১-১২৮৩ বঙ্গাব্দ। উত্তর ব্যাঁটরা। পাঁচালীকার। গ্রন্থ—হরিশচন্দ্র, শ্রীবৎসচিন্তা প্রভৃতি।

[ডাঃ] তড়িৎ ঘোষ—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও নিউরোলজি বিভাগের প্রধান ছিলেন। প্রতিষ্ঠাতা বাঙ্গুর ইনষ্টিটিউট অফ নিউরোলজি।

তারাপদ সাঁতরা—জন্ম ১৯৩৩। নবাসন, বাগনান। হাওড়া জেলার পুরাকীর্ত্তি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। গ্রন্থ-হাওড়া জেলার লোক

উৎসব, হাওড়া জেলার পুরাকীর্ত্তি, সামতাবেড়ে ও শরৎচন্দ্র প্রভৃতি। পত্রিকা সম্পাদনা কৌশিকী।

তুলসী চক্রবর্ত্তী—মঞ্চ ও চিত্রজগতের সুপ্রসিদ্ধ কৌতুক অভিনেতা। বাস করতেন হাওড়া শহরের রামকৃষ্ণপুর অঞ্চলের কৈলাস বসু ৩য় বাই লেনে।

দানেশ মোল্লা মুহম্মদ—হাওড়া। গ্রন্থ-চাহার দরবেশ (১২৭৮)

দুর্লভ চন্দ্র ভট্টাচার্য—১৮৭--১৯৩৮। পৈত্রিক নিবাস রামরাজাতলা, সাঁতরাগাছি। ১৯০৫ খ্রীঃ থেকে ৩০ বছর যাবৎ প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হিসাবে একটি সংগীত প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে বাংলায় রাগসঙ্গীত চর্চ্চার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন।

দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায় ১৮৫০ - ১৫, ২, ১৯১৯। স্বনামধন্য শিক্ষানুরাগী ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক, বিনা পরিশ্রমিকে চিকিৎসা করতেন। ১৮৭৬-এ শিবপুর দীনবন্ধু ইন্‌ষ্টিটিউশান (মেন)-এর সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করে আমৃত্যু ইহা বহন করেন। তিনি এই প্রতিষ্ঠানে বহু টাকা দান করেন।

দুর্গাদাস লাহিড়ী, বেদাচার্য—বঙ্গবাসী পত্রিকার সম্পাদক। গ্রন্থাদি—পৃথিবীর ইতিহাস (পাঁচখণ্ড) বাঙ্গালীর গান, এনক অর্ডেন, লক্ষ্মণ সেন, লোকারণ্য, রাজা রামকৃষ্ণ, সাধনা, সুবর্ণবলয় সৎপ্রসঙ্গ, সুখ ও শান্তি প্রভৃতি।

দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী—১৮৩২-১৯৩৫। বামুনপাড়া গ্রামের সূর্য কুমার সর্বাধিকারীর দ্বিতীয় পুত্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলার। বিশ্ববিদ্যালয় কংগ্রেসে যোগদানের জন্য ইংল্যাণ্ড গমনকালে এবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি, এল উপাধি লাভ করেন। গ্রন্থাদি—ইউরোপে তিন মাস (ভ্রমণ কাহিনী) Thoughts and problems প্রভৃতি।

দেবেন্দ্র নাথ মল্লিক—১৮৩৬-১৯৪১। উলুবেড়িয়া। ১৯১৩'য় পাটনায় All India theistic Conference-এ এবং বোম্বাইয়ে

বিজ্ঞান কংগ্রেসের পদার্থ বিদ্যা ও গণিত বিদ্যা শাখায় সভাপতিত্ব করেন। অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে ছিলেন রংপুর কলেজের অধ্যক্ষ।

[ডাঃ] দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় —কালীকুণ্ডু লেন। চিকিৎসক হিসাবে স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ, সমাজ সেবী, জনস্বাস্থ্যে আদর্শ গ্রাম প্রকল্পের প্রবক্তা ও প্রধান উপদেষ্টা। পঃ বঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য এবং হোমিও ডিগ্রি কলেজের অধ্যাপক। সমাজকল্যাণ মূলক সেবা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় স্মৃতি জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে তিনিই একটি পদকসহ পাঁচ হাজার টাকা মূল্যের এই পুরস্কারটি পান।

দীলিপ কুমার বাগ—জন্ম ১৩ই আষাঢ় ১৩৪৮ সাল। সাহিত্যিক। সম্পাদক—অভিনব অগ্রণী (মা), নিঃ ভাঃ শিশু সাহিত্য সম্মেলন, পশ্চিমবঙ্গ শাখা।

দেবব্রত ঘোষ—১৬/২৭ কৈপুকুর লেন, হাওড়া। গ্রন্থ—শব্দের বিস্মিত আনন, আর নয় রত্নাবলী।

(কাজী) দ্বারিজমা সাহেব—শিবপুর বাজার সন্নিকটস্থ কাজী পাড়া (দ্বিতীয় হুগলী সেতু এই জায়গাতেই জি. টি, রোড অতিক্রম করেছে) নিবাসী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের শিবপুর দীনবন্ধু ইন্‌ষ্টিটিউশান (মেন)-এর বার্ষিক বিররণী থেকে জানা যায় স্কুলের বর্তমান জমিটি অত্যন্ত কম টাকায় (৫০০০) বিক্রী করে স্কুলের নিজস্ব ভবন তৈরীতে সহায়তা করে মহানুভবতার পরিচয় দেন।

দেবীচরণ খাঁ—১৯৫০-এ রামকৃষ্ণপুরের বিবেকানন্দ ইন্‌ষ্টিটিউশান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম হ'ন। পদার্থ বিদ্যায় উচ্চশিক্ষা লাভের পর যুক্ত রাজ্যে কিছুকাল গবেষণা ও অধ্যাপনা করেন। বর্তমানে কানপুরে আই, আই, টি-তে অধ্যাপনা ও গবেষণায় নিযুক্ত আছেন।

দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায়— [পান্থ পাদপ] ৩০-৬-১৩৪০। সাঁত্রাগাছি। অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। গ্রন্থ—মোহিত লালের কাব্য ও কবিমানস।

দেবী রায়—৫৬, জয়নারায়ণবাবু ও আনন্দদত্ত লেন। হাওড়া-১ গ্রন্থ—শবযাত্রার প্রথম চীৎকারকারী, উপনরক, আমি ও কলকাতা প্রভৃতি।

ধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী—২, অন্নদা প্রসাদ ব্যানার্জী লেন। গ্রন্থ—পঞ্চানন্দের পঞ্চরং।

ধ্রুবকুমার পাল—৩০-৭-১২৯০-২৩-৮-১৩৫৭। অমৃতবাটি, শিবপুর রোড, বাজার এলাকা। উত্তরপাড়া কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন।

নগেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী—৯৩, কালীকুণ্ডু লেন। গ্রন্থ—ভক্তিময়ী।

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য—২৯-৪-১৮৫৯—৪-৯-১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ, বঙ্গাব্দ ৯-১-১২৬৬—১৮-৫-১৩৪৬। আমতার নিকটবর্তী নারিট গ্রামে জন্ম। সোমপ্রকাশ এডুকেশন গেজেট, নববিভাকর, পাক্ষিক সমালোচক, প্রচার প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত কবিতা প্রকাশ করতেন। বিখ্যাত কবিতা "গোকুলে মধু ফুরায়ে গেল।" প্রথম কবিতা ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা লাভ করে। শিশুসাহিত্য রচনাতে বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। গ্রন্থাদি ছেলেখেলা, টুকটুকে রামায়ণ, ছবির ছড়া, পুষ্পাঞ্জলি প্রভৃতি।

নগেন্দ্রনাথ মল্লিক—এঁর কৃত আন্দুলের গোলাপবাগ একসময় বাংলাদেশের একটি প্রথম শ্রেণীর গোলাপ বাগিচা ছিল।

[ডঃ] নিমাই সাধন বসু পি, এইচ ডি এবং ডি, লিট (লণ্ডন) জন্ম ১-৬-১৯৩১। ৯৪ রামকৃষ্ণপুর লেন, হাওড়া। অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৬৬তে চার্লস ওয়ারেন রিসার্চ ফেলো, হারভাড ইউনির্ভাসিটি। দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রিত অধ্যাপক (১৯৭৮-৮০) হিসাবে সেখানে

ভারত চর্চার প্রবর্তন করেন। গ্রন্থাদি—হিস্ট্রি অব দি চন্দেল্লস্, ইণ্ডিয়ান য়্যাওকেনিং এণ্ড বেঙ্গল, অ্যামেরিকান এ্যাটিটিউড এ্যাণ্ড পলিসি টু দি ন্যাশনালিষ্ট মুভমেন্ট ইন চায়না, ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট—অ্যান আউট লাইন, রেসিসিজম্, ষ্টাগল ফর ইক্যোয়ালিটি এণ্ড ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিজম, উপথ উপকূলে এবং ভারত সরকার প্রকাশিত বিল্ডার্স অব মডার্ণ ইণ্ডিয়া সিরিজের অন্তর্গত রামানন্দ চ্যাটার্জী প্রভৃতি।

নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ—সম্পাদক, হাওড়া সংস্কৃত সাহিত্য সমাজ। নাট্যকার—কালিদাস, প্রহ্লাদ বিনোদম, ধ্রুব প্রসাদম্ প্রভৃতি।

[ডঃ] নির্মল কুমার সরকার—পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীনতম হোমিও মেডিকেল ক্লাব পত্রিকার সম্পাদক, বি-পার্টভুক্ত হোমিও প্যাথিক চিকিৎসক সংস্থার সহসভাপতি এবং হাওড়ার ডি, এম, এস [হোমিও] কলেজের সচিব।

নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়—[বঙ্গাব্দ ১২৭৪-আশ্বিন ১৩৫৮] চন্দ্রভাগ গ্রাম। পিতা-বামাচরণ, মাতা কৃষ্ণকামিনী। কর্ম—প্রথমে কলিকাতা হাইকোর্টের অধীন রিসিভার ষ্টেট সমূহের সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্‌ট হিসাবে পরে অন্যান্য দেশীয় রাজ্যে। কৃষি বিষয়ক তাঁর বহু রচনা হিতবাদী বঙ্গবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। স্কন্দ-পুরাণের রেবাখণ্ড থেকে বাংলায় সত্যনারায়ণের ব্রতকথার পদ্যানুবাদ করেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁকে "মানুষ চেনাকল" শিখিয়েছিলেন। পুত্র সাহিত্যিক শিশু মুখোপাধ্যায়।

নিমাই মান্না—এম, এ, বি, টি, ডি, ই, পি, সাহিত্য ভারতী [বিশ্বভারতী], বংকিম ভারতী, কাব্যবিশারদ। (জঃ ১৮-১১-১৯৪০) চাকপোতা, আমতা। আধুনিক প্রগতিশীল কবি। গল্পরচনাতেও সিদ্ধ হস্ত, আগুনের ফুল (সাহিত্য পত্রিকা) এবং হাতিয়ার (কবিতা পত্রিকা)-দ্বয়ের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। সুবক্তা, সংগঠক ও মঞ্চ পরিচালক। জিবিকা-

শিক্ষকতা। সাহিত্য-সংস্কৃতি'র প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি। কয়েকটি উল্লেখ-যোগ্য কাব্য গ্রন্থ-অন্ধকারে ঘোড় সওয়ার, স্বর্গাদপি গরীয়সী, ছড়ায় লড়াই (আট খণ্ড) প্রভৃতি।

নীরেন সেন—বেলুড়। কবিও নাট্যকার। একাঙ্ক নাটক—আজব-শহর কলকাতা।

ননীগোপাল চৌধুরী—(জঃ ১৯০৪) ৪।২।এ নীলকমল চক্রবর্তী লেন। শিবপুর দীনবন্ধু কলেজের ইতিহাস অধ্যাপক হিসাবে ১৯৪৯-এ যোগদান করেন এবং ১৯৫৮-৭০ পর্য্যন্ত অধ্যক্ষ ছিলেন। রচিত গ্রন্থ (১) কার্টিয়ার, গভর্ণর অব বেঙ্গল (২) ব্রিটিশ রিলেশন্স উইথ হায়দ্রাবাদ এবং (৩) শাহানশা আকবর।

নিশীথ কুমার মুখোপাধ্যায়—৩.১.১৯৩৪। ২৫১/১৬ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রোড, হাওড়া। অধ্যাপক। গ্রন্থ—সাহিত্যের আঙিনায়, ভুলিনি ভুলবনা প্রভৃতি।

নীরেন্দু কুমার হাজরা—অধ্যাপক, পুরাশ কানপুর হরিদাসনন্দী মহাবিদ্যালয়। গ্রন্থ—মহুয়ারমন, আত্মার করাতলে, সূর্য প্রতীক্ষা মাটিতে পা রেখে, সূর্যের হাত ধরে।

প্রশান্ত সরকার—(জঃ ১৭-৯-১৯২৪) পৈত্রিক নিবাস ১১ শিবতলা লেন, হাওড়া-২ শিক্ষা—বি. কে. পাল ইনষ্টিটিউশান ও কলিকাতা। কর্মজীবনে, ইউ. পি. আই, টাইম্‌স্ অব ইণ্ডিয়া, ও ষ্টেটসম্যানের রিপোর্টার, বর্তমানে লণ্ডনের ডেলি টেলিগ্রাফের একমাত্র পূর্ব ভারতীয় সাংবাদিক এবং দৈনিক বসুমতীর সম্পাদক ও ও ডিরেক্টর। টাইম, লাইফ ও নিউজ পত্রিকার সাথেও যুক্ত ছিলেন। দু'বার স্কলারশিপ নিয়ে ইংলণ্ডে যান। গ্রন্থ—সাংবাদিকের দৃষ্টিতে সোভিয়েট ইউনিয়ন।

প্রবোধচন্দ্র মজুমদার — (১৮৯৯ - ১৯২৮) পাতিহাল, দেবসাহিত্য কুটির নামক পুস্তক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা, প্রকাশক ও গ্রন্থকার।

[ডাঃ] পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়—১৮৯২, কারমাইকেল (বর্তমানে আর. জি) মেডিকেল কলেজের প্রথম সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট ।

প্রেমচন্দ্র দত্ত—আন্দুল। বাংলার ডেপুটি গভর্ণর স্যার এ্যাশলী ইডেনের মুন্সী এবং তাহার বাংলা ও উর্দ্দু শিক্ষক।

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়—(১৩০২ বঙ্গাব্দে জন্ম, মৃত্যু ১৮-৫-১৯৪২) কল্যানপুর নিবাসী নাট্যকার হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র। এঁর রচিত নাটক সমুহের মধ্যে অকালবোধন, বিজয়-বসন্ত, সতী. ক্ষুদিরাম, লায়লা-মজনু, বাংলার বিপ্লবী ছেলে, কংস বিখ্যাত। সরকার থেকে মাসে ৫০ টাকা করে সাহিত্য বৃত্তি পেতেন।

পঞ্চানন চোংদার (১৯-১-১৮৯১—২৭-৫-১৯৫১) আমতা থানার বড়দা গ্রামে মাহিষ্য পরিবারে জন্ম। সার্থক ব্যবসায়ী ও ক্রীড়ামোদী। আমতায় পিতার নামে রামসদয় কলেজ এবং মায়ের নামে জ্ঞানদাময়ী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন।

পঞ্চানন রায়চৌধুরী—(জঃ ১৫-১-১৯৩৭), মাধব ঘোষ লেন। সঙ্গীত সুধাকর, সঙ্গীত প্রভাকর, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের যন্ত্রীসঙ্গীতে এম এ। প্রখ্যাত তবলা, বীণা ও পাখোয়াজ বাদক, ধ্রুপদ ও লোক সঙ্গীত গায়ক এবং সাহিত্যিক।

পুর্ণেন্দু পত্রী (জঃ ১৯৩৯) চিত্র পরিচালক, চিত্র শিল্পী কবি ও সাহিত্যিক। কয়েকটি গ্রন্থের নাম 'কলকাতার রাজ কাহিনী, কী করে কলকাতা হলো এবং ছড়ায় মোড়া কলকাতা।'

প্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়—জঃ ১-৭-১৯০৬। ৮ নরসিংহ দত্ত রোড হাওড়া-১। অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক। গ্রন্থ—জাদু।

(ডাঃ) প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়—জঃ—২২ ১২.১৯৩২ পেশায় চিকিৎসক এবং নেশায় সাহিত্যিক। চিকিৎসাবিদ রবীন্দ্রনাথ, স্ত্রী অনেকেই হয় সহধর্মিনী হয়, ক'জন? এবং চিকিৎসা বিষয়ক বহু পুস্তক। দুইটি মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা।

প্রবোধগোপাল মুখোপাধ্যায়, রায়বাহাদুর—শিক্ষা উলুবেড়িয়া

ও র‍্যাভেনশ কলেজ, কটক। শরৎবসু'র বন্ধু স্থানীয়। কর্মজীবন—কৃষ্ণনগরের মহারাজার উকিল, হাওড়ার পাবলিক প্রসিকিউটর এবং তারক নাথ সাধু'র পর কলিকাতার পাবলিক প্রসিকিউটর হ'ন। শিবপুর হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়, শিবপুর স্পোর্টস্ ইন্‌সটিটিউট এবং শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরীর সাথে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত ছিলেন।

(ডঃ) প্রদ্যোৎ সেনগুপ্ত—(১-১-১৯৪১) ২০০ রামকৃষ্ণপুর লেন। কর্মজীবন শুরু করেন শ্যামপুর সিদ্ধেশ্বরী কলেজের অধ্যাপক রূপে। বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। গ্রন্থাদি প্রাচীন বাংলাকাব্যের ত্রিধারা, প্রবন্ধ সঞ্চিতা, রামেন্দ্র সুন্দর ও বাংলা সাহিত্য, বাংলার সামাজিক জীবন ও নাট্য সাহিত্য, রবীন্দ্র সৃষ্টি বিচিত্রা। সম্পাদিত—শতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ভৌতিক কাহিনী. দীনবন্ধু মিত্রের সধবার একাদশী, অক্ষয় কুমার বড়ালের কাব্য পরিচয় এবং গিরীশ ঘোষের পাণ্ডব গৌরব।

ফকির চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—[১২৮১-১৩৩৯] পৈত্রিক নিবাস ১০৪ নরসিংহ দত্ত রোড। জন্ম মাতুলালয় মাকড়দহে। রবীন্দ্র স্নেহধন্য মানসী [১৩১৫] পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোক্তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। দ্বিতীয় বর্ষে তিনি মুখ্য সম্পাদকরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। গ্রন্থাদি—উপন্যাস সুধা, তপস্যার ফল, পল্লীরাণী, স্মৃতিরেখা,—গল্প ঘরের কথা; নবান্ন, পরিকথা, অনুভূতি, দামোদরের মেয়ে ভ্রমণকাহিনী-পথের কথা।

ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ [মুখোপাধ্যায়. বড় ফণী] পৈত্রিক নিবাস সাঁত্রাগাছি। প্রথম জীবনে ইঞ্জিনীয়ার পরে প্রবেশ করেন যাত্রাজগতে। ৭৫ বছর বয়সে ১-১২-১৯৬৮ তারিখে কলকাতার নারকেলডাঙায় "বাঁশের কেল্লা" অভিনয় করতে করতে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হ'য়ে মারা যান।

বিনীতা বন্দ্যোপাধ্যায় (জঃ ১৯২৫) ১৪/২ ভট্টাচার্য পাড়া লেন। স্বামী ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রাক্তন সহ-উপাধ্যক্ষা

(প্রাতঃ বিভাগ) এবং অধ্যাপিকা, হাওড়া গার্লস কলেজ। স্বকন্যা ছদ্মনামে রচিত উপন্যাস-খড়ির লিখন, বৈশাখী বসন্ত, পৃথিবী জাহান্নাম, আলোর ঠিকানা এবং ঐতিহাসিক রচনার মধ্যে আছে নূরজাহান ক্লিওপেট্রা, কুমারী রাণী এলিজাবেথ এবং নেপোলিয়ন বোনাপার্ট।

বটকৃষ্ণ পাল—[১৮৩৫-১২-৩-১৯০৪] অনুমান তিনশতাব্দী পূর্বে পাল উপাধিধারী সত্রীশ আশ্রমভূক্ত জনৈক গন্ধ বণিক ব্যবসায় উপলক্ষে শিবপুর গ্রামে (শিবপুর ট্রাম ডিপোর নিকট) বসবাস শুরু করেন। খাঁটি ঔষধ এব সুলভমূল্য এই নীতির প্রবক্তা সফল ব্যবসায়ী বটকৃষ্ণ পালের জন্ম এই বংশে। তিনি অল্প বয়সে মাতাপিতৃহীন হওয়ায় কলকাতার বেনেটোলায় মামার বাড়ীতে প্রতিপালিত হ'ন। কিছুকাল মামাদের মশলার দোকানে কাজ করার পর ২১ বছর বয়সে বড় বাজারের খোংরা পটিতে স্বল্প পুঁজির মশলার দোকান খোলেন। কিছু বিলাতী ওষুধও বিক্রী করা শুরু করার পর ক্রমে তিনি কলকাতার একজন শ্রেষ্ঠ ওষুধ বিক্রেতা রূপে প্রচুর খ্যাতি ও অর্থলাভ করেন। ভারতীয় ঔষধ ব্যবসায়ীগণের মধ্যে বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং-ই সর্ব প্রথম ভাইসরয় এবং গভর্ণর জেনারেলের কেমিস্ট হিসাবে নিযুক্ত হ'ন। তাঁর নামে হাওড়ায় বি. কে. পাল ইনষ্টিটিউশান এবং কলকাতায় বি, কে. পাল এভিনিউ আছে। স্যার হরি শঙ্কর পাল তাঁর সুযোগ্য পুত্র।

বিহারীলাল সরকার—(১৮৫৫-১৯২১) জন্ম আন্দুলে। পিতা উমাচরণ। প্রথিতযশা সাহিত্যিক। বঙ্গবাসী পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে প্রায় ৩০ বৎসর যাবৎ কর্ম্মরত ছিলেন। গ্রন্থাদির মধ্যে বিদ্যাসাগর চরিত, তিতুমীর, শকুন্তলা তত্ত্ব, বিখ্যাত। ১৯১৫-তে রায় সাহেব উপধি পান।

বিশু মুখোপাধ্যায়—(২৯-১-১৯০৯ - ২১-৭-১৯৮১) পুরোনাম বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। অকৃতদার পিতা নিত্যগোপাল, মাতা চমৎ কুমারী। জন্ম চন্দ্রভাগ গ্রামে। শিক্ষা হাওড়া, বিহার ও

কলকাতায়। দৈনিক বসুমতীর সহঃ সম্পাদক ছিলেন। বিষ্ণুশর্মা ছদ্ম নামে দৈনিক বসুমতীর ছোটদের পাতা পরিচালনা করেন। কয়েকটি গ্রন্থ—রবীন্দ্র সাগর সঙ্গমে, পুরাতন প্রসঙ্গ, প্রেমের গল্প, বিখ্যাত শিকার কাহিনী, শরৎ সাহিত্যের মূলতত্ত্ব (অনুবাদ), মিষ্টি হাসির গল্প প্রভৃতি। আজীবন সাহিত্য সেবার স্বীকৃতি স্বরূপ পেয়েছেন সুধীরচন্দ্র সরকার পুরস্কার (মৌচাক পত্রিকা প্রদত্ত), বিশেষ সাহিত্য সৃজনী পুরস্কার (দক্ষিণী বার্তা, ১৯৭৬) এবং শিশির কুমার স্মৃতি পুরস্কার (১৯৭৮)। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সর্বশেষ চিঠিখানি লিখেছিলেন বিশুবাবুকে।

বিপিন বিহারী গুপ্ত—(১৯-১০-১৮৭৫—১৯৩৬) অধ্যাপক। বিচিত্র প্রসঙ্গ, পুরাতন প্রসঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। ১৯২০ খৃঃ থেকে অবশিষ্ট জীবন কাটান হাওড়া শহরের রামকৃষ্ণপুর অঞ্চলের ৫২ কৈলাস বসু লেনে, যেখানে ৬১ বছর বয়সে ২৯শে মাঘ ১৩৪২ (ইং ফেব্রুয়ারী ১৯৩৬) তাঁর তিরোধান ঘটে। তাঁর পুরাতন প্রসঙ্গ-এর দ্বিতীয় পর্য্যায় প্রকাশিত হয় হাওড়া বাসকালে ১৩৩৯ সালে।

বিনয় কুমার দাস—(৮-১১-১৮৯১—২৮-৪- ১৯৩৫) ব্যাঁটরা নিবাসী প্রথম ভারতীয় বৈমানিক। খেয়ালী সংঘের পরিচালনায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য ১৯৩৪ খ্রীঃ-এ ইনি বাগনান থানার খাজুরান গ্রামে হাওড়ার মাটিতে প্রথম বিমান অবতরণ ঘটান। মাঠে বিমানচালককে হাওয়ার গতিপথের নির্দেশ দেবার জন্য প্রচুর পোল খড় জলে ভিজিয়ে আগুন দিয়ে ধোঁয়ার সৃষ্টি করা হয়। সেই ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশে ওঠার পর শ্রীদাস হাওয়ার গতিবেগ বুঝতে পারেন। অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন ডাঃ বেণীচরণ দত্ত। ১৯২৯ খ্রীঃ-এ বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাবের সহায়তায় বিমান চালনা শিখে নিজেই একখানি বিমান কিনে নানাস্থানে ভ্রমণ

করেন এবং প্রধানতঃ তাঁরই প্রচেষ্টায় বদরিকাশ্রম প্রভৃতি স্থানে বিমান অবতরণ ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

[ডাঃ] বৈকুণ্ঠ নাথ দত্ত—[১৮৪৩—৬ই জুন ১৯০৬] ৫, হেম ব্যানার্জী লেন, শিবপুর। কলিকাতা মেডিকেল স্কুলে চতুর্থ বৎসর পর্য্যন্ত পড়ার পর ডাঃ মহেন্দ্র লাল সরকারের চিকিৎসা নৈপুণ্য মুগ্ধ হয়ে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শুরু করেন।

[ডাঃ] বেণীচরণ দত্ত—[২৩-১১-১৮৯২—১৭-১১-১৯৭৬] ডাঃ বৈকুণ্ঠ নাথ দত্তের পুত্র। সুচিকিৎসক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী। দীর্ঘকাল হাওড়া পুরসভার কমিশনার ছিলেন। ১৯৫২ ও ১৯৫৭'র নির্বাচনে বিধান সভার সদস্য হন। পুত্র ডাঃ দুলাল চন্দ্র দত্ত এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসক এবং পৌত্র ডাঃ শিবানন্দ দত্ত হৃদ রোগ বিশেষজ্ঞ।

[ডাঃ] বিমলেন্দু মুখার্জী—M. B. B. S, F. R C. S. [Edin and England]। জঃ-নভেম্বর ১৯৩০ বিনোদবাটি গ্রামে। ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের সার্জিক্যাল বিভাগের অধ্যাপক। গ্রামে বিদ্যালয়, পাঠাগার স্থাপন ও পরিচালনা প্রভৃতি বহু জনহিতকর কাজের সহিত যুক্ত আছেন।

বনমালী জানা—[১৯১২-১৯৫৯] অনুজ চেতনা নন্দজীর ভাষায়

কুলটিকারীর কুলদীপ তুমি ওহে বনমালী জানা,
দুঃখ তাপিত দুর্গত প্রাণ জানে শ্যামপুর থানা।

শ্যামপুর থানার এই সর্বজনমান্য, অকৃতদার দেশসেবক স্বাধীনতা আন্দোলনে ছাত্রাবস্থা থেকেই অংশগ্রহণ করে বহুবার কারাবরণ করেন। শিক্ষাবিস্তার ও কুখ্যাত খোরোদ গ্রামের অপরাধীদের সংশোধন ও আর্থিক নির্ভরশীল করে গড়ে তোলা তাঁর কর্মবহুল জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

বিমলানন্দ স্বামী—[১৮৭২—২৪-৭-১৯০৮] বাগাণ্ডা গ্রামের

মাধব চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে উদ্বুদ্ধ প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকাটির অশেষ উন্নতি সাধন করেন।

বিপিন বসু—স্বদেশীযুগের প্রখ্যাত বন্দেমাতরম গায়ক। বেঙ্গল ন্টিয়ার্সের হাওড়া জেলার জি, ও, সি, ছিলেন।

বঙ্কিমপ্রসাদ ঘোষ—(৩০শে চৈত্র ১২৯৯-৬ই বৈশাখ ১৩৮৪) নীনিবাসী কৃষি পণ্ডিত ও বীজ বিশেষজ্ঞ।

(ডাঃ) বিনোদ রায়—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্স-রিমেন্টাল সার্জারী বিভাগের প্রধান।

বোধানন্দ স্বামী—(মে ১৮৭০-১৮-৫-১৯৫০) বাগাণ্ডা গ্রামের নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র হরিপদ স্বামী বিবেকানন্দের নিকট ক্ষা গ্রহণের পর সন্ন্যাসজীবনে স্বামী বোধানন্দ নামে পরিচিত হন। মী বিমলানন্দ তাঁর খুড়তুতো ভাই। হরিপদ যখন বিদ্যাসাগর াই প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র তখন স্কুলের ধান শিক্ষক ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। পরে তিনি জগৎবল্লভপুর চ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন। তিনি ১৮৯৫ ঐ স্কুলে শিক্ষকতাও করেন। ১৮৯৮—এ সন্ন্যাস গ্রহণ করে বেলুড় মঠে যোগদান করেন। নিউইয়র্ক ও পিটসবার্গে বেদান্ত প্রচার এবং নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতির স্থায়ী ভবন নির্মাণ তাঁর অদম্য র্মশক্তির সাক্ষী। নিউইয়র্কে তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে।

বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য (২০-৫-১৮৯৫—১৮-৯-১৯৭৫) ৮১ শিবপুর রোডে রঘুনাথ ও বিশ্বেশ্বরীর সন্তানরূপে ভূমিষ্ঠ হ'ন। অর্থ-নীতিতে এম, এ। সেন্টপলস্ ও সিটি কলেজে অধ্যাপনা এবং হাওড়া গার্লস কলেজে অধ্যক্ষতা করেন। শরৎচন্দ্র যখন হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি তিনি তখন কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক। হাওড়ায় স্ত্রীশিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষা প্রসারে প্রাণপাত পরিশ্রমের জন্য হাওড়ার আশুতোষ নামে আখ্যাত। আমৃত্যু রামকৃষ্ণ দরিদ্র ভাণ্ডার, শিবপুর পারলিক লাইব্রেরী, শিবপুর তরুণ সমাজ এবং দ্বিজেন্দ্র

ব্যায়ামাগারের সহিত যুক্ত ছিলেন। রচিত গ্রন্থাদির মধ্যে Prin
ciples and Methods of Municipal Administration i
Bengal উল্লখযোগ্য। তিনি হাওড়ায় দীনবন্ধু কলেজ, হাওড়া গার্ল
কলেজ ইত্যাদির প্রতিষ্ঠাতা রূপে স্বীকৃত। ইহা ব্যতীত আন্দু
কলেজ, শ্যামপুর সিদ্ধেশ্বরী কলেজ ইত্যাদিরও তিনি প্রতিষ্ঠাতাদে
অন্যতম।

(ডাঃ) বিরল মল্লিক—আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরিবা
কল্যাণ বিশেষজ্ঞ, ইণ্ডিয়ান রুরাল মেডিকেল এসোসিয়েশনের সর্ব
ভারতীয় সেক্রেটারী জেনারেল এবং জনস্বাস্থ্য শিক্ষা পত্রিকার প্রধা
সম্পাদক।

বরদাপ্রসন্ন পাইন—আধুনিক হাওড়াকে যারা তিলেতিলে গড়ে
তুলেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম বরদাপ্রসন্ন পাইন ৯৩ বছর বয়সে
৭-৯-১৯৭৫-এ লোকান্তরিত হন। তিনি দেশবন্ধুর গ্রাম উন্নয়
পরিকল্পনার জন্য দেশবন্ধুকে হাওড়ায় এনে আধ ঘণ্টার মধ্যে কয়ে
হাজার টাকা চাঁদা তুলে দেন। তিনি হাওড়া কোর্টের লব্ধ
প্রতিষ্ঠ আইনজীবি, হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান এব
অবিভক্ত বাংলার মন্ত্রী ছিলেন। হাওড়া কোর্টে তাঁর একটি প্রতিকৃতি
আছে।

ব্রজেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়—[জুলাই ১৮৮৯—জুন ১৯৭০]
প্রথম জীবনে অনুশীলনে সমিতি ও স্বদেশী আন্দোলনের সংগে যুক্ত
ছিলেন। পরবর্তী জীবনে হাওড়া সমাজের নদের নিমাই-এর সৃষ্টি ও
সংগঠনে বিশেষ ভুমিকা গ্রহণ করেন। নদের নিমাই-এর সংগীতকার
হিসাবে একসময় তিনি বাংলার শ্রেষ্ঠ ভক্তি সঙ্গীত রচয়িতার সম্মান
পেতেন। শ্রীকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ, ও বিবেকানন্দ সম্পর্কে বহুগান রচনা
করেছেন। তাঁর রচিত ভক্তিসঙ্গীতের একটি পংক্তি

"নামে বুক ভরে যায়,
অভাব মিটায় স্বভাব জাগায় মহাসুখে।"

বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—জন্ম ২৮-৬-১৯১৮তে শিবপুরের
ট ভট্টাচার্য পাড়ায় [৪৮৪/১, সারকুলার রোড]। পিতা রবীন্দ্র
, মাতা অনুপমা। বিখ্যাত স্বরোদ বাদক। তিনি বহুদিন মাইহারে
লেন এবং আলাউদ্দিন খাঁ'র নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। আকাশ-
র 'এ' শ্রেণীভুক্ত শিল্পী ছিলেন। যন্ত্রসংগীত পরিবেশনের জন্য
বার ইউরোপ, কানাডা, মিশর ও আমেরিকা ভ্রমণ করেন।
৯৪-৫০-এ উদয়শংকরের দলে ছিলেন। কল্পনা চিত্রের আবহ সংগীত
না ও একটি বিশেষ ভূমিকায় অভিনয় করেন। স্বরোদ বাদনে তাঁর
গে কোন ভারতীয় শিল্পী আমেরিকায় এরূপ সম্মান পান নাই।
৭৪-এ দিশারী পুরস্কার লাভ করেন।

বরুণ মজুমদার—[জঃ ১২-৯-১৯৪১] ১৪০ রামকৃষ্ণপুর লেন।
ম প্রকাশিত রচনা সাত সমুদ্দুর (কবিতা, ইন্দিরা দেবী সম্পাদিত
তসমুদ্দুর-এ)। কাব্যগ্রন্থ—নতুন ফুলের স্বপ্নে, রাত্রির ছায়া।
—গল্প আরো গল্প। দৈনিক বসুমতীর প্রাক্তন ষ্টাফ রিপোর্টার,
মানে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের সংবাদ পাঠক।

ডাঃ ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী—[জঃ ২৬-৮-১৯২৫] ৫ সুবল কোলে
ন, হাওড়া-১। ডাঃ নিতাই চরণ চক্রবর্তী ও নন্দরাণীর জ্যেষ্ঠ সন্তান
: ভোলানাথ চক্রবর্তী বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ও
৯৭২ খৃষ্টাব্দ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হোমিওপ্যাথিক উপদেষ্টা।
ইরেক্টার (অবৈতনিক), হোমিও ডাইরেক্টরেট পঃ বঙ্গ। সারা-
রতীয় যুক্তরাষ্ট্রে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ও গবেষণার জন্য গঠিত
তিষ্ঠান সমূহের পরিচালক পরিষদের সদস্য। প্রাঃ অধ্যক্ষ কলিঃ
মিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ (১৯৫০-৬৬) এবং মহেশচন্দ্র
ট্টাচার্য হোমিওপ্যাথিক কলেজ (৬৬-৭২)

ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর—কবি। ১১১৯ বঙ্গাব্দে পেঁড়ো
ামে জন্ম। মৃত্যু ১১৬৭ সালে। পিতা রাজা নরেন্দ্র
রায়ণ রায়। কৌলিক উপাধি মুখোপাধ্যায়। বর্ধমান রাজ এঁদের

পৈতৃক ভুসম্পত্তি কোন কারণে বাজেয়াপ্ত করায় ইনি মাতুলা [মণ্ডলঘাট পরগণার অন্তর্গত গাজিপুরের নিকট নওয়াপা আশ্রয় গ্রহণ করে সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। পরে হুগ দেবানন্দপুরে রামচন্দ্র মুন্সীর নিকট শিক্ষা করেন ফার্সী। এই রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ পুনরায় বর্ধমানরাজের অনুমত্যানুসারে পৈ বাসকালীন ভারতচন্দ্র পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন এবং পৈ সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য বর্ধমানে প্রেরিত হ'ন। কিন্তু সেখা দুষ্টলোকের চক্রান্তে কারারুদ্ধ হ'ন। অতঃপর ইনি কারাগার হ পলায়ন পূর্বক মহারাষ্ট্রীয়দিগের আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরবর্তী জী ফরাসডাঙ্গার [চন্দননগর] ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী দ্বারা ইনি মহারা কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত পরিচিত এবং চল্লিশ টাকা বেতনে তাঁর সভা নিযুক্ত হ'ন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ইহার অসাধারণ কবিত্ব শক্তির রায় গুণাকর উপাধি এবং মুলাজোড়ে নিষ্কর জমি দান করেন। বা ব্যতীত বহু হিন্দী, ফার্সী এবং সংস্কৃত কবিতা রচনা করেছেন। গ্র সত্যপীর কথা, অন্নদামঙ্গল [ক] অন্নদামঙ্গল, (খ) বিদ্যাসুন্দর এ (গ) মানসিংহ, চোর পঞ্চাশৎ রসমঞ্জরী, নাগাষ্টকম, চণ্ডীনা গঙ্গাষ্টকম. বিবিধ বিষয়ক সঙ্গীত ও কবিতা।

ভৈরবী চরণ বিদ্যাসাগর—আন্দুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সিদ্ধেশ্ব প্রতিষ্ঠাতা। নবদ্বীপের কোন এক বিচার সভায় বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধি পরিচয় দেওয়ায় আন্দুলকে তৎকালীন বঙ্গীয় সুধীসমাজ দক্ষি নবদ্বীপ আখ্যা দেন।

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার—জন্ম ১৯৫৩। শিশু সাহিত্যি গ্রন্থ—মজার ছড়া।

মাণিকচাঁদ—(?-১৭৬২) ইনি ইতিহাসে দেওয়ান মানিক নামে পরিচিত। প্রকৃত নাম মানিকরাম বসু। দেশ উলুবেড়ি নিকট রাম নগর গ্রামে, যেখানে এখনও তাঁর বংশধরগণ ব করেন। কর্মজীবনের শুরু বর্ধমান রাজ কীর্তিচন্দ্রের দেওয়ান হিসা

নবাব আলিবর্দী খাঁর দেহরক্ষী হিসাবে মারাঠা (বর্গির) আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। এঁর কর্ম দক্ষতায় সন্তুষ্ট হয়ে নবাব আলিবর্দী এনাকে পাঞ্জাসহ প্রচুর ভু-সম্পত্তি এবং রাজা উপাধি দেন। সিরাজদ্দৌল্লা ইংরাজদের হাত থেকে কলিকাতা অধিকার করে এঁকে শাসক নিযুক্ত করে মুর্শিদাবাদে ফিরে যান। কলকাতার শাসক হিসাবে ইনি বাস করতেন বেহালার ডায়মণ্ড হারবার রোডের উপর এক বাগান বাড়ীতে।

মনীন্দ্র মোহন চক্রবর্ত্তী—জন্ম ১-২-১৯২২। পৈত্রিক নিবাস আমতার নিকটে ভাণ্ডার গাছা গ্রামে। ১৯৩৬-৭০ কদমতলায় এবং পরে কিছুকাল মধুসূদন বিশ্বাস লেনে নিজের বাড়ীতে বাস করেন। আই, এস, সি পাশ করেন নরসিংহ দত্ত কলেজ থেকে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফলিত রসায়নে এম, এস, সি এবং লিভারপুল বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি উপাধি পান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে কর্মজীবন শুরু করে ২১-১১-১৯৭৯ থেকে শুরু করে এখন পর্য্যন্ত কর্মরত আছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য রূপে। জানুয়ারী ১৯৭৮ থেকে জুন ১৯৭৯ পর্য্যন্ত ছিলেন বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। প্রায় ৮ বৎসর নরসিংহ দত্ত কলেজ ও হাওড়া গার্লস কলেজের পরিচালক পরিষদের সভাপতি ছিলেন। ১৯৫২—৬২ ছিলেন বিধান পরিষদের সদস্য। হাওড়া ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট বিল আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন। এক সময় হাওড়া ডেভলপমেন্ট কাউন্সিলের সংঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দীর্ঘ দিন যুক্ত ছিলেন ব্যাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরী, ব্যাঁটরা কো-অপারেটিভ সোসাইটি, হাওড়া সংঘ, হাওড়া সেবা সংঘ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সাথে।

(ডাঃ) মণি দে—১৮৯২—৩০-৮-১৯৭৪। প্রথিতযশা চিকিৎসক। জন্ম শিবানন্দবাটি। হাওড়া জেনারেল হাঁসপাতালের অবৈতনিক ভ্রাম্যমান চিকিৎসক। আই, এম, এস না হয়েও ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের সর্বপ্রথম রেসিডেন্ট ফিজিসিয়ান নিযুক্ত হ'ন। বাংলা সরকারের প্রথম ভারতীয় প্রোফেসার ডিরেক্টার অফ্ মেডিসিন এবং প্রেসিডেন্সী ফিজিসিয়ান। সরিষার তেলের অপকারিতা সহ মোট আবিষ্কারের সংখ্যা ৮০। স্কটের হিষ্ট্রী অব্ ট্রাপিক্যাল মেডিসিন গ্রন্থে তাঁর আবিষ্কারের উল্লেখ আছে। চিকিৎসা-জগতে মৌলিক গবেষণার জন্য তাঁকে কোটস্ স্বর্ণ-পদক দিয়ে সম্মান জানান হয়। তিনি ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের সহিত যুক্ত ক্যালকাটা চিত্তরঞ্জন হসপিটালে ৫০ হাজার টাকা এবং ইসলামিয়া হাঁসপাতালে কয়েকটি "শয্যা" দান করেন।

মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন—নারীট। শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীধর স্বামীর অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষ।

মহেন্দ্রলাল সরকার—২-১১-১৮৩৩—২৩-২-১৯০৪। পৈত্রিক নিবাস পাইকপাড়া গ্রামে। প্রসিদ্ধ চিকিৎসক, ভারতের দ্বিতীয় এম. ডি।

মতিলাল সাহা—সাহা উপাধিধারী বৈষ্ণ জাতীয় খাণ্ডেলওয়ালা বেনিয়া বংশের কোন ব্যাক্তি কোন সময় ভাগলপুর থেকে এসে জগৎবল্লভপুরে বসবাস শুরু করেন। এই বংশে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জুন মতিবাবুর জন্ম। কর্মজীবন প্রথমে এটর্নী প্রিয়নাথ সেনের কেরাণী পরে গ্রামোফোন কোম্পানীর ক্যাশিয়ার। কিছুকাল চাকরী করার পর ভাইকে নিয়ে চাঁদনীচকে গ্রামোফোন বিক্রীর ব্যবসা শুরু করেন। সামান্য পুঁজিতে স্বীয় প্রচেষ্টায় বৃহৎ কারবারের মালিক হয়ে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর দোকানের মালিক হ'ন চণ্ডীচরণ সাহা। চণ্ডীবাবুর মৃত্যুর পর দোকানটির নতুন নাম হয় সি, সি, সাহা এণ্ড সন্স।

মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—১২৬১—১৩১৬। অন্দুলের শাণ্ডিল্য গোত্রীয় প্রেমিক আখ্যাধারী বিখ্যাত কালীকীর্ত্তন সংগীত রচয়িতা। শৈশবকালে কবিতা রচনায় আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও ভাল কবিতা রচনায়

অক্ষম হ'লে পিতা মাধবচন্দ্র উপদেশ দেন প্রতিদিন অন্ততঃ একটি কবিতা রচনা করে তবে জল গ্রহণ করতে। বিষকুসুম নামক উপন্যাস এবং নলদময়ন্তী, উত্তরাবিলাপ, শাল্ব সংহার, ভক্তি ভাণ্ডার প্রভৃতি নাটকের রচয়িতা।

মুরারী মোহন বেদান্তাদিতীর্থশাস্ত্রী—খ্যাতনামা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও জ্যোতির্বিদ্যা বিশেষজ্ঞ। সম্পাদক হাওড়া পণ্ডিত সমাজ।

মৃগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—(বাদল বাবু) কাসুন্দিয়ার রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। আজীবন বিবেকানন্দ ইন্‌ষ্টিটিউশানে শিক্ষাকতা করে অবসর গ্রহণ করেন। সমগ্র জীবন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ভাবধারা প্রচারে উৎসর্গীকৃত। অতুলনীয় কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন। তাঁর সঙ্গীত প্রতিভায় আকৃষ্ট হ'য়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শান্তিনিকেতনে যোগদানের আহ্বান জানান। কিন্তু তিনি রামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দ আশ্রমের গঠন মূলক কাজে আত্মোৎসর্গ করে সেই অমূল্য সুযোগ ত্যাগ করেন।

মহেন্দ্রনাথ রায়—জন্ম ২৯-১০-১৮৬১ খ্রীঃ, মৃত্যু বাংলা ২৮শে শ্রাবণ ১৩৩২ সাল। আমতার নিকটস্থ তাজপুরে মাহিষ্য জমিদার বংশে জন্ম। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম বেসরকারী নির্বাচিত চেয়ারম্যান। ১৮৮৪তে হাইকোর্টে উকিল হিসাবে যোগ দেন। ১৮৯১—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং ১৯১১-২০খ্রীঃ পর্যন্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। সিটি কলেজের গণিত ও আইনের অধ্যাপক এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন অফ্ ফ্যাকাল্টী অফ্ ল ছিলেন। ১৯১৪ তে মুখ্যতঃ তাঁরই প্রচেষ্টায় শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের হাওড়া থেকে ঢাকায় স্থানান্তর বন্ধ হয়।

যোগত্রয়ানন্দজী—সংসার আশ্রমের নাম শশীপদ সান্যাল। জন্ম ১৮৫৮-য় বালীতে। পিতা রামজীবনের বাস ছিল দাঁ-য়েদের রাস-বাড়ীর পশ্চিমে টেম্পল রোডের উত্তর ধারে। কল্যানেশ্বর শিব

দর্শনান্তে রামকৃষ্ণদেব এ বাড়ীতে পদার্পণ করেছিলেন ; কর্ম-শক্তি, ও জ্ঞানের অপূর্ব সম্মিলনের জন্যই শশীপদ ওরফে "বালীর শশী ব্রহ্মচারী" যোগত্রয়ানন্দজী নামে পরিচিত হন। পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দ কাশীতে ইহার সহিত বেদান্ত আলোচনা করেন। তাঁর সম্পর্কে সাধু দর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ গ্রন্থে ডঃ গোপীনাথ কবিরাজের মন্তব্য "তিনি বহু গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার সব প্রথম ও সর্বপ্রধান গ্রন্থ আর্যশাস্ত্র প্রদীপ। এই মহাগ্রন্থ সম্পুর্ণ প্রকাশিত হইলে পৃথিবীর বিশেষ কল্যাণ হইত সন্দেহ নাই। ইহার ভূমিকা'র যে অংশটুকু প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও অতি বিশাল ও অপূর্ব! হার্বার্ট-পেন্সার যেরূপ সিন্থেটিক ফিলসফির পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহার চেয়েও বিরাট পরিকল্পনা ছিল আর্যশাস্ত্র প্রদীপকারের। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য ইহা হইয়া উঠে নাই।"

যোগেশচন্দ্র দত্ত—আন্দুল নিবাসী প্রসিদ্ধ এটর্নী, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Banerjee) তাঁর ব্রিফ নিশ্চিন্তে নিতেন এবং তাঁকে দায়িত্বপূর্ণ কাজ দিতেন।

যামিনী কান্ত সোম—(১৫-১১-১৮৮৫—২৩-১-১৯৬৪) অবসর জীবন কাটান ১৬ বৈষ্ণবপাড়া লেনে। শিশু সাহিত্যিক। প্রসিদ্ধ অনুবাদ গ্রন্থ মেটার লিংকের ব্লু বার্ডের নীলপাখী। অনেকের মতে রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় প্রকাশিত যামিনীবাবুর ছেলেদের রবীন্দ্রনাথই বাংলা শিশুসাহিত্যে প্রথম রবীন্দ্রচরিত কথা।

যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী'র গৃহী শিষ্য। হাওড়ায় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা।

যোগেশ দাশগুপ্ত—হাওড়া গার্লস স্কুল-এর প্রতিষ্ঠাতা।

রামগোপাল স্মৃতিরত্ন—(২৭-৪-১২৮০ – ৩০-১০-১৩৫৩ বঙ্গাব্দ) সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। অধ্যাপক ও দক্ষিণাচারী তান্ত্রিক সাধক। হাওড়া জিলা সংস্কৃত সমাজ ও হাওড়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর সহ-

সভাপতি ছিলেন। হাওড়া সংস্কৃত সমাজ ভবনে এঁর নামানুসারে একটি মঞ্চের নামকরণ করা হয়েছে। গ্রন্থাদি—নিত্যানুষ্ঠান পদ্ধতি, প্রতিষ্ঠাপদ্ধতি এবং ব্রতানুষ্ঠান পদ্ধতি। সুযোগ্য পুত্র নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ।

রামচন্দ্র খাঁন—ঘোষ উপাধিধারী রামচন্দ্রের পৈত্রিক নিবাস বালীগ্রাম। দক্ষ রাজকর্মচারী হিসাবে গৌড়ের সুলতান কর্তৃক ছত্র-ভোগের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন ও খাঁন উপাধি পান। নীলাচলে যাওয়ার পথে চৈতন্যদেব তাঁকে কৃপা করেন।

রাম বসু—(১৭৮৬—১৮২৮) শালিখার প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা। প্রথমে নীলু ঠাকুর ভবানী বেনে প্রভৃতির দলে কবিগান করতেন। পরে নিজেই কবি দল গঠন করেন।

রামকৃষ্ণ কর্মকার, ক্যাপ্টেন—জন্ম দফরপুর গ্রামে। নেপাল ও আফগানিস্থানে সর্বপ্রথম আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কামান, বন্দুক তৈয়ারীর ব্যবস্থা করেন। নেপালে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থাও তাঁরই করা। নেপালের রাজা তাঁকে ক্যাপ্টেন উপাধি এবং আফগানিস্থানের আমীর ভালঘোড়া ও অন্যান্য পুরস্কারের দ্বারা সম্মানিত করেন। ইহার বংশধরগণের বর্তমান বাস বেলুড়ে।

রামমোহন বসু—(১৭৮৬-১৮২৯) শালিখার প্রসিদ্ধ গীতি কবি। ইহার বিষহরি (মনসা) বিষয়ক কবিতাগুলি সুন্দর। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এঁর কবিতাগুলি সংগ্রহে যত্নবান হয়েছিলেন। সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত এইরূপ একটি অসম্পুর্ণ কবিতাংশ

"যদি অনলো, হোতো প্রবলো, জলে হইত নির্বাণ।
নহে কাল ভুজঙ্গ, দংশিলে অঙ্গ, মন্ত্রেতে বাঁচিত প্রাণ।"

রামপদ সানা—রচিত গ্রন্থ—পঞ্চরঙ্গ, সঙ্গী, কমলপুর প্রভৃতি।

রাজনারায়ণ—আন্দুল রাজ। গভর্ণর ভ্যান্সিটার্টের দেওয়ান

রামচরণ রায়ের বংশধর। আন্দুলের সাজাহান নামে অভিহিত। বর্তমান আন্দুল রাজপ্রসাদ এঁর আমলে তৈরী। কলকাতার রাজা-বাজারে বাড়ী ও বাজারের মালিক ছিলেন।

রায়বাঘিনী—প্রকৃত নাম ভবশঙ্করী। পিতা দীননাথ চৌধুরী পেঁড়ো গড়ের দুর্গাধিপতির অধীন একজন সর্দার, অস্ত্রবিশারদ ও নিপুণ যোদ্ধা। মাতৃহীনা কন্যা ভবশঙ্করীও পিতার শিক্ষায় সর্বপ্রকার অস্ত্রচালনা ও অশ্বারোহণে দক্ষতা লাভ করেন। ভুরশুট রাজ রুদ্রনারায়ণের সাথে বিবাহের অল্পদিন পরেই বিধবা হ'ন। পাঠান সর্দার ওসমান খাঁ'র সঙ্গে যুদ্ধে বীরত্ব দেখানোর জন্য আকবর কর্তৃক রায়বাঘিনী উপাধিতে ভূষিত হন। বর্তমানে কোন কোন গবেষক রায়বাঘিনী'র কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে সন্দিহান।

রামকৃষ্ণ রায়—(কবিচন্দ্র) আমতা থানার অন্তর্গত রসপুর নিবাসী ও শিবায়ণ কাব্যরচয়িতা। বর্ধমানরাজ কর্তৃক কবির গৃহ দেবতা রাধাকান্ত জীউ অপহৃত হলে সেই শোকে কবির দেহান্ত ঘটে। বছর চল্লিশেক আগে ভক্তিপদ খাঁ এবং সম্প্রদায় গীত উক্ত ঘটনার গীতরূপের কয়েক পংক্তি

এই রায় বংশে জাত রামকৃষ্ণ খ্যাত
কৃষ্ণ ভক্ত একজন হে
তাঁর প্রতিষ্ঠিত তুমি রাধাকান্ত
প্রবাদে যাহা শুনি হে

* * * *

রসপুর ত্যজিয়া যবে রাধাকান্ত গেল,
হা রাধাকান্ত বলি রামকৃষ্ণ মরিল।

(ডাঃ) রবীন্দ্রনাথ ঘোষ (জঃ ১-৯-১৯২৫) বিবেকানন্দ স্কুলের ছাত্র। ১৯৬৩ খ্রীঃ—যুক্তরাষ্ট্রে American Nucleonies corporation স্থাপন করেছেন। প্রতিষ্ঠানটির কার্যকলাপ সম্পর্কে

সংবাদ পত্রে লেখা হয়েছে Dr. Ghose is responsible for much of his company's developments in the fields of elctronic communications helicopter control systems, Signal Processing and radar velocity systems nuclear effects reach and micro wave compoments. অতএব মানুষের চাঁদে যাওয়ার প্রস্তুতির পিছনে ডঃ রবীন ঘোষেরও অবদান আছে।

[ডাঃ] রামকৃষ্ণ ঘোষ মণ্ডল—মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য হোমিও ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ, সচিব ও সুপারিন্‌টেনডেনট। মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক হোমিওপ্যাথিক সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

শান্তি কুমার মিত্র—সম্পাদক ভূমিলক্ষ্মী।

শ্যামাচরণ কবিরত্ন—পদাঙ্কদূত, রামলীলা, হরিভক্তি, কুন্দরাণীর ছড়া, দানসাগর প্রভৃতির রচয়িতা। শ্যামাচরণ কবিরত্নের বাস ছিল বাজে শিবপুরে। এ অঞ্চলে তাঁর নামে একটি রাস্তাও আছে। পুত্র সরোজ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন শরৎচন্দ্রের বন্ধু ও "অরক্ষণীয়া" গ্রন্থটির ভূমিকা লেখক। পৌত্র বলাই বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যাপক, এ্যাডভোকেট, সু-লেখক এবং ভোটবাগান মঠের অন্যতম ট্রাষ্টি।

[ডাঃ] শম্ভুচরণ পাল—২১, শশীভূষণ সরকার লেন। পেশায় চিকিৎসক, নেশায় সাংবাদিক। কিছুকালের জন্য রাজনীতি ও সমবায় কর্মী। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন, হাওড়া শাখার প্রাক্তন সভাপতি। রবিবাসর, বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন প্রভৃতি সংস্থার সদস্য। প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক-হাওড়া-বার্তা।

শংকরী প্রসাদ বসু—১ বি ওলাবিবিতলা লেন। পৈত্রিক বাসস্থান-হুগলী জেলার নতিবপুর। শিক্ষা-হাওড়া বিবেকানন্দ ইনষ্টিটিউশান এবং কলিকাতায়। রীডার বাংলা বিভাগ কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়। প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ—মহাজীবনের গাথা, সাহিত্য সমালোচনা, জীবন-উপন্যাস, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ক্রিকেটের উপর অনেকগুলি গ্রন্থের রচয়িতা। ছোটদের জন্যও লিখেছেন। বিখ্যাত গ্রন্থ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ [৫ম খণ্ড পর্য্যন্ত]। সাহিত্য সেবার জন্য পুরস্কার—১৯৬৮-এ সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার, ১৯৭৯-এ আনন্দ পুরস্কার এবং ১৯৮০-তে ভাগলপুর শরৎ বার্ষিকী সমিতি প্রদত্ত শরৎ পুরস্কার।

শংকর—[মণি শংকর মুখার্জী] ৫ ৩ লোকনাথ চ্যাটার্জী লেন হাওড়া-২। জন্ম-৭. ১২. ১৯৩৩, বনগ্রামে। ৪ বৎসর বয়সে হাওড়ায় আসেন এবং সেই থেকে হাওড়াবাসী। হাওড়া জিলাস্কুল ও বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ের ছাত্র। কর্মজীবনের প্রারম্ভে তিনি ছিলেন, তাঁর কত অজানারে গ্রন্থের অন্যতম চরিত্র "ব্যারিষ্টার বারওয়েল" সাহেবের "বাবু"। বর্তমানে ডানলপ কোম্পানীর জনসংযোগ অফিসার। ১৯৫০-এ বসুমতীতে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ দিয়েই প্রকাশ্য সাহিত্য জীবন শুরু। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলির কয়েকটি হ'ল—চৌরঙ্গী, জন-অরণ্য, সম্রাট ও সুন্দরী, এ পার বাংলা-ও পার বাংলা স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল। ১৯৬৯-এ পান আনন্দ পুরস্কার। তাঁর বহু গ্রন্থ অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় অনুবাদিত হাওয়ায় তিনি সর্বভারতীয় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। ইংরাজী ও রুশ ভাষাতেও তাঁর বহু গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছে।

একথা বলা বোধহয় অতুক্তি হ'বে না যে একমাত্র তাঁরই গল্প উপন্যাসের মাধ্যমে হাওড়ার অনেকগুলি জায়গা আধুনিক ভারতীয় পাঠকবর্গের নিকট সুপরিচিত হয়ে উঠেছে, তাঁর উপন্যাসের বহু বিশিষ্ট চরিত্রের যাতায়াত ঘটেছে হাওড়ার বিভিন্ন অঞ্চলে।

[ডাঃ] শীতলচন্দ্র ঘোষ—প্রথিতযশা এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসক। ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দে সাঁত্রাগাছি কেদার নাথ ইন্‌ষ্টিটিউশনের ছাত্র হিসাবে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৫০-এ এম বি এবং

১৯৫৯-এ এম. ডি উপাধি লাভ করেন। কলিকাতা মেডিকেল কলেজে অধ্যাপনা এবং Mycardial Infraction এবং Thalatesia বিষয়ে গবেষণা করেছেন। ছাত্রবস্থাতেই ভারত-ছাড়' আন্দোলনে জন্য হাওড়া কোর্টে অন্তরীণ ছিলেন।

শৈলচক্রবর্তী—পৈত্রিক বাসস্থান আন্দুল মৌড়ী। চিত্রশিল্পী এবং শিশুসাহিত্যে ছড়া, কাহিনী প্রবন্ধ, প্রভৃতি রচনা করে যশস্বী হয়েছেন। গাড়ি-ঘোড়ার গল্প, মানুষ এলো কোথা হ'তে এবং ছোটদের ক্র্যাফট প্রভৃতি নটি বইয়ের জন্য শিশুসাহিত্যের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছেন।

শংকর মিত্র—হাওড়া নিবাসী কবি, ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক। সম্পাদক-বর্ণপরিচয় কিশোরদের কাগজ (মা)। হাওড়ার একটি প্রথম শ্রেণীর সওদাগরী অফিসের দায়িত্বশীল পদে কর্মরত।

শিবেন চট্টোপাধ্যায়—শিবপুর। শিক্ষক। কবি।

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় শিবপুর। গ্রন্থ-পাণ্ডব গোয়েন্দা।

সুধাকৃষ্ণ বাগচী—বাগনান। গ্রন্থসমূহ পুণ্যেরজয়, বাঙালীর সমাজ ফুলদানী, কুমার ভীমসিংহ, স্বদেশকুসুম, শিল্প-বিজ্ঞান প্রভৃতি।

[ডঃ] সরোজকুমার বসু খড়িয়প, আমতা, মৃত্যু-১ ৩ ১৯৭২। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিভাগের প্রাক্তন প্রধান। ব্যাঙ্কিং, শিল্প ও অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ এবং এই সম্পর্কে বহু গ্রন্থের রচয়িতা।

সুফি মধুমিঞা ওরফে মুন্সীময়েজ উদ্দীন আহমেদ ব্যাতোড়। শাস্তিক। বা হজরৎ মহম্মদ [দুইখণ্ড], মধুসঙ্গীত, তুরস্কের ইতিহাস, ইসলাম প্রভৃতির গ্রন্থকার।

সত্যনারায়ণ খাঁ—জগৎবল্লভপুর, বিশিষ্ট চিত্র প্রযোজক। বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় স্থাপন প্রভৃতি বহু জনহিতকর কর্যের সহিত যুক্ত ছিলেন।

সুধাংশু রঞ্জন ঘোষ—৮, দেবনাথ ব্যানর্জী লেন, জন্ম-১৯২১ খ্রীঃ।

মৌলিক রচনা—অগ্নিগন্ধা, সুরমিতার মন, রামায়ণী প্রেম কথা। অনুবাদ—সম্পূর্ণ সেক্সপীয়ার, হোমার, দান্তে, মোঁপাসা এবং গ্রীক নাটক সমূহ।

[ডঃ] সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়—৫৩/১/৩/১/৩/এ ধর্মতলা লেন, হাওড়া-২। জন্ম-১৮.৮.১৯৩৭। সচিব, স্নাতকোত্তর কলা, বাণিজ্য, সাংবাদিকতা, শিক্ষা, গ্রন্থ বিজ্ঞান বিভাগ এবং অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ডেপুটি ডিরেক্টার, বাংলা সাহিত্য একাডেমি। পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের লোকসাহিত্য গ্রন্থটির জন্য প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি পান। অন্যান্য গ্রন্থ সমূহের মধ্যে দুটি বিশিষ্ট গ্রন্থ হ'ল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও লোকসাংস্কৃতির চর্চা [আশুতোষ স্বর্ণপদক প্রাপ্ত] এবং বাংলা উপন্যাসে লৌকিক উপাদান। তাঁর সাম্প্রতিকতম গ্রন্থটি হ'ল-বাংলা নাটকে লৌকিক উপাদান। যুগ্ম সম্পাদক –রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট অফ্ ফোক কালচার, ওয়েষ্টবেঙ্গল।

১৭-২২ আগস্ট ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে কানাডা'র উইনিপেগ শহরে ইউনির্ভাসিটি অফ্ মানিটোবাতে অনুষ্ঠিত চতুর্দশ ধর্ম-ইতিহাস আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করেন ও বাংলার লোকধর্মে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বিষয়ে একটি গবেষণা মূলক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সম্মেলন শেষে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসক হিসাবে কানাডা, আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের বহু বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন।

[আচার্য] সর্বেশ্বর গোস্বামী—বীরশিবপুর বৈষ্ণববেদান্ত মঠের প্রধান, বৈষ্ণব ধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য সম্প্রদায়ের আচার্য। ব্রহ্মসূত্রম [শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভাষ্যম্] সহ বহু গ্রন্থ রচয়িতা।

সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়—১৪/২ ধর্মতলা লেন, হাওড়া-২ জন্ম-১৯৩৫ খ্রীঃ। শিক্ষাব্রতী ও সাহিত্যিক। মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক

হিসাবে কর্মজীবন শুরু, বর্তমানে অধ্যক্ষ। পত্রিকা সম্পাদনা—সুকান্ত। রেডক্রস, জেলা পাঠাগার প্রভৃতি বহুজন কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত। সেক্রেটারী, শিশুতীর্থ গ্রুপ অব স্কুলস্। গ্রন্থাদি—পুনর্মূল্যায়ণে শরৎচন্দ্র ও মহাপ্রাণ শরৎচন্দ্র (প্রবন্ধ) নরক (উপন্যাস) প্রভৃতি।

সন্ন্যাসী চরণ সাধুর্খা—১৫ যাদব দাস লেন। জন্ম-৩১.৮.১৯০৫। মৃত্যু—২০.২.১৯৮২। প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক-দীনবন্ধু ইন্‌ষ্টিটিউশান (ব্রাঞ্চ)। কল্লোল কালি-কলম, উপাসনা, নবশক্তি, বিজলী প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা লিখতেন। কাব্যগ্রন্থ-কাঁটা ও রক্ত গোলাপ।

সুরেন্দ্র নাথ দাস—২৫.৮.১৮৮৩—১৪.১.১৯৮১। পৈত্রিক নিবাস মাজুগ্রাম। পিতা অভয়চরণ Indian Ryot নামক পুস্তকের প্রণেতা। সুরেন্দ্র নাথ বাঁটরা স্কুলে ক্লাস নাইন পর্য্যন্ত পড়ে ১৮৯৮-এ গভঃ আর্ট স্কুলে ভর্তি হ'ন এবং ১৯০৩-এ শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন। হ্যাভেল সাহেবের ছাত্র সুরেন বাবুর বিখ্যাত ছবি শকুন্তলা ১৯২৪-এ ভারত সরকার এটিকে লণ্ডনে বিশ্ব প্রতিযোগিতায় পাঠান। ১৯২৫-এ কাশীর ভারতধর্ম মহামণ্ডল তাঁকে শিল্পরত্ন উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৫৪'র রাজ্য সরকার তাঁর অঙ্কিত ক্রুশ্চেভ ও বুলগানিনের দু'টি তৈলচিত্র সোভিয়েত নেতৃবৃন্দকে উপহার দেন।

১৯৩৯-এ তিনি মেটালিক ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস-এর প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিদেশ থেকে "জ্যাক" আসা বন্ধ হ'লে নিজে ডিজাইন করে ১-১০০ টন "জ্যাক" এই কারখানায় তৈরী করান। রেলে প্রথম তাঁরই তৈরী দিশী জ্যাক ব্যবহৃত হয়।

১৯১৪'য় তিনি একটি ট্রেন দুর্ঘটনা নিরোধক যন্ত্র তৈরী করে পেটেন্ট নেন। এই নিয়মে ইঞ্জিনের সামনে একটি ফ্যানকে চালু করলে কম ভোল্টের ডি. সি. কারেন্ট তৈরী হ'বার পর সেটি রূপান্তরিত হ'বে লো-ফ্রিকোয়েন্সি এ. সি-তে। যদি কখনও দু'টি

১১

রেল এঞ্জিন নির্ধারিত দূরত্বের মধ্যে মুখোমুখি হয় তাহ'লে বিদ্যুৎ চালিত ভ্যাকুয়ামব্রেক গাড়ি থামিয়ে দেবে। স্যার আশুতোষের সুপারিশ সত্বেও রেল কোম্পানী এটি গ্রহণ করেন নি। তিনি নিজের হাতে কাঁচ ঘষে দূরবীন এবং একটি বৈদ্যুতিক ঘড়িও তৈরী করেছিলেন। জ্ঞানের আলো নামক পুস্তক এবং কিছু কবিতা তাঁর সাহিত্য-কৃতির নিদর্শন। পুত্র শ্যামল দাসের বাস রাজ বল্লভ সাহা লেনে।

[ডাঃ] সত্যব্রত বোস—প্রধান, রেডিওলজি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

সিদ্ধেশ্বর ব্যানার্জী—অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে ইংলিশম্যান প্রেসে কর্মজীবন শুরু, শেষ এই প্রেসের প্রধান মুদ্রক হিসাবে। কিছুকাল ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ এবং ষ্টেটসম্যান পত্রিকার সাথেও যুক্ত ছিলেন। ৮১৮২ বৎসর বয়সে শিবপুরে নিজ বাড়িতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে কলিকাতা ও হাওড়ার ভারতীয় এবং ইউরোপীয় জনসমাজ যে বিশেষভাবে মর্মাহত হ'ন ২৯ ৩. ১৯০৬ তারিখের ষ্টেটসম্যানে বিশেষভাবে তা প্রকাশ করা হয়।

সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য—১১৬, কাসুন্দিয়া রোড। রাখাল দাস বিদ্যারত্নের মধ্যমপুত্র। বাল্যবধি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত এবং হাওড়ার রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আশ্রমের কর্মী। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অবিবাহিত থেকে শিক্ষা প্রচারকেই তিনি জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিবেকানন্দ ইনষ্টিটিউশনের শিক্ষকরূপে যোগদান করেন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে হ'ন এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে 'জাতীয় শিক্ষক' রূপে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত হ'ন। ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রধান শিক্ষকরূপে অবসর গ্রহণ করেন। বিবেকানন্দ স্কুলের প্রসার ও উন্নয়ন এবং

ঐ স্কুলের বহু লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ছাত্রদের আদর্শ ও চরিত্র গঠনের পিছনে তাঁর অসামান্য অবদান ছিল। এই প্রসঙ্গে সুধাংশুবাবুর ছোটভাই হিমাংশু ভট্টাচার্যের নামও স্মরণীয়। চিরকুমার হিমাংশুবাবু বিবেকানন্দ স্কুলের আদর্শ শিক্ষকরূপে সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন এবং রামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দ ভাবধারা প্রসারে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন।

হরিপদ চট্টোপাধ্যায়—বঙ্গাব্দ ১২৭৮–১৭ই মাঘ ১৩৩০। কল্যাণপুর, বাগনান। পদ্মিনী, খনাদেবী, জয়দেব প্রভৃতি নাটক রচয়িতা। সংস্কৃত শাস্ত্র প্রকাশ কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠা করে ভাগবত, উপনিষদ ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ প্রকাশ করেন।

হৃষীকেশ ঘোষ—পৈত্রিক নিবাস মেদিনীপুর হলেও ৩৯-এ ধর্মতলা লেন, হাওড়া-২ নিবাসী হৃষীকেশবাবু এখন পুরোপুরি হাওড়ার লোক। জন্ম-১০.১২.১৯১০ খ্রীটাব্দে। প্রবীন সাংবাদিক সাহিত্যিক এবং দেশসেবক। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শেষ পর্যন্ত দৈনিক ও সাপ্তাহিক 'নায়ক' পত্রিকার সহঃ সম্পাদক ছিলেন। তাঁর লেখা পল্লীউন্নয়নমূলক গ্রন্থরাজি ফ্র্যাঙ্কফুর্ট, লণ্ডন ও মস্কোয় সমাদর লাভ করেছে। ইংরাজীতে কবিতা রচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা কুড়িটিও বেশী।

[ডাঃ] হরেন্দ্র নাথ ঘোষ -জন্ম ৩০.১২.১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে পেঁড়ো হরিশপুরে। বর্তমান ঠিকানা-এ ঈ ৫৯২ সেক্টর ওয়ান সল্ট লেক সিটি। নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজের প্রথম ব্যাচের ছাত্র। ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ও শারীর বৃত্তের অধ্যাপক। জীবন বিজ্ঞান ও শারীরবৃত্ত সম্পর্কিত বহু স্কুল ও কলেজ পাঠ্য পুস্তক এবং মডার্ন হিউম্যান জিওলজী শীর্ষক গ্রন্থ প্রণেতা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কয়েকটি প্রাচীন বংশ

কেরাণী বাড়ী

এখন থেকে প্রায় সাড়ে চার শ বছর আগে কাটোয়ার বিপরীত দিকের অজয় নদ তীরস্থ গ্রাম মাটিয়ারি থেকে রেশম শিল্প ব্যবসায়ী বংশের সন্তান মাহিন্ত্য বংশীয় কাশ্যপ দেবরায় দামোদর নদ-তীরবর্তী ঝিকিরা গ্রামে এসে বসবাস এবং সুলতান হুসেন শাহের অধীনে কর্ম স্বীকার করেন। কাশ্যপদেব ঢ্যাং উপাধিধারী প্রজাদের হাতে নিহত হ'লে গর্ভবতী কাশ্যপ-পত্নী প্রাণ ভয়ে পৈত্রিক গ্রাম কাঁকরোলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কাশ্যপদেবের পুত্র দুর্বার রায় মামার বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। বড় হ'য়ে পিতৃপরিচয় শোনার পর তিনি ঢ্যাং-বংশীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে জয়লাভ করেন। সুলতান নসরৎ খাঁ মতান্তরে গিয়াসুদ্দিন মহম্মদ শাহ দুর্বার রায়-কে খাঁ-চৌধুরী উপাধী এবং পৈত্রিক কর্মভার ফিরিয়ে দেন। মৌদগল্য গোত্রীয় দুর্বার খাঁ-র চার ছেলে—কুণ্ডার নারায়ণ রায়, কানাই লাল মল্লিক, চন্দ্রভুষণ হাজরা ও শ্রীধরদাস এবং এক মেয়ে পদ্মাবতী। পদ্মাবতী এক স্বয়ংবর সভায় রাজপুত যোদ্ধা বীরেন্দ্র নারায়ণ সিংহকে পতিত্বে বরণ করায় পদ্মাবতীর পুত্রের বংশধারা আজও গ্রামে স্বয়ংবর গোষ্ঠী নামে পরিচিত।

দুর্বার রায়-এর অধঃস্তন অষ্টম পুরুষ প্রভুরাম অথবা নবম পুরুষ নীলাম্বর রায়ের সময় থেকে এই বংশের একজন রাউতারা গ্রামে বসবাস শুরু করেন এবং কুলদেবতা রূপে দামোদর জীউ'র আটচালা মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠা কাল—১৬০১ শকাব্দ, বাংলা ১০৮৬ সাল, ইংরাজী—১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দ।

১৬৮৭ খ্রীঃ-এ শায়েস্তা খাঁ কর্তৃক উলুবেড়িয়ায় ইংরাজ-কুঠি নির্মাণের অনুমতি এবং পরবর্তী সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ কর্তৃক জব-চার্ণক-কে কলিকাতায় আগমনের অনুমতিদানের ফলে বাংলা দেশে একটি নুতন বানিজ্য-চক্রের সুচনা হয়। নূতন বাণিজ্য-চক্রের সুযোগ গ্রহণ করে নীলাম্বর ও তাঁর পুত্র বাঙ্গারাম অন্যান্য ব্যবসার সংগে রাজগঞ্জে ইট খোলার প্রতিষ্ঠা করেন। সাধুচরিত্র ও ধর্মনিষ্ঠার জন্য বাঙ্গারাম উত্তর জীবনে 'তপস্বী' আখ্যা পান। বাঙ্গারাম ১১৮১ সালে [ইং ১৭৭৫] খানাকুল কৃষ্ণনগরে নিত্যানন্দ সহচর অভিরাম প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথ বিগ্রহের জন্য একটি বিশাল নবরত্ন মন্দির নির্মাণ করে দেন যা আজও স্থাপত্য শৈলীর এক বিশেষ নিদর্শণ রূপে স্ব-মহিমায় বিরাজিত। বৃন্দাবনে গোপীনাথ ঘেরা নামে একটি জায়গায় তিনি বাঙ্গারাম কুঞ্জ স্থাপন করেন এবং পরিণত বয়সে বৃন্দাবনেই দেহত্যাগ করেন। অভিরাম গোস্বামীর বংশধর কৃষ্ণবল্লভ গোস্বামী তাঁর অভিরাম লীলামৃত গ্রন্থে বাঙ্গারাম সম্পর্কে লেখেন—

ঝিখিরা গ্রামে বসতি বাঙ্গারাম রায় খ্যাতি
কর্মজ্ঞান ভক্তিমার্গ সদা আবরিত।
বর্দ্ধমান রাজদ্বারে তাঁর পুত্র কাজ করে
না ছিল কেরাণী তথা 'রামজয়' মত॥
বাঙ্গারাম গৃহ ছাড়ি গঙ্গাতীরে বাস করি
সাধুসঙ্গ কৃষ্ণকথা নাম করেন তিনি
সাধুগণ তাঁর ভক্তি দেখি দিল তাঁর খ্যাতি
তপস্বী শ্রীবাঙ্গারাম রায় গুণমণি॥

বাঙ্গারামের দ্বিতীয়পুত্র রামজয় বিভিন্ন ভাষা ও শাস্ত্রে বুৎপত্তি লাভের পর বর্ধমান রাজ দরবারে উচ্চপদে কর্ম গ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ সে সময় মহারাজ তেজচন্দ্রের পক্ষে তাঁর পুত্র প্রতাপচাঁদ বর্ধমান রাজের কার্য্য পরিচালনা করতেন। নিজ প্রতিভা ও বুদ্ধিবলে রামজয়

বর্ধমান রাজের বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করেন। প্রতাপচাঁদ মূলতঃ তাঁরই পরামর্শে ১২০৯ সালের এক তায়দাদ বলে সমস্ত দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর ও পীরোত্তর সম্পত্তিকে নিষ্কর বলে ঘোষণা করেন। এছাড়া রামজয় বহু লোককে জমি বিলি সহ নানা সু-বন্দোবস্ত করে দেওয়ায় লোকের মুখে মুখে তিনি মান্য রামজয় কেরাণী নামে অভিহিত হ'তে থাকেন। তাঁর রাউতাড়ার বসত বাড়ীটি কেরাণী বাড়ী নামে খ্যাত হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আনন্দিরামের সাহায্যে দামোদর জীউর মন্দিরটি নূতন ও প্রশস্তভাবে তৈরী করার সময় পঙ্খের কাজের সংগে পাশ্চাত্য গথিক পদ্ধতির থাম ও খিলানের সংযোগ সাধন তাঁর শিল্পরুচির পরিচয় বহন করে। ১২০৪ সালে তিনি স্থাপন করেন মাণিকপীরের দরগা। ধর্মীয় উৎসব সমূহ সুসম্পন্ন করার জন্য আনন্দীরাম মালাকার, নরসুন্দর ও গোপ সম্প্রদায়ের কিছু ব্যক্তিকে চাকরাণ জমি বরাদ্দ করে যান, যাতে তারা উৎসব অনুষ্ঠানে উপকরণ সরবরাহ করতে বা ব্যক্তিগত ভাবে সাহায্য করতে পারে। রামজয় বৈষ্ণবধর্মের যে সমস্ত পুঁথির অনুলিপি করান তার মধ্যে আছে সনাতন গোস্বামী [অথবা গোপাল ভট্ট] রচিত হরিভক্তি বিলাস। শ্রীরূপ রচিত বিদগ্ধ মাধবের অনুকরণে যদুনন্দন ঠাকুর রচিত শ্রীরসকদম্ব, ১৭৩৬ খ্রীঃ-এ বরাকর নদীতীরস্থ হাতনল গ্রাম নিবাসী গিরিধর দাসকৃত গীত গোবিন্দের বঙ্গানুবাদ, নিত্যানন্দ দাসের প্রেমবিলাস প্রভৃতি। সবচেয়ে প্রাচীন পুঁথি শ্রীচৈতন্য দাস বিরচিত গীত গোবিন্দের একটি বিখ্যাত বাংলা হরফে লেখা টীকা গ্রন্থ 'বালবোধিনী।' আকারে সব চেয়ে ছোট পুঁথি উত্তবঙ্গের বৃন্দাবন দাস রচিত "গোপিকা মোহন।" লিপিকার বিশ্বনাথ সিংহ "শ্রীরস কদম্ব" গ্রন্থের অনুলিপিতে লেখেন—

শ্রীযুক্ত শ্রীরামজয় কেরানী আখ্যান,
যার তোঁহা মূল্য দিয়া এ গ্রন্থ লেখান।
বর্দ্ধমানে তৈল নাড়ু এতে বাসা তার,
যাহা জানি তাহা এই কহিলা নিদ্ধার ॥

বংশ লতিকা

কাশ্যপ দেবরায়
|
দুর্বার খাঁ
|
প্রভুরাম [অধঃস্তন অষ্টম পুরুষ]
|
নীলাম্বর
|
বাঞ্ছারাম
|
আনন্দিরাম — রামজয় কেরাণী

জুজারসার মান্না বংশ

শাঁখরাইল ষ্টেশনের ৭ মাইল পশ্চিমে জুজারসা গ্রামের অবস্থান। এই মাহিষ্য প্রধান গ্রামটি পূর্ব পশ্চিমে ৩ মাইল এবং উত্তর দক্ষিণে ২ মাইল বিস্তৃত।

কথিত আছে এখানে প্রাচীনকালে গৌড়েশ্বর উপাধিধারী জনৈক হিন্দু নরপতির বাস ছিল। সপ্তগড় বেষ্টিত ২০০ বিঘা পরিমিত ভূমির উপর রাজবাটীর ভগ্নস্তূপ, ১৫০ বিঘা পরিমিত ধনদীঘি, আমলা পুকুর, বামনা পুকুর, প্রমাণখানা, জুজারসা থেকে বর্ধমান পর্যন্ত ৮০ মাইল দীর্ঘ গৌড়েশ্বর জাঙ্গাল নামক রাজপথের ভগ্নাবশেষ এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত সিংহ বাহিনী দেবী আজও নামহীন সেই গৌড়েশ্বরের কীর্তি ঘোষণা করিতেছে।

গৌড়েশ্বরের আমলে আমতার নিকটবর্তী খালনাগ্রাম থেকে রেশম ব্যবসায়ী জনৈক মান্না বংশীয় ব্যক্তি এই গ্রামে এসে বসবাস শুরু করেন। বর্তমান মান্না বংশের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন পুরুষের নাম

মাধবচন্দ্র মান্না। মাধবচন্দ্রের ভাই বংশীধর রেশমের কারবারে বিশেষ উন্নতি লাভ করেন। বংশীধর বাবু দারহাটায় (হুগলী জেলা) যে রেশমের কুঠী ছিল তাহার রেশম খরিদের প্রধান কর্মচারী ছিলেন। ১২৪৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন মাধবচন্দ্রের পুত্র প্রিয়নাথ মান্না। ইনি অন্যূন ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে যে দ্বিতল হাওয়াখানা নির্মাণ করান সে সময় ইহার ন্যায় নয়ন মুগ্ধকর ও মূল্যবান ইমারত এ অঞ্চলে ছিল না। বাজে শিবপুরে প্রিয়নাথ মান্না বস্তি লেন নামে একটি রাস্তা আছে। প্রিয়নাথের ভাই প্রাণনাথের পুত্র গগনচন্দ্র কলিকাতায় লোহার কারবারে প্রভুত অর্থ উপার্জন ও নিমাবালিয়া'য় জমিদারী ক্রয় করেন। ১৩১১ সালে নিমাবালিয়ায় শশীভূষণ মণ্ডল কর্তৃক নির্মিত রথের সেবার জন্য গগনবাবু কিছু ভূ-সম্পত্তি দান করেন।

বালীর দত্তবংশ

দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজে অন্ততঃ চারিপ্রকার দত্ত উপাধির সন্ধান পাওয়া যায়; ভরদ্বাজ গোত্রীয় বালীর দত্ত, মৌদ্‌গল্য গোত্রীয় বটগ্রামের দত্ত, কাশ্যপ গোত্রীয় বটগ্রামী দত্ত এবং কল্কীশ গোত্রীয় বিষাটিয়া'র দত্ত। এঁদের মধ্যে বালী ও বটগ্রামের খ্যাতিই সর্বপেক্ষা অধিক।

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজন্যকাণ্ড এবং যশোহর—খুলনার ইতিহাস-২য় খণ্ডে দত্তবংশের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে অনেক কিছু তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

আদিশূরের সভায় যে পঞ্চকায়স্থ বীজপুরুষ আসেন, তন্মধ্যে মৌদ্‌গল্য গোত্রীয় পুরুষোত্তম দত্ত অন্যতম; তিনি বটগ্রাম-শাসন লাভ করে সেখানে বাস করতে থাকেন। কিছুকাল পরে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রাজা রণশূর যখন দক্ষিণ রাঢ়ের (তক্কন্ লাড়ম্) অধিপতি তখন কাঞ্চীপুরপতি মহারাজ রাজেন্দ্র

চোল রাঢ়বঙ্গ আক্রমণ করেন। সম্ভবত সেই সময় ভরদ্বাজ গোত্রীয় দ্বিতীয় এক পুরুষোত্তম দত্ত রাজেন্দ্র চোলের সঙ্গে রাঢ়-বঙ্গে আসেন এবং কিছু ভূ-সম্পত্তি লাভ করে বালীগ্রামে বসবাস শুরু করেন। এ সম্পর্কে দক্ষিণ রাঢ়ীয় ঘটক গ্রন্থে লেখা আছে

বীজী পুরুষোত্তমদত্ত সদাশিব অনুরক্ত
কাঞ্চীপুর হইতে গৌড়দেশে
শ্রীবিজয় মহারাজ অহঙ্কারী সভামাঝ
কুলাভাব হইল নিজ দোষে॥

কথিত আছে পুরুষোত্তম হাতীর পিঠে চেপে এসেছিলেন। পুরুষোত্তম বালী থেকে গৌড়াধিপতি বিজয় সেনের রাজসভায় যান। উদ্ধত ভাবহেতু মৌদ্‌গল্য দত্তের মত ইহারও কুলাভাব ঘটে। কুল না থাকিলেও সমাজে তাঁর খ্যাতি ছিল বিপুল। বালীর দত্তগণের নানা শাখা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে বসতি বিস্তার ও প্রসিদ্ধি লাভ করেন। নড়াইলের (খুলনার) রায়, দত্ত ও সরকার উপাধিযুক্ত, সাহসের দত্ত-চৌধুরী, মৌ ভোগের রায়চৌধুরী, ভগবান নগরের রায়, সেনহাটির মুস্তৌফি এবং সিদ্ধিপাশা, কচুন্দী, মুক্তীশ্বরী ও ধোপাদি স্থানের দত্তগণ বালীর দত্তবংশের শাখা।

নড়াইলের দত্তগণ—পুরুষোত্তম থেকে অধস্তন ১৯ পর্য্যায়ভুক্ত নারায়ণ দত্ত মুর্শিদাবাদের চৌড়া গ্রামে বাস করতেন। তাঁর দুই পুত্র মদনগোপাল ও মুকুন্দরাম। মদনগোপালের প্রপৌত্র কালীশঙ্কর রায় নড়াইলের জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা।

"যশোহর-খুলনার ইতিহাস-২য় খণ্ড" অনুসারে যশোহর জেলার অন্তর্গত নড়াইলের রায় উপাধিযুক্ত কায়স্থ জমিদারগণ সম্পত্তিশালিতায় ও বংশমর্য্যাদায়, সঙ্গতি প্রভাবে ও শাসন প্রতাপে, শিক্ষা গৌরবে ও দেশময় প্রতিপত্তি-সূত্রে ইহারা সমগ্র বঙ্গের মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ

জমিদার বংশ। ইহাদের আবির্ভাব নবাবী ও ইংরাজী উভয় আমলের সন্ধিস্থলে। ইহারা দত্ত উপাধিধারী, দক্ষিণ রাঢ়ীয় মৌলিক কায়স্থ। ইহারা ভরদ্বাজ গোত্রীয় "বালীর দত্ত" ও গোষ্ঠীপতি বলিয়া খ্যাত। "বালীর দত্ত কুলের কান্দা, যার দুয়ারে হাতী বান্ধা "এ প্রবচন ইহাদের সম্বন্ধেই খাটে।

হাটখোলার দত্ত-চৌধুরী বংশ—হাটখোলার দত্তদিগের পূর্ব-পুরুষ গোবিন্দ শরণ বাদশাহী জায়গীর পেয়ে (অথবা ইংরাজদের সংগে বাণিজ্যের সুবিধার্থে) আন্দুল থেকে গোবিন্দপুরে আসেন, যে গোবিন্দপুর কালক্রমে সুতানুটি ও কলিকাতা গ্রামের সংগে মিশে গিয়ে কলিকাতা শহরের সৃষ্টি করে। গোবিন্দ শরণের পৌত্র রামচন্দ্র ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে গোবিন্দপুরের জমিবদল করে হাটখোলায় এসে বসবাস শুরু করেন। এঁর পৌত্র মদনমোহন দত্ত ছিলেন সে-যুগের কলকাতার একজন দানশীল ও স্বনামধন্য পুরুষ।

মৌ-ভোগের দত্ত চৌধুরী বংশ—বালীর পুরুষোত্তম দত্তের ১৯তম অধস্তন পুরুষ রামসন্তোষ দত্ত অথবা তাঁর কোন পূর্ব পুরুষ কখন এবং কেন হাতিয়াগড়ে যান তা জানা যায় না। "তবে তাঁহারা যে" যশোহর-খুলনার ইতিহাসকার সতীশচন্দ্র মিত্র বলেন "বাণিজ্যবলে অর্থশালী হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের বাণিজ্য পোত সপ্তগ্রাম হইতে চট্টগ্রাম যাতায়াত করিত তাহা শুনিয়াছি।" খুলনার মৌভোগে ছিল ইহাদের জমিদারী।

বালীর ঘোষ বংশ

দত্ত বংশের মত ঘোষ বংশও বালীগ্রামের গৌরব বৃদ্ধি করেন। কায়স্থদিগের মধ্যে যাঁরা বল্লাল যুগে রাঢ়ের দক্ষিণভাগে ভাগীরথী প্রবাহের দক্ষিণ (ডানদিক) কূলের অধিবাসী ছিলেন তাঁরাই দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজভুক্ত হন। এঁদের মধ্যে সৌকালিন ঘোষ, গৌতম

বসু ও বিশ্বামিত্র গোত্রীয় মিত্র এই তিন ঘর কুলীন। কুলীনদের প্রত্যেক ঘরের দু'টি করে সমাজ ছিল। ঘোষদিগের সমাজ বালী ও আকনা, বসুদিগের মাহি নগর ও বাগাণ্ডা এবং মিত্রদিগের বড়িষা ও টেকা।

বল্লাল সেন অথবা দনৌজা মাধাবর সময়ে দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলবিধি প্রণীত হয়। গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের উজীর মাহিনগর সমাজের প্রসিদ্ধ কুলীন পুরন্দর খাঁ (গোপীনাথ বসু) সকল কুলীনের সমীকরণ বা একষায়ী করে নবরঙ্গকুল গঠন ও পূর্বতন কুলবিধির সংস্কার সাধন করেন। পুরন্দর খাঁ যখন এয়োদশ পর্যায়ের কুলীনদিগকে একষায়ী করেন তখন মাহী নগরের বসুগণ ৭ বার এবং বালী সমাজের ঘোষগণ ছয়বার প্রকৃত রাজ নামে সর্বাগ্রগণ্য হন।

চতুর্দশ পর্য্যায় থেকে বালীর ঘোষগণের প্রধান ধারা এইরূপ ১৪ গণপতি—জগন্নাথ—শিবানন্দ—রতিকান্ত—রাজেন্দ্র—গোস্বামী দাস—ভরতচন্দ্র রামদেব—রামেশ্বর—হরেকৃষ্ণ—ব্রজকিশোর—২৫ চণ্ডীচরণ। চণ্ডীচরণের পুত্র কৃষ্ণচরণের সময় কলিকাতায় হিন্দু সমাজের দুই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হলেন সাতুবাবু ও লাটুবাবু।

গোস্বামী দাস নবাবের দেওয়ান ও দাঁতিয়া পরগণার জমিদার রুক্মিণীকান্ত মিত্র চৌধুরীর কন্যাকে বিয়ে করে খুলনার অন্তর্গত কুমিরায় বাস করতে থাকেন। বালী সমাজের ঘোষ কুলীনগণের বিভিন্ন শাখা বাঘুটিয়া, কুমিরা, গোণালি, মহিষখোলা, বিভাগদি, কাটিপাড়া, চৌগাছা, পোলো-মাগুরা, বাসড়ী ও কুরিগ্রামে বসতি স্থাপন করেন। খুলনা জেলার পোলো, মাগুরার ঘোষ বংশে অমৃত বাজার পত্রিকা-সম্পাদক শিশির কুমার ও মতিলাল ঘোষ এর জন্ম।

বেলুড়ের ঘোষ সরকার হালদার বংশ

সদেগাপ বংশীয় তেজশেখর ঘোষ ছিলেন বাঁকুড়ার কোন এক অংশের সামন্তরাজ। পাঠানদের হাতে পরাজিত হ'য়ে সপরিবারে

অধুনা হুগলী জেলার অন্তর্গত ভদ্রেশ্বর এলাকায় এসে নূতন বসতি স্থাপন করেন। হাওড়া ও হুগলীর বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ইনি নূতন এক জমিদারীর পত্তন করেন। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে তাঁর সমগ্র জমিদারী হুগলী কালেক্টরটের ১৮৫ নং তৌজীভুক্ত ছিল। ১৮৫২ খ্রীঃ-এ ঐ তৌজীর দু-আনা অংশ (⅛ ভাগ) দুর্গা ঠাকুরের নামে দেবোত্তর সম্পত্তি রূপে পরিগণিত এবং ৩৪৮৩ তৌজীতে নামান্তরিত হয়। আরও পরে ইহা হাওড়া কালেক্টরেটের ৬৮৮ তৌজীরূপে রূপান্তরিত হয়। এই অংশে ছিল বোরো পরগণার অন্তর্গত মৌজা বাদে শিবপুর। মোটজমি ৬৯ বিঘা ১২ কাঠা ১০ ছটাক, ১৮৫২ খ্রীঃ-এ যার খাজনা ছিল ৩৭৮ টাকা এগার আনা এগার পাই। এই আয়ের ভিতর সরকারে দেয় ছিল ২৮ টাকা সাত আনা ছয় পাই।

১৮৫২ খ্রীঃ-এ (১২৫৯ বঙ্গাব্দ) সেবাইত ছিলেন নবকৃষ্ণ, গোবিন্দ চন্দ্র, ঈশানচন্দ্র, দীননাথ ও যদুনাথ ঘোষ। প্রজাদের মধ্যে ছিলেন কেই সাহেব ও চু সাহেব। মোটামুটি কেইসাহেব ২৯ বিঘা জমির জন্য খাজনা দিতেন ৪৭ টাকা আর চুসাহেব পৌনে পাঁচ বিঘার জন্য ১০ টাকা ১২ আনা ১১ গণ্ডা। বর্তমানে চু সাহেব-এর জমির একাংশের নাম প্রিয়নাথ মান্না বস্তি লেন। ১৯১০ খ্রীঃ এই বংশের একব্যক্তি জ্ঞানেন্দ্র নাথ স্থায়ীভাবে বেলুড়ে বাস করতে থাকেন। এঁর পুত্র নীলরতন বর্তমানে দেবোত্তর সম্পত্তির ম্যানেজিং সেবাইত।

বালীর মিত্র বংশ এবং গোকুল মিত্র

বিশ্বামিত্র গোত্রীয় জনৈক কালি মিত্র বর্তমান বাঙালী কায়স্থ মিত্রদিগের পূর্ব পুরুষ হিসাবে আদিশূরের রাজ্যকালে বাংলায় আসেন। কালি মিত্রের উত্তর পুরুষগণ প্রথমে গৌড় পরে বড়িশায় বসবাস করিতে থাকেন। লম্বোদরের

পুত্র পরমেশ্বর মিত্র বড়িশা থেকে বালীতে এসে বসবাস শুরু করলেও পরিচয় দিতেন "বড়িশা'র মিত্র" বলে। পরমেশ্বরের অধঃস্তন সপ্তমপুরুষ সীতারাম মিত্র ১৭৪২ খ্রীঃ-এ কলকাতার বাগবাজারে এসে বনকেটে নতুন করে বসতি স্থাপন করেন। সীতারামের পুত্রই স্বনাম ধন্য গোকুল মিত্র যিনি বিষ্ণুপুর রাজ গোপাল সিং-কে তিন লক্ষ টাকা ধার দিয়ে তাঁর গৃহ দেবতা মদন মোহনকে বাঁধা রাখেন কিংবা মতান্তরে ঐ টাকায় কিনে নেন এবং বাগবাজারে মদনমোহনের নূতন মন্দির নির্মাণ করান। চক্রপানি নামে লম্বোদরের যে কাকার বংশধরগণ বালীতে আসেন নাই সেই বংশের সন্তান যশোহর খুলনার ইতিহাসকার সতীশচন্দ্র মিত্র।

গোকুল মিত্র বালীর বসত বাড়ীটি পুরোহিতকে দান করেন। এক সময় বালীর একাংশের পরিচিতি ছিল মিত্র ডাঙ্গা, একথা গোকুল মিত্রের প্রপৌত্র রায় বিহারী মিত্র বাহাদুর লিখিত মিত্র-রহস্য (পৃঃ-৮৪৬) গ্রন্থ পাঠে জানা যায়। কথিত আছে গোকুল মিত্রকে পুরী যাওয়ার পথ সুগম করার জন্য উলুবেড়িয়া থেকে জঙ্গল কাটতে কাটতে যেতে হয়েছিল।

বংশ লতিকা

লম্বোদর মিত্র (বড়িশা)
|
পরমেশ্বর মিত্র (বালী)
|
দানপতি
|
জয়দেব

জয়দেব
|
ষষ্ঠীবর
|
শ্রীকান্ত
|
শিবরাম
|
কৃষ্ণরাম
|
সীতারাম (বালী থেকে বাগবাজারে আসেন)
|
গোকুল মিত্র

আন্দুল রাজবংশ

উচ্চশ্রেণীর কায়স্থ। মৌলিক উপাধি কর। মুসলমাল আমলে উপাধি হয় রায়। আন্দুল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রামচরণ বা রামচাঁদ রায় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কিছুপূর্বে ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উকিল হিসাবে কলিকাতায় কাজে নিযুক্ত হ'ন। মহিনা ছিল মাসিক ২০৲, উপরন্তু পেতেন বাড়ীভাড়া ৩৲ এবং পিওন বাবদ ৫টাকা। কিছুকাল পরে মুর্শিদাবাদে বদলী হ'বার সময় বেতন স্থির হয় মাসিক ৭০৲ এবং বাড়ী ভাড়া, পিওন প্রভৃতির জন্য ২৮ টাকা। পলাশীর যুদ্ধের পর হন ৬০৲ টাকা বেতনের দেওয়ান। প্রবাদ সিরাজদ্দৌলার ধনাগার লুণ্ঠনের সময় তিনি বেশ কিছু অর্থসম্পদের মালিক হ'ন। কিছুকাল জেনারেল স্মিথের দেওয়ান হিসাবে কর্তব্যরত ছিলেন। ক্লাইভের

দ্বিতীয়বার কলিকাতায় আগমনের পর তিনি তাঁর দেওয়ান নিযুক্ত হ'ন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানি দেবার পর বাদশা শাহ আলম ক্লাইভের অনুগত কিছু ব্যক্তিকে উপাধি বিতরণের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। ক্লাইভ রাজা উপাধির জন্য রামচরণের নাম সুপারিশ করতে চাইলে রামচরণ নিজের পরিবর্ত্তে পুত্র রামলোচনের নাম পেশ করেন। অনন্তর ক্লাইভের সুপারিশ অনুসারে শাহআলম রামলোচনকে "রাজা" উপাধি, ৫০০০ সৈনিকের অধিনায়কত্ব করার অধিকার, ঝালর দেওয়া পাল্কী এবং রাস্তায় বেরুলে সামনে কাড়া-নাকড়া বাজাবার অধিকার ও ৪ ফুট ৭ ইঞ্চি দীর্ঘ এবং ৩ ইঞ্চি মুখগহ্বরের ব্যাস বিশিষ্ট একটি কামান উপহার দেন। রামচরণের কর্ত্তব্য নিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হ'য়ে হেষ্টিংস তাঁকে ঝোড়হাট গ্রামটি নিষ্করদান করেন, মীরজাফর দেন কোলেড়া ও অন্যান্য কয়েকটি গ্রাম এবং মীরকাশিম একটি পরগণা। মৃত্যুকালে রামচরণের সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৭২ লক্ষ টাকা, হুণ্ডী ও জমিদারীতে ১৮ লক্ষ টাকা, ২৫ লক্ষ টাকার অলংকার, একটি সোনার এবং ৩২০টি রূপার কলসী।

রামচরণের পুত্র রামলোচন সামরিক দিক থেকে ছিলেন বাংলার নবাব নাজিমের আদেশানুবর্তী। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে হ'ন গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট-এর দেওয়ান। মহারাজ নন্দকুমারের বিরুদ্ধে মামলায় তিনি ছিলেন সরকারী পক্ষের প্রধান সাক্ষী। হেষ্টিংস তাঁকে মহিষাদল মৌজা জায়গীর দেন, পরে রাণীর অনুরোধে তিনি আবার সেটি পুরানো অধিপতিকেই ফেরৎ দেন। শিক্ষানুরাগী ও দানশীল এই ভূস্বামী সরস্বতী নদীতীরে বসতি স্থাপন এবং ১৭৭১ খ্রীঃ-এ আন্দুলাব্দের প্রচলন করেন।

রামলোচনের পুত্র কাশীনাথ আন্দুলের অন্নপূর্ণা দেবীর মন্দির নির্মাণ করান। কাশীনাথের পুত্র রাজনারায়ণ কায়স্থ কুলের

গৌরববৃদ্ধির জন্য শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের সহায়তায় কায়স্থ কৌস্তভ নামক গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটিতে প্রমাণ করা হয়েছে যে কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় এবং উপবীত ধারণের অধিকারী। তিনি সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন এবং দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, গোয়ালিয়র থেকে যে সব সঙ্গীতজ্ঞ কলকাতায় আসতেন তাঁদেরকে আন্দুলে আমন্ত্রণ জানাতেন। তিনি নানাভাবে সংস্কৃত সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছেন।

কাশীনাথের পুত্র রাজনারায়ণ। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণর জেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ড তাঁর রাজাবাহাদুর উপাধি অনুমোদন করেন এবং এই উপলক্ষে তাঁকে সম্মানসূচক একপ্রস্থ পরিচ্ছদ রত্নখচিত একটি তরবারি ও একটি ছুরিকা প্রদান করেন।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের ৪৬ সংখ্যক কলিকাতা গেজেটে এ বিষয়ে প্রকাশিত সংবাদটি হ'ল—

Fortwilliam 18th May 1835

The Honorable Governor-General in council has been pleased to confer upon Babu Raj Narain Roy Zeminder of Andul, the dignity and title of Raja and Bahadur.

SD/W. H. Macnaighton
Secretry of the Government of India.

সংস্কৃত চর্চার অন্যতম পীঠস্থান হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করায় রাজনারায়নের আমলের আন্দুলের আখ্যা হ'য় দক্ষিণের নবদ্বীপ।

রাজনারায়ণের পুত্র বিজয়কেশব অপুত্রক অবস্থায় মারা যাওয়ায় জমিদারীর মালিক হ'ন রাজা কাশীনাথের জামাতা কোন্নগর নিবাসী কালীপদ মিত্রের দ্বিতীয় পুত্র ক্ষেত্রকৃষ্ণ। তিনি উলুবেড়িয়া কলেজ্বা

হাঁসপাতাল বিদ্যালয় স্থাপন, পথনির্মাণ প্রভৃতি বহু জনহিতকর কাজে অর্থদান করেন।

ক্ষেত্রকৃষ্ণের মৃত্যুর পর আন্দুল জমিদারী বড় তরফ ও ছোট তরফ এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়।

বংশ লতিকা

দেওয়ান রামচরণ রায়
|
রাজা রামলোচন রায় [? — ১৭৮৬ খৃঃ]
|
রাজা কাশীনাথ [১৭৮৬-১৮১৫ খৃঃ]
|
রাজা রাজনারায়ণ [১৮০৯-১-৪৯খৃঃ] — কন্যা = কালীপদ মিত্র
রাজা রাজনারায়ণ → রাজা বিজয়কেশব [অপুত্রক]
কন্যা = কালীপদ মিত্র → ক্ষেত্রকৃষ্ণ মিত্র

আন্দুলের মল্লিকবাড়ী ও হাওড়ার মল্লিকফটক

আন্দুল মল্লিক বাড়ীর কৃতীসন্তান কাশীনাথ মল্লিক ছিলেন লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় কটকের দেওয়ান। কাশীনাথের পুত্র জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক-ই প্রথম হাওড়াবাসী যিনি ২৪.৭.১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা থেকে সংবাদ রত্নাবলী নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের একটি মামলায় তিনি সম্বাদ-ভাস্কর পত্রিকার সম্পাদক গৌরীশংকর ভট্টাচার্য্যের জামীনদার ছিলেন। জগন্নাথ প্রসাদের দুই পুত্র যোগেন্দ্র ও নগেন্দ্র। যোগেন্দ্র নাথ অপুত্রক এবং নগেন্দ্র নাথের একটি মাত্র কন্যা—গিরিবালা

মিত্র। যোগেন্দ্র নাথ ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে Andul H. C. E school প্রতিষ্ঠা করেন।

মল্লিকেরা ১৮২২ খৃষ্টাব্দের কোন এক সময় হাওড়া শহরের দশআনা জমিদারীর কিছু অংশ কেনেন। জি. টি. রোড থেকে গঙ্গায় যাবার পথের একদিকে ছিল এঁদের কাছারী বাড়ী যার প্রবেশ দ্বারে ছিল কারুকার্য্যময় এক ফটক। সেই ফটক থেকেই এলাকাটির নাম হয় মল্লিক ফটক। রামকৃষ্ণপুরের মল্লিকবাড়ীর দুই কৃতীপুরুষের নাম গোকুলনাথ মল্লিক ও শ্রীনাথ মল্লিক।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে মল্লিকদের রামকৃষ্ণপুরের সম্পত্তি কলিকাতার মতিলাল শীলের নিকট বাঁধা পড়ে এবং ক্রমে হস্তান্তরিত হয়।

আন্দুলের ভট্টাচার্য পরিবার

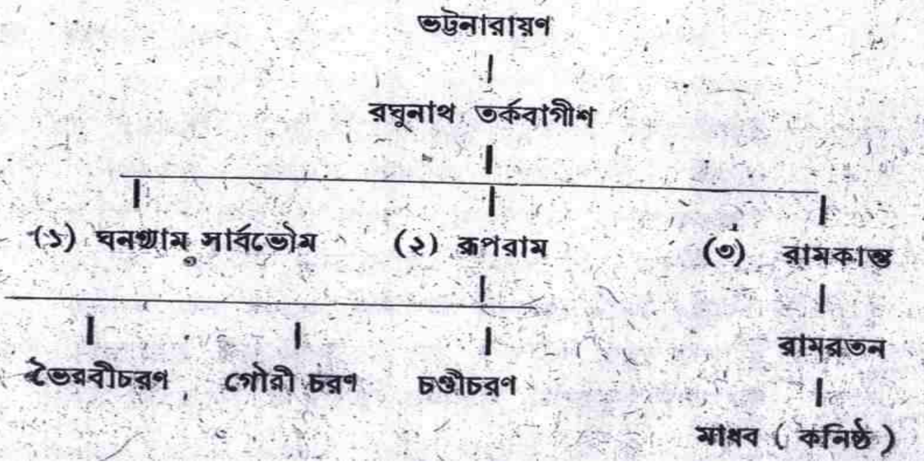
আন্দুলের ভট্টাচার্য পরিবার শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ন'পাড়ী বন্দ্যঘটীবংশীয়। কান্যকুব্জাগত ভট্টনারায়ণের অধঃস্তন ২৪তম পুরুষ আন্দুল নিবাসী রঘুনাথ তর্কবাগীশ সম্পর্কে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তাঁর তন্ত্রসার গ্রন্থের ভুমিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় লিখেছেন—"সেখানি [রঘুনাথ রচিত আগমতত্ত্ব বিলাস শীর্ষক গ্রন্থটি] গ্রহবিয়ৎ ষটচন্দ্র শ'কে ন'পাড়ী বন্দ্যঘটীবংশীয় রঘুনাথ তর্কবাগীশ কর্ত্তৃক রচিত।" অর্থাৎ ১৬০৯ শকাব্দে রঘুনাথ তর্কবাগীশ রচনা করেছিলেন আগম তত্ত্ববিলাস। রঘুনাথের দ্বিতীয় পুত্র রূপরামের প্রথম পুত্র ভৈরবী চরণের বিদ্যাবত্তার গুণে আন্দুলের আখ্যা হয় দক্ষিণের নবদ্বীপ। রঘুনাথের অপর এক পৌত্র রামরতন ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে মারা গেলে তাঁর দুই পত্নী নারায়ণী ও বৈষ্ণবী শিবপুর ব্রহ্মময়ীঘাটে সতী হ'ন। রামরতনের কনিষ্ঠ পুত্র মাধব শারদীয়া মহাপুজা নিরঞ্জন প্রকরনীয়া ব্যবস্থা বাংলায় অনুবাদ করেন। গ্রন্থটি আন্দুলরাজ সভা হইতে প্রকাশিত হয়। মাধবের পুত্র মহেন্দ্র প্রসিদ্ধ কালীকীর্ত্তন রচয়িতা ও প্রেমিক আখ্যাধারী। তিনি আন্দুলরাজ বিজয় কেশবের সভাপণ্ডিত

এবং স্বামী বিবেকানন্দের মায়ের গুরুদেব ছিলেন। তাঁর রচিত "মেতেছে মন কারণ বিষয় বিষ বিপিনে" গানটি শুনে রামকৃষ্ণদেব ভাবাবিষ্ট হয়েছিলেন। ১৩২৪ সালে প্রেমিক মহারাজ রচিত আন্দুল কালীকীর্ত্তন ও বাউল গীতাবলি'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

Indian Adult Educational Association, 30Faiz Bazar, Delhi কর্ত্তৃক প্রকাশিত directory of Agencies for the Recreation and cultural Activitis in south East Asian countries. গ্রন্থের ১৬২ পৃষ্ঠায় প্রেমিক প্রতিষ্ঠিত আন্দুল কালী কীর্ত্তন সমিতির নাম উল্লিখিত হয়েছে।

প্রেমিকের তৃতীয় পুত্র রাজেন্দ্রের তিন পুত্র তারাপ্রসন্ন, শ্যামাপ্রসন্ন ও কালীপ্রসন্ন। তিনজনই খ্যাতনামা। তারাপ্রসন্ন ও কালীপ্রসন্ন শিল্পী এবং শ্যামাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিজ্ঞ।

বংশ তালিকা



মাধব (কনিষ্ঠ)
|
মহেন্দ্র
[১২৫১-১৩১৬ সাল]
|
[৩য়] রাজেন্দ্র
|
তারাপ্রসন্ন — শ্যামাপ্রসন্ন — কালীপ্রসন্ন

তারাপ্রসন্ন
চন্দ্রনাথ — ইন্দ্রনাথ

চন্দ্রনাথ
অমিতাভ — অসিমাভ

ইন্দ্রনাথ
|
অসিতাভ

রামকৃষ্ণপুরের বসু বংশ

হাওড়া শহরে আসার আগে এদের নিবাস ছিল হাওড়া জেলার সিংটি শিবপুর গ্রামে। ঈশান চন্দ্র বসু কলকাতার চাঁদনীচকে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে E. C Boose & co নামে একটি ষ্টিভেডার অফিস এবং ব্যবসার সুবিধার জন্য রামকৃষ্ণপুরে বসবাস শুরু করেন। কলকাতার একটি প্রাচনীতম ষ্টিভেডার প্রতিষ্ঠান টার্নার সাহেবের ষ্টিভেডার হিসাবে তিনি বহু অর্থ উপার্জন করেন এবং প্রথমে দেশে (প্রায় দেড়শ বছর আগে) পরে রামকৃষ্ণপুরে দুর্গোৎসব শুরু করেন। ঈশানবাবু খুরুটের পঞ্চানন তলার ও সিদ্ধেশ্বরী তলার নাট মন্দির

দু'টি তৈরী করিয়ে দেন এবং কাশীতে শিব স্থাপনা করেন। ঈশান চন্দ্রের পুত্র নৃসিংহচন্দ্র পৈত্রিক ব্যবসার প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। কাশীর রাজঘাটে এনার প্রদত্ত জমির উপব একটি মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নৃসিংহ বাবুর পুত্রদ্বয় আশুতোষ ও তারাপদ উভয়েই হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটিকে ভূমিদান করায় ঈশানচন্দ্র বসু, নৃসিংহ চন্দ্র বসু, আশুতোষ বসু ও তারাপদ বসু'র নামে চারিটি রাস্তার নামকরণ হয়েছে। তাঁরা রামকৃষ্ণপুর পাবলিক লাইব্রেরীর পাকাবাড়ী তৈরী করিয়ে দেওয়ায় এটির নাম রাখা হয় নৃসিংহ মেমোরিয়াল হল।

২২-১০-১৯৮০ তে ৮৪ বৎসর বয়সে তারাপদবাবু পরলোক গমন করেন। এসময় তিনি ছিলেন E. C. Bose Stevedor co এবং ভবানীপুর মোটর এ্যাকসেসারিজ প্রাঃ লি-এর চেয়ারম্যান। শিব ও অমিয়া বিদ্যালয়, রামকৃষ্ণপুর সংসদ, হাওড়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম প্রভৃতি বহুজন কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান তাঁর সহৃদয় আনুকূল্যে গড়ে উঠেছিল। তাঁর কনিষ্ঠপুত্র বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ডঃ নিমাই সাধন বসু'র বিস্তৃত পরিচয় অন্যত্র দেওয়া হয়েছে। স্বর্গতা পত্নী আশালতার নামে আশুতোষ বসু মহাশয় কাশীর রামকৃষ্ণ মিশন হাঁসপাতালে একটি অস্ত্রোপচার গৃহ নির্মাণ করাইয়া দেন। হাওড়া শঙ্কর মঠেও তাঁর অর্থ সাহায্য উল্লেখযোগ্য। বসুপরিবারের দানে হাওড়া জেনারেল হাসপাতালে ফ্রি-বেড আছে। রামকৃষ্ণ মিশন সেবা হাঁসপাতালে [শরৎ বসু রোডে] রেডিওলজিক্যাল ইউনিটটি তারাপদ বসু ও আশুতোষ বসু রেডিললজিক্যাল ইউনিট নামকরণ করা হয়েছে। এজন্য বসু পরিবার ঐ হাঁসপাতালে এবং স্নাতকোত্তর গবেষণার জন্য তিন লক্ষ টাকা দান করেছেন।

তারাপদ বসুর অন্যতম পুত্র দেবসাধন বসু বাঙালী ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। পারিবারিক প্রতিষ্ঠান ঈ. সি-

বোস এণ্ড কোং-কে বহুলাংশে সম্প্রসারণ করা ব্যতীত তিনি একাধিক নূতন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গঠন করেছেন। বর্তমানে একমাত্র বাঙালী জাহাজী প্রতিষ্ঠান হিমালয় শিপিং কোং'র তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। একাজে তাঁর সুযোগ্য সাহায্যকারী হ'লেন তাঁরই ভ্রাতা বিষ্ণুসাধন বসু। দেববাবু এক সময় ক্যালকাটা ডক লেবার বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের পরামর্শদাতা কমিটির সদস্য মনোনীত হয়েছেন।

বংশ লতিকা

রামতনু বসু

রাম কমল

কেনারাম

ঈশান মহেশ মহেন্দ্র

নৃসিংহ

আশুতোষ তারাপদ

রিসাধন প্রতিমা সুষমা অনিমা সুরমা কৃষ্ণসাধন গৌরসাধন

শিব অমিয়া দেব শক্তি চণ্ডী বিষ্ণু নিমাই সাধন

শালিখার ঘোষবংশ

গোপ জাতীয় শালিখার ঘোষদের পূর্বনিবাস হুগলী জেলার রাধানগর গ্রাম। তিতুরাম ঘোষ সালিখার পিলখানা অঞ্চলে বসবাস ও মঠের ব্যবসা শুরু করেন. অধঃস্তন নন্দলাল ঘোষ শুরু করেন সোনা-রূপা কেনা-বেচা ও বন্ধকী কারবার। নন্দবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র মন্মথ ঘোষের ২য় পুত্র দ্বিজেন্দ্র লাল ঘোষ [জঃ ১৩.১২. ১৯১৭] ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চিকিৎসা ব্যবসা ও বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত আছেন।

নন্দবাবুর ৩য় পুত্র অমূল্য রতন এবং চতুর্থ পুত্র অতুলকৃষ্ণ উভয়েই কৃতবিদ্য ও সুনাম খ্যাত।

অমূল্য বাবু মেডিকেল কলেজ থেকে L. M. F এবং ষ্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টী থেকে L. M. F ডিগ্রী লাভ করে চিকিৎসা ব্যবসায়ে রত হ'ন, তাঁর তেজস্বীতা, নির্ভিকতা, স্বদেশপ্রীতি এবং ব্যায়াম পুষ্ট দেহ দেখিয়া ডাঃ এস. কে. মল্লিক একসময় স্যার [পরে লর্ড] এস. পি. সিংহকে বলেছিলেন "অমূল্যর ন্যায় আমার আর কয়েকটি ছাত্র থাকিলে আমি প্রতি জেলায় বেঙ্গলী রেজিমেন্ট গঠন করিতাম এবং আমাকে রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেনের জন্য চিন্তা করতে হ'ত না।" ১৯৩০ এ তিনি বঙ্গীয় ব্যাবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হ'ন এবং দশ বৎসর হাওড়া থেকে এম এল সি ছিলেন। রাউণ্ড টেবল কন্ফারেন্সের পর পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য-এর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত এলাহাবাদের নিখিল ভারতবর্ষীয় unity conferenee-এ তিনি ছিলেন বাংলা থেকে হিন্দু মহাসভার অন্যতম প্রতিনিধি, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল বোর্ডে তিনি ছিলেন ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট দলের নেতা, শালিখা আর্য সমাজের সভাপতি এবং ১৯৩২-এ বজবজে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক যাদব মহাসভার সভাপতি বিমল প্রতিভা দেবীর কারা মুক্তির জন্য তিনি সবিশেষ

চেষ্টা করেন, অতুল কৃষ্ণ বাবু ছিলেন হাওড়া কোর্টের উকিল, 'যাদব কেশরী' পত্রিকার সম্পাদক এবং 'গোপ-মিত্র' পত্রিকার সহঃ সম্পাদক।

শিবপুরের ভট্টাচার্য পরিবার

শিবপুরে ভট্টাচার্য পরিবার নবাব আলিবর্দীর নিকট থেকে ১৯০৫, ১৯০৬ ও ১৯০৭ তায়দাদভুক্ত ভূসম্পত্তি ভোগদখলের আদেশ নামা পান, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও এই সম্পত্তির উপর করছাড় লিখেদেন। ১৯০৫ তায়দাদ [পদ্মপুকুর বাগান] ১২০৯ সালের হুয়েম খালাস ৪২ নং খাসের অন্তর্গত এবং ১৯০৭ তায়দাদ এর পরিমান ছিল ৩৬ বিঘা। এইসব তায়দাদ পাইকান পরগণার অন্তর্গত ছিল, কালক্রমে ভট্টাচার্য পরিবার বড় বাড়ী ও ছোট বাড়ী এই দুই তরফে বিভক্ত হ'ন।

সার্কুলার রোড [বর্তমানে শরৎ চ্যাটার্জী রোড] ছোট ভট্টাচার্য পাড়াকে দু'ভাগে ভাগ করেছে, উত্তরে ভট্টাচার্য বাড়ীর ৩৬ বিঘা ভদ্রাসনের কিয়দংশে ছোট বাড়ী এবং দক্ষিণে দেওয়ান জীর বাগান। এই বাগানটি সম্ভবতঃ ভূ-কৈলাসের [খিদিরপুরের রাজবাটীর] নিকট থেকে ভট্টাচার্য পরিবার কোনসূত্রে পেয়েছিলেন জনশ্রুতি ভূ-কৈলাসের রাজারা এক সময় ভট্টাচার্যদের শিষ্য ছিলেন এবং ছোট বাড়ীর পাকা ইমারত, টোল, অতিথি শালা ও পূজার দালান রাজাদের অর্থানুকুল্যেই নির্মিত হয়।

ভট্টাচার্য পরিবারের আত্মীয়তা সূত্রেই এখানে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের বাস। গৌরীকান্তের পৌত্র গোপীনাথ এবং তাঁর পৌত্র রাসকিশোর জঙ্গল কাটার কন্ট্রাকটারি পেয়ে এখানে আসেন, এই বংশের কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ভট্টাচার্য পরিবারের সহিত আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ হ'ন।

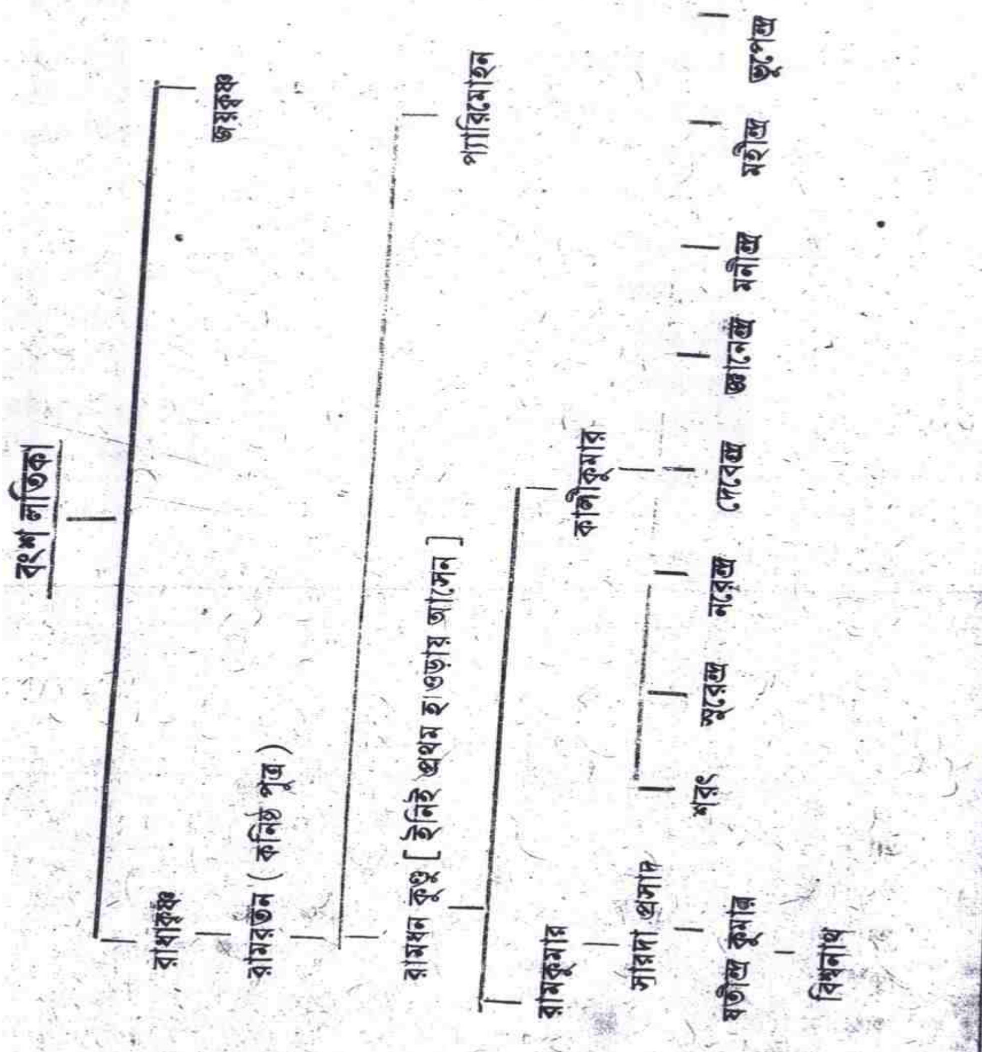
বংশ লতিকা

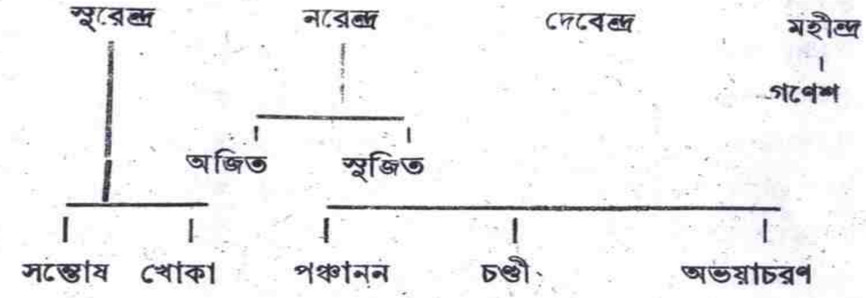
- নৃসিংহদেব ভট্টাচার্য
  - রাঘবেন্দ্র
    - রামচন্দ্র
      - রঘুনাথ
        - রামরাম
          - জয়রাম
            - কৃষ্ণ প্রসাদ (বড়বাড়ী)
            - জগন্নাথ [ছোটবাড়ী] ওরফে রমানন্দ বিদ্যাবাগীশ।
        - রমারাম
          - কৃষ্ণচরণ [তেঁতুল তলার ভট্টাচার্য]
          - রামনারায়ণ
        - বিষ্ণুরাম

খুরুট কালীকুণ্ডু লেনস্থ গন্ধবণিক বংশ

আর্য্যাবর্তের কোন গন্ধবণিক প্রথমে হুগলী জেলার জাঙ্গীপাড়া গ্রামে বসবাস শুরু করেন। এই বংশের রামধন কুণ্ডু প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্বে ব্যবসা উপলক্ষে হাওড়ায় বাস এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া ডকের অধীনে বন্দুক, আফিং এবং কাঠের কারবার শুরু করেন। কালী কুমার কুণ্ডু এই বংশের এক সনামধন্য ব্যক্তি। তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া ডকের অন্যতম অংশীদার, অনারারী ম্যাজিষ্টেট এবং পৌর প্রতিষ্ঠানের কমিশনার ছিলেন। তাঁর ভাই রামকুমার কুণ্ডু প্রতিষ্ঠিত "কুণ্ডুজ

ফ্যামেলী" নামক পাবলিক লাইব্রেরীতে তদনান্তীন সরকার নানা ধরণের গ্রন্থ সাহায্য দিয়ে পুষ্ট করেছিলেন।





উদয় নারায়ণপুরের চট্টোপাধ্যায় পরিবার

উদয় নারায়ণপুর গ্রামের চট্টোপাধ্যায়গণ পাটুলির চাটুয্যেদের বংশধর। এঁদের পৈত্রিক নিবাস নদীয়া জেলার বিল্বগ্রাম। প্রায় আড়াইশ বছর আগে রামদুলাল চট্টোপাধ্যায় বিবাহসূত্রে উদয় নারায়ণপুর গ্রামে বসবাস শুরু করেন। রামদুলালের পৌত্র ঈশ্বানচন্দ্র ছিলেন কলকাতার ঈশানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স নামে লোহা ও চুণের কারবারের প্রতিষ্ঠাতা। ঈশানচন্দ্রের পুত্র সারদাচরণের জন্ম উদয়নারায়ণপুরে ১২৫৮ সালের ২৯ শে আষাঢ় শনিবার। সারদাচরণ পৈত্রিক ব্যবসায়ের প্রভুত উন্নতি এবং ১৩২০ সনে বন্যাপীড়িত দেশবাসীর সাহায্যার্থে বহু অর্থ ব্যয় করেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি উদয়নারায়ণপুরে ঈশানচন্দ্র ত্রৈলোক্যতারিণী দাতব্য চিকিৎসালয় এবং সারদাচরণ ইনষ্টিটিউশন নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সারদাচরণের পুত্র বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় বর্তমানে কলিকাতা বাসী হইলেও গ্রামের বহু জনহিতকর কাজের সহিত সংশ্লিষ্ট।

ব্যাঁটরার পলাচৌধুরী পরিবার

হুগলী জেলার কোন এক গ্রাম থেকে ভাগ্যান্বেষণে হাওড়ায় এসে কানপুর গ্রামে ঘর তোলেন রামনারায়ণ পাল, রামনারায়ণের

বড় ছেলে মধুসূদন ৮।৯ বছর বয়সে উপার্জণের আশায় একটি মাত্র পয়সা সম্বল করে কানপুর থেকে হাঁটাপথে কলকাতার দিকে রওনা হ'ন। বড়গাছিয়া গ্রামে এসে ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর বালক আধ-পয়সার মুড়ি-ফুলুরী খেয়ে বাঁকী আধলাটি নিয়ে শালকের গঙ্গার ধারে এসে হাজির হ'লেন। সে সময় সালকের ঘাট থেকে নৌকায় কলকাতায় যাবার ভাড়া ছিল এক পয়সা। বালক মধুসূদন মাঝ গঙ্গা পর্য্যন্ত নৌকায় গিয়ে মাঝিকে হাতে আধলাটি দিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দেন। সাঁতরে তীরে উঠে মধুসূদন প্রথমেই যাঁর সপ্রশংস দৃষ্টি লাভে উপকৃত হন তিনি হ'লেন জোড়াসাঁকোর শিবকৃষ্ণ দাঁ। শিবকৃষ্ণবাবু গঙ্গা স্নান সেয়ে মধুসূদনকে মাসিক তিন টাকা বেতনে তামাক সাজার চাকুরীতে বহাল করে বাড়ী ফেরেন। অনতিকাল পরেই তামাক সাজার চাকরী থেকে উন্নতি করে মধুসূদন শিববাবুর কারবারের টাকা আদায়ের ভার পান। একদিন টাকা আদায় করে ফেরার পথে তিনি দেখেন হাওড়া ষ্টেশন থেকে রামকৃষ্ণপুর ঘাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত এক হাওড় নীলাম হচ্ছে মধুসূদন মালিকের নামে নীলাম ডেকে হাওড়টি কেনেন। পরে শীলবাবুদের কাছে হাওড়টি বিক্রী করে যা লাভ হয় শিববাবু তা সমস্ত-ই মধুসূদনকে দিয়েছেন। মধুসূদন পাল সেই টাকায় লোহার দোকান করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। ধনী মধুসূদন পাল কানপুরে গ্রামে প্রভুত ভুসম্পত্তি কিনে ১৩৬৭ বঙ্গাব্দে দুর্গাপূজার প্রবর্ত্তণ এবং হাওড়া শহরের ব্যাঁটরার বাড়ীতে পাঁচ পরগণার স-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের তাঁবোর নিমন্ত্রণ এবং তুলট ও অন্নমেরু দান ইত্যাদি উৎসব করেন। এই উপলক্ষেই তিনি সকলের দ্বারা চৌধুরী হিসাবে অভিহিত হ'য়ে ব্যাঁটরার পাল চৌধুরী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে তাঁর নামে একটি স্কুল আছে।

শিবপুরের রায় চৌধুরী বংশ

১০৯০ বঙ্গাব্দের কোন একদিন ২৪ পরগণা জেলার ব্যারাকপুর মণিরামপুর থেকে পৈত্রিক জমিদারীর ১১টি গ্রাম ভাগে পেয়ে শুদ্ধ শোত্রীয় ভরদ্বাজ বংশীয় ব্রাহ্মণ জমিদার রাজারাম রায়চৌধুরী শিবপুর গ্রামে চলে এসে নতুন করে ভদ্রাসন তৈরী করেন। শিবপুর, বেতাইতলা, ডাঁসি, সলপ, নিবড়া, নিতাঙ্কুর, চামরাইল, মাঝেরহাট, দেবীপাড়া, বাঁকড়া ও বেতোড়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছিল তাঁর জমিদারীর এলাকা। শালিমারের বেশ কিছুটা জমি বি এন আর কোম্পানী রেল-লাইন খোলার সময় আশী হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে অধিগ্রহণ করেন। ১৮৮০-তে বোটানিকেল গার্ডেন এলাকার ৩৩৬ বিঘা জমি রাণী স্বর্ণময়ী ৮৩০ টাকা ৸৵০ (চৌদ্দ আনা) ৬ পাই খাজনায় লীজ নেন। শোনা যায় রাণী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে মন্দির তৈরী করার আগে রায় চৌধুরীদের জমিদারীভুক্ত শিবপুর গ্রামের গঙ্গার ধারে জমি সংগ্রহে সচেষ্ট হয়েছিলেন। অব্রাহ্মণ বলে রাণী এখানে মন্দিরের জমি সংগ্রহে ব্যর্থ হন।

১৯২০ তে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি দুই খণ্ডে যে মিউনিসিপ্যাল ম্যানুয়েল প্রকাশ করেন সেটি সংকলনের দায়িত্ব বহন করেন তদানীন্তন মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ও লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য হরিপদ রায় চৌধুরী।

১৮৮৪-তে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম নির্বাচনে ৮ নং ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত হ'ন এই বংশের রামচন্দ্র ও গুরু চরণ, দাশরথি রায়চৌধুরীর পুত্র কেশবচন্দ্র ছিলেন হাওড়া-জমিদ এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক এবং এই বংশের একাংশের শেষ জমিদার।

অতীতে গড় দিয়ে ঘেরা এবং বর্তমানে নানাশরিকে বিভক্ত রায় চৌধুরী বাড়ীর গৌরব আজও অম্লান রেখেছেন চিকিৎসাকে জনসেবার

মাধ্যর হিসাবে গ্রহণ করে প্রচীন নেপাল রায় চৌধুরী এবং নবীন চন্দন রায় চৌধুরী।

বাঙালবাবু

হাওড়ায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যে নুনের ব্যবসা ছিল প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পর সেই নিমক মহলের দেওয়ান নিযুক্ত হ'ন ঢাকা জেলার [বর্তমান বংলাদেশ] মাণিকগঞ্জ মহকুমার নয়াবাড়ী গ্রামের জমিদার রাম যতন বসু'র পুত্র রামরতন বসু। হাওড়ায় তাঁর প্রথম বাসস্থান ছিল গঙ্গার ধারে। সে জায়গা এখন রেলের অধীন। হাওড়ায় প্রচুর জমিজমা কিনে রামরতন বসু কয়েকটি বাজার বসান। সাধারণের নিকট তিনি বাঙালবাবু বলে আখ্যাত হওয়ায় হাওড়া ময়দানের নিকট অধুনা লুপ্ত মার্টিন রেল ষ্টেশনের কাছে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বাজারটি সাধারনের নিকট বাঙালবাবুর বাজার ও তৎসন্নিহিত রেলপুলটি বাঙালবাবুর পুল নামে পরিচিত হয়। ছোট ভাই রাজমোহন বসু তাঁর সম্পত্তির তত্ত্বাবিধায়ক ছিলেন। রাজমোহন বসু'র পুত্র ঈশানচন্দ্র বসু ১৮৭১-এ ভারত সরকারের ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের কনট্রোলার ও অডিটর জেনারেল নিযুক্ত হ'ন। সেই সময়ই তাঁর সহি যুক্ত দশটাকার নোট ভারত সরকার বাজারে ছাড়েন। ঈশানচন্দ্র কিছুকাল হাওড়া জিলা স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ছিলেন। এই বংশের কয়েক জনের নামে হাওড়ার কয়েকটি রাস্তার নামকরণ হয়েছে, যেমন রাজমোহনবসু রোড, ঈশানচন্দ্র বসু রোড প্রভৃতি।

ঈশান চন্দ্রের এক মেয়ে কনকলতা ছিলেন সত্যেন্দ্র নাথ দত্তের সহধর্ম্মিনী। রাজমোহন বসু'র পুত্র গিরিশ চন্দ্র বসু'র কন্যা সৌদামিনির বিবাহ হয় হাওড়ার তদানান্তীন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মহিমচন্দ্র ঘোষের সহিত, যাঁর নামে মধ্যহাওড়ায় এম, সি, ঘোষ লেন নামে একটি রাস্তা আছে।

শাঁকরাইলের জমিদার বংশ

শাঁখরাইল জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা রামদুলাল ঘোষ ছিলেন একজন বড় চাষী ও পান ব্যবসায়ী। পান ব্যবসায়ে প্রভুত অর্থ উপার্জন করে প্রচুর ভূসম্পত্তি কেনেন এবং শেষ জীবনে মজঃফরপুর পরগনার অন্তর্গত শাঁকরাইল মৌজার জমিদার হিসাবে গণ্য হ'ন। রামদুলালের পুত্র গোরাচাঁদ ঘোষ শাঁকরাইলের বর্তমান সুদৃশ্য জমিদার বাড়ীটি তৈরী করান। প্রায় ১০০ বছরের পুরাতন বাড়ীটির কারুকার্য এখনও দর্শনীয়। ভিতরের ঘরগুলির দেওয়াল এত মসৃন যে এখনও হাত পিছলাইয়া যায়। গোরাবাবুর পৌত্র নৃপেন নারায়ণ ঘোষ সূর্য্যকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নামীয় জনৈক শিক্ষিত গ্রামবাসীর সহযোগিতায় ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে শাঁকরাইল অভয়চরন হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা শাঁকরাইল ষ্টেশন স্থাপন এবং নিজব্যয়ে গ্রামের বেশ কিছু রাস্তা তৈরী করিয়ে দেন। জমিদার বংশীয় ব্যক্তিগণ একসময় গ্রামস্থ বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান শাঁখরাইল ইন্দিরা ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ক্লাব আয়োজিত ব্রীজ প্রতিযোগিতার কর্মকাণ্ডে মুগ্ধ অমৃতবাজার পত্রিকায় লেখা হয়—"যদি কেহ ব্রীজ ক্লাব সুষ্ঠভাবে ও নিস্বার্থ ভাবে চালাতে চান তা'হলে আপনারা শাঁখরাইল ইন্দিরা ক্লাব-এর সম্পাদক চণ্ডীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত যোগাযোগ করেন। বর্তমানে জমিদার বংশ লোপ পেলেও জয়দেব নারায়ণ ঘোষের জামাতা নন্দগোপাল বসু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা সহ বহুজনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সংগে নিজেকে জড়িত রেখে গ্রামের উন্নতি সাধনে ব্রতী আছেন।

বংশ লতিকা

রামছলাল ঘোষ

গোরাচাঁদ

অভয়চরণ

রাজেন্দ্র নারায়ণ — নৃপেন্দ্র নারায়ণ

কন্যা-তারাসুন্দরী

ষোড়শী — জয়দেবনারায়ণ — মাতঙ্গধরন

কন্যা গৌরী — কন্যা সন্ধ্যা শ্রী + স্বামী নন্দগোপাল বসু

সাঁত্রাগাছির ভট্টাচার্য পরিবার

সাত্রাগাছির ভট্টাচার্য প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই রামরাজাতলার রাম ঠাকুরের পূজারী।

প্রায় ছ'শ বছর আগে বরেন্দ্রভূমি হ'তে আগত সিদ্ধ শ্রোত্রীয় চন্দ্রশেখর সান্যাল সাত্রাগাছি গ্রামে বসবাস শুরু করেন। অধঃস্তন বংশধরগণের মধ্যে যিনি জমিদারী লাভ করেন তাঁর উপাধি হয় চৌধুরী এবং যে শাখা যজন-যাজন-অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় ব্রতী থাকেন তাঁদের উপাধি হয় ভট্টাচার্য, এইভাবে একই বংশের জমিদার অযোধ্যারাম চৌধুরী যখন রামচন্দ্রের পূজার প্রচলন করেন তখন সেই বংশেরই হলধরন্যায়রত্ন পূজকের আসন লাভ করেন। হলধরন্যায়রত্নের বংশধরগণের একশাখা পরবর্তী কালে কলিকাতায় ভদ্রাসন তৈরী করালেও আজও রামঠাকুরের পূজায় অংশ গ্রহণ করেন। হলধরন্যায়রত্নের পুত্র নন্দলাল বিদ্যারত্ন ছিলেন স্মৃতিশাস্ত্রের

পণ্ডিত, ইনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত এই আলোচনা করতেন। ইনি হাওড়া থেকে কলকাতার শিবনারায়ণ দাস লেনে বসবাস শুরু করেন। নন্দলালের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র কৈলাস বিদ্যাভূষণ আশুতোষ ও সোমপ্রকাশ পত্রিকার প্রকাশনায় যুক্ত ছিলেন। কৈলাস বাবু ডাফ কলেজের অধ্যাপক এবং সাপ্তাহিক সোম প্রকাশের সম্পাদক ছিলেন। আশুতোষের পুত্র পবন চন্দ্র ভট্টাচার্য ছিলেন সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যে সুপণ্ডিত ও শিক্ষাবিদ, আকাশবাণীতে তাঁর ধর্মগ্রন্থ বিষয়ে বহু আলোচনা প্রচারিত হয়েছে। রামচন্দ্রের পূজারীগণের মধ্যে একমাত্র তিনিই এই পূজার উৎপত্তি ও তাৎপর্য বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন এবং বাংলায় রাম রক্ষা কবচের অনুবাদ করেন। পবনবাবুর ছোটকাকা দুর্লভ ভট্টাচার্য ছিলেন বিখ্যাত পাখোয়াজী।

বংশ লতিকা

চন্দ্রশেখর

অনন্তরাম (১ম পুত্র)

রামচন্দ্র (কণিষ্ঠ পুত্র)

গৌরী কান্ত (কণিষ্ঠ পুত্র)

হলধর ন্যায় রত্ন (৩য় পুত্র)

নন্দলাল ভট্টাচার্য (১ম পুত্র)

নন্দলাল ভট্টাচার্য (১ম পুত্র)

আনন্দ | কৈলাস | আশুতোষ | সন্তোষ | বৈদ্যনাথ | দুর্লভ

চন্দ্র বিদ্যাভূষণ [বিখ্যাত পাখোয়াজ বাদক]

পবনচন্দ্র

[৫ই ভাদ্র ১৩০৫—৫ই ভাদ্র ১৩৮৫]

গোরা | নিমাই | নিতাই | কণক | বটুক | কালাচাঁদ | বিশ্বচাঁদ

চন্দ্রশেখর

ইন্দ্রশেখর | সূর্যশেখর

শিবপুর চ্যাটার্জী হাট নিবাসী মুখোপাধ্যায় পরিবার

বর্ধমান জেলায় বিল্বগ্রাম নিবাসী দিগম্বর মুখোপাধ্যায় শিবপুরের ছোট-ভট্টাচার্য পরিবারের সংগে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হ'য়ে চ্যাটার্জী হাটে বসবাস শুরু করেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে। তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে বোটানিকেল গার্ডেনের কাছে গঙ্গায় মাটি কাটার কনট্রাক্ট পান। কনট্রাক্টরীর পয়সায় তিনি কাজীবাগান (পরবর্তীকালের চারাবাগান) বেতড়, চক্রবেড়িয়া ও পদ্মপুকুর অঞ্চলে প্রচুর ভু-সম্পত্তি কেনেন এবং এইসব জায়গায় চাষী, ধোপা, নাপিত, ও বারুজীবি প্রজা বসান, অঞ্চলটি তখন খড়ি, বেত ও হোগলার জঙ্গলে আকীর্ণ ও চিতাবাঘ, হায়না প্রভৃতি হিংস্র জন্তুতে পূর্ণ ছিল। জঙ্গল পরিষ্কার করে

পানচাষ শুরু হয় এবং চাষীদের কৃতিত্বে কাজিবাগানের নাম হয় চারাবাগান। দিগম্বরের পুত্র নন্দলাল ছিলেন হাওড়ার প্রথম ময়দাকল Ahmuti & co'র একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তিনি ক্ষেত্রমোহন বন্দোপাধ্যায় (যার নামে ক্ষেত্র ব্যানার্জী লেন)-এর কন্যাকে বিবাহ করেন। চারাবাগানে নন্দলাল মুখার্জী'র নামের একটি রাস্তা আছে। তিনি বাড়ীতে দুর্গাপূজা ও সেই উপলক্ষে একটি যাত্রা-অভিনয়ের দল প্রতিষ্ঠা করেন, তার বাড়ীর পূজার আনন্দ উৎসবে Ahmuty & co'র সাহেবগন এবং মুসলমান প্রজাগণও অংশ গ্রহন করিতেন। নন্দবাবুর এক পৌত্র অভয়চরন ছিলেন সাহিত্যানুরাগী। আর এক পৌত্র হীরেন্দ্র নাথ ১৩৭৪ সালে পঞ্চযজ্ঞ আশ্রম ও দীনতারিনী কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ঐই মন্দিরে বর্ধমান জেলা হতে আনীত ৪০০ বছরের পুরাতন ভৈরবনাথ মহাদেবের মূর্ত্তি আছে। অভয়চরনের জ্যেষ্ঠ পুত্র নিশীথকুমার শিবপুর চ্যাটার্জী হাট বয়েজ হাইস্কুল ও গার্লস স্কুল দু'টির প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম এবং শিবপুর দীনবন্ধু কলেজের বাংলা ভাষার অধ্যাপক। তিনি সাহিত্যের "আঙ্গিনায়" প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পি, এইচ, ডি স্তরে চলচ্চিত্র বিষয় নিয়ে গবেষনার সূত্রপাত করেন। ইনি নিখিল ভারত বাংলা নাটক বিচারক সমিতির অন্যতম বিচারক।

পরিশিষ্ট

নির্দেশিকা : আকর গ্রন্থ, প্রতিবেদন ও পত্রিকা সমূহ।

(ক) ইংরাজী

1, Imperial Gazetteer—Bengal-vol-I

2, Bengal District Gazatteer—Howrah-1909- L. S. S, O Malley and M, chakraborty,

3. Howrah District census Hand BooK-1961 Editor- B. Roy,

4, West Bengal Gazatteer—Howrah-Amiya Kumar Banerjee

5, Lead Bank survey Report—Howrah By United Commercial BanK,

6, Focus on west Bengal.

7, West Bengat—An analytical study—sponsored by the Bengal chamber of Commerce and Industries, Calcutta.

8, Report on an Enquiry into the standard of living of Jute workers in Bengal—Commerce Dept, Govt. of W. Bengal.

9, West Bengal : Edited by—A. B. Chatterjee, Avijit Gupta, P. K. Mukhopadhaya.

10, Antiquity of the Lower Ganges and its coursce in science and culture. – N. K. Bhattasali

11. Distrtct Gazatteer—Hooghly-Edited by Amiya kr. Banerjee.

12, Howrah—A study in sociai Geography— Amiya Bhusan.

13. The days of john Company—selections from Calcutta gazettee, 1824-1832, compiled and edited by Anil chandra Dasgupta.

(খ)

14. The changing face of Bengal—R. K. Mukherjee

15, An account of Howrah—Past and present— C. N Banerjee.

16. Census Report of 1901

17. Consideration on Indian Affairs-William Bolt.

18. Municipal Administration in Bengal [Pt-1]—prof B. K. Bhattacharyya

19. Howrah civic companion—Jitendriya Banerjee

20. A statistical account of Bengal-vol-3-W. W. Hunter.

21. Salinity observation of River Hooghly and Rupnarayan—Technical Report No 26—Hydraulic study Dept. cal. port Trust. (1966)

22. Salinity intrusion in the Hooghly Estuary-P, K. Chatterjee.

Proceedings of inter-disciptionary symposium on the Bhagirathi—Hooghly Basin.

23. The Effects of phytotoxic gases on native Australian plant species- part-I-Acule Effects of sulphur deoxide Envirn. Pollut-7 ; 7-23, 1974—O'conner, J. A., parbery, D. G. and stranss, W.

24, Bishop's college,. calcutta 1820-1970

25, Bridges of calcutta and its surroundings— S. Chatterjee

26, The calcutta Municipal Gazattee,

27, St Thomas church school-Howrah centeny souvenieur-Editor-A. V Ambett,

28, Economic studis-Editor Prof D. N, Mukherjee

29. Journal of the varenda perearah Musuum—Sati in Bengal Epigraphy.

30. Flora of Howrah District—S. S. R. Bennet

(গ)

(খ) বাংলা

১। আমার গ্রামের কথা—অতুল কৃষ্ণ চৌধুরী।
২। সাধুদর্শন ও জগৎ প্রসঙ্গ—ডাঃ গোপীনাথ কবিরাজ
৩। শিবপুর - কাহিনী—অন্নদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
৪। হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ—সুধীর কুমার মিত্র।
৫। হাওড়া—পরিচয়—প্রভাকর মুখোপাধ্যায়।
৬। সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র—বিজয় ঘোষ।
৭। ১৩২২ সালের সাহিত্য পঞ্জিকা ১ বৎসর যোগীন্দ্র নাথ সমাদ্দার ও রাখাল রাজ রায়।
৮। বাংলা সাময়িক পত্র (২য় খণ্ড)—ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৯। স্মৃতির অর্ঘ্য—বসন্ত কুমায় পাল।
১০। হাওড়া জেলার পুরাকীর্ত্তি—গ্রন্থনা—তারাপদ সাঁতরা সম্পাদনা . অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
১১। খড়ি অপবার্ত্তা—হরিদাস কাব্য স্মৃতি তীর্থ
১২। হুগলী অথবা দঃ রাঢ়—অম্বিকা চরণ গুপ্ত।
১৩। সংক্ষিপ্ত পল্লীচিত্র – যোগেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী।
১৪। লোক-সঙ্গীত রত্নাকর—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য
১৫। বাঙ্গালীর ইতিহাস – ডঃ নীহার রঞ্জন রায়
১৬। ছোটদের হাওড়া—চারুচন্দ্র পাল ও রাজেন্দ্র লাল সোম
১৭। অকিঞ্চন ভক্ত ফকির দাস রায়—অখিল চন্দ্র রায়।
১৮। [নাব্‌ণার] ৺কালী মাতার লীলা কথা সংগ্রহ—জিতেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়।
১৯। রামকৃষ্ণ রায় কবিচন্দ্র ও রসপুর রায় বংশের ইতিকথা— পাঁচু গোপাল রায়
২০। বালীর ইতিহাসের ভূমিকা প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
২১। পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বন ও মেলা—সম্পাদক অশোক মিত্র।

(ঘ)

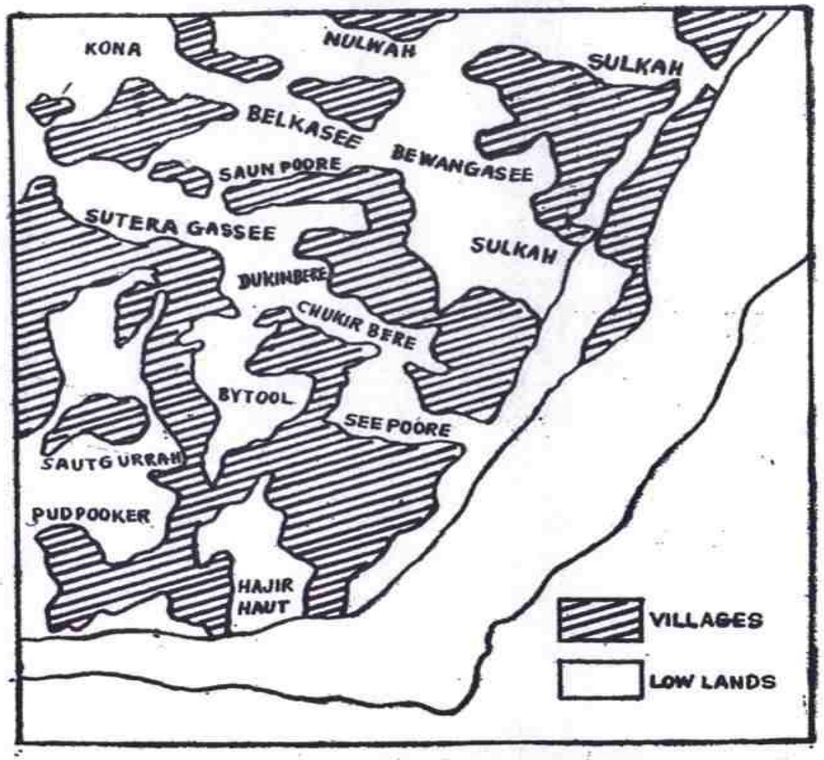
২২। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত—ডঃ অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়।
২৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস – ডঃ সুকুমার সেন।
২৪। সাহিত্য কুল কল্পদ্রুম—রামপদ বিশ্বাস।
২৫। বাংলার পারিবারিক ইতিহাস—পণ্ডিত শিবেন্দ্র নারায়ণ শাস্ত্রী।
২৬। যাত্রা গানের ইতিবৃত্ত—বীরেশ্বর বন্দোপাধ্যায়।
২৭। সতী—ডঃ স্বপন বসু।
২৮। মিত্র রহস্য—রায় বিহারী মিত্র বাহাদুর।
২৯। আমরা যেথায় আছি = বালী মরুতি ব্যায়াম বিদ্যালয়।
৩০। হাওড়া বার্তা সম্পাদক ডাঃ শম্ভুচরণ পাল।
৩১। বিবরণ—সম্পাদক - শশধর রায়।
৩২। কৌশিকী—সম্পাদক তারাপদ সাঁতরা ও আনন্দ গঙ্গোপাধ্যায়।
৩৩। ডাঃ পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি সমিতি স্মারকপত্র।
৩৪। The calcutta Municipal gazattee,
৩৫। St Thomas church school—Howrah cente-souvenieur-Editor-A.V Ambett
৩৬। পঞ্চায়েতীরাজ রজত জয়ন্তী স্মরণিকা, হাওড়া জেলা।
৩৭। হাওড়া জিলা স্কুলে রজত জয়ন্তী স্মরনিকা।
৩৮। বিবেকানন্দ ইন্‌স্টিউশন পত্রিকা – সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা।
৩৯। বলুহাটি উচ্চ বিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত— অগ্রগতির পথে।
৪০। রসপুর উচ্চ বিদ্যালয় শতবর্ষ পূর্তি স্মরণিকা।
৪১। অশীতিবর্ষ পূর্তি উৎসব স্মারক পুস্তিকা বেলুড় সাধারণ গ্রন্থাগার।
৪২। আর্থিকপ্রসঙ্গ সম্পাদক দ্বিজেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়।

৪৩। ভূমিলক্ষ্মী —সম্পাদক শান্তিকুমার মিত্র।
৪৪। Journal of the Varendra Reasearch musium
Vol 2, 1973.
৪৫। সাপ্তাহিক দেশ।
৪৬। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক সম্মেলন
—হাওড়া—১৯৭৭ স্মারকগ্রন্থ।
স ~ াদক—ডাঃ নির্মল সরকার।
৪৭। শিবপুর দীনবন্ধু ইনস্টিউশন –শতবর্ষ পূর্ত্তি স্মরণিকা।
৪৮। সাঁত্রাগাছি কেদারনাথ ইনস্টিউশন—স্নুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা।
৪৯। পঞ্চবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন স্মরণিকা (১৯৭৯)
—ব্যাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরী।
৫০। শিবপুর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ স্নুবর্ণ জয়ন্তী
স্মারক ১৯৮০।
৫১। হাওড়া জেলা লেখক সম্মেলন (স্মরণিকা) সাহিত্য প্রয়াসী।
৫২। মহিয়াড়ী মহাকালী ব্যায়াম সমিতি স্নুবর্ণ জয়ন্তী
উৎসব স্মরণিকা।

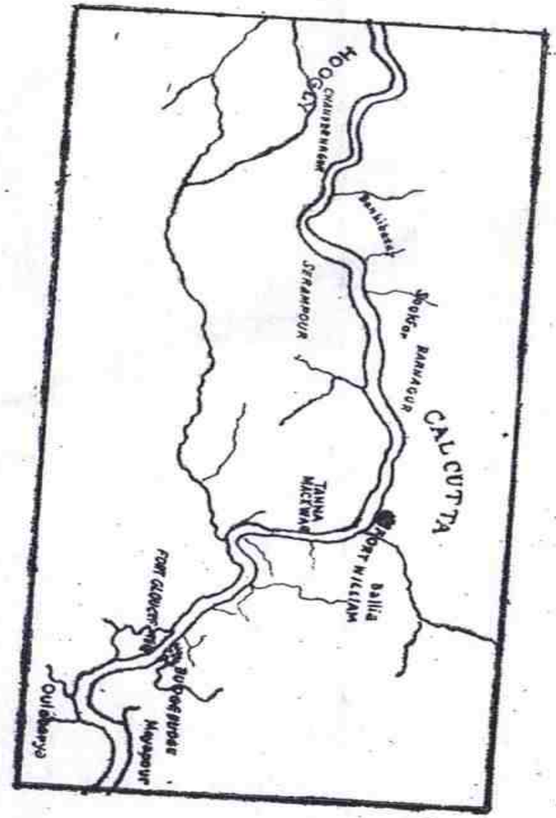
বিদেশীদের আঁকা মানচিত্র

হাওড়া

মার্কউডের মানচিত্রে
হাওড়া শহর
(১৭৮২-৮৩)



রেনেলের মানচিত্রে
থানা মাকুয়া
১৭৮০



আপজনের মানচিত্রে

হাওড়া

